নগরকন্যা

বারীন্দ্র নাথ দাশ

ইষ্টলাইট বুক হাউস
২০, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা—১

প্রথম প্রকাশ :
৪ঠা শ্রাবণ ১৩৬৭

প্রকাশক :
শ্রীবাসুদেব লাহিড়ী
ইষ্টলাইট বুক হাউস
২০, ষ্ট্রাণ্ড রোড,
কলিকাতা-১

মুদ্রক :
শ্রীনারায়ণ লাহিড়ী
লয়াল আর্ট প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৪, ধর্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১৩

প্রচ্ছদ : বিমল দাস

অধ্যাপক ডক্টর রথীন রায়

বন্ধুবরেষু—

এই উপন্যাসের চরিত্র, চরিত্রের নাম, ঘটনা প্রভৃতি নিতান্তই কাল্পনিক। কোথাও কোনো সাদৃশ্য সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত এবং আকস্মিক।

এই লেখকের অন্যান্য বই —

কর্ণফুলি	মিতালী-মধুর
রঙের বিবি	নিশীথ-নিঝুম
বেগম বাহার লেন	দুলারীবাঈ
অনুরঞ্জিতা	অনেক সন্ধ্যা, একটি সন্ধ্যাতারা
পূর্বরাগের ইতিহাস	ইমন বেহাগ বাহার
অন্তরতমা	চন্দ্রচকোর
বিশাখার জন্মদিন	অতনু ও জীবন দেবতা
চায়না-টাউন	বাহাদুর শা'র সমাধি
রাজা ও মালিনী	শাহজাদা

শাহী মহল

— এক —

স্মিথ এ্যাণ্ড ব্রাউন কোম্পানির বড়বাবু নিশিকান্ত মিত্তির যখন তাঁর দৈনন্দিন কাজ শেষ করে ছাতা বগলে নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন তখন ডেলহাউসি স্কোয়ার অঞ্চলে সন্ধ্যার আলো জ্বলে উঠেছে। শ্রাবণ মাস, আকাশ মেঘে ঢাকা। সারা দুপুর পশলা পশলা বৃষ্টি হয়ে হয়ে পাঁচটার কিছু আগে থেমে গেছে। পথে কাদা, চলতি গাড়ি বাস ট্যাক্সি থেকে দূরে দূরে থাকতে হয়। ট্রাম স্টপ বাস-স্টপে অসম্ভব ভিড়। ট্রামে বাসে ওঠা দায়। কিন্তু অনেক বছরের অভ্যেস, পেছনের ভিড়ের চাপে সামনের ভিড়ের মধ্যে পথ করে কখন কিভাবে উঠে পড়লেন এক শ্যামবাজারের ট্রামে নিজেই বুঝতে পারলেন না। এসময়টুকুর কথা কোনো দিনই পরিষ্কার মনে থাকেনা। অবসন্ন মন ডুবে থাকে নিজের ভাবনায়। কনডাক্‌টার এসে যখন মান্থলি দেখতে চায় তখন একবার হুঁশ হয়, আরেকবার হয় যে স্টপে নামবেন তার ঠিক দুটো স্টপ আগে। বাকী সময়টুকু নানারকম ভাবনা কল্পনা এলোমেলো ঘুরে বেড়াতে থাকে মনের মধ্যে। ব্রাউন সাহেব কি বলেছে, লাহিড়ি সাহেবকে কি বলতে হবে, অনাথবন্ধুর শালীর ইতিবৃত্ত, ভজহরি চক্রবর্তীর চিরন্তন কুটিলতা, অফিসের নবাগতা মেয়ে-স্টেনোর অশালীনতা, গৃহিনীর শারীরিক অসুস্থতা, দুই পুত্রের ভবিষ্যত, কন্যার বিয়ের সম্বন্ধ, দেশের জ্ঞাতিদের সঙ্গে বৈষয়িক গোলযোগ, পৃথগান্ন কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের অন্যায় ব্যবহার, বাতের ব্যথা, মুদীর দোকানের পাওনা,........এটা........ওটা...... সেটা। আশেপাশে যারা থাকে তাদের কারো চেহারা, মুখের ভাব, কিছুই চোখে পড়ে না কোনোদিন। ট্রামে তো নয়, যেন নিজের ভাবনার স্রোতে ভেসে বাড়ি ফেরেন প্রত্যেক দিন।

ক্বচিৎকদাচিত বসবার জায়গা পেয়ে যান, আজও হঠাৎ তেমনি পেয়ে গেলেন। বসেছিলেন জানলার পাশে। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। সেখানে মেঘের ঘনঘটা, মনে হয় রাত্তিরে খুব বৃষ্টি হবে। নিশিকান্ত মিত্তিরের মনে হোলো, এ যেন নিজের ভবিষ্যতের চেহারা দেখছেন আকাশের দর্পনে। বড়ছেলে গতবছর বি-এ পরীক্ষায় ফেল করে এবার আবার দিয়েছে। ছোটো ছেলে এবার ম্যাট্রিক দেবে। একমাত্র মেয়ে সবিতা আই-এ পরীক্ষা দিয়েছে এবার, পরীক্ষার ফল বেরোবে আজ-কালের মধ্যেই। চাকরিটা আরো বছর দুয়েক থাকা প্রয়োজন। কিন্তু আজ একাউণ্ট্যাণ্ট সাহেবের কাছে শুনেছেন যে তাঁকে অবসর গ্রহণ করানো হবে মাস চারেক পরে। বোম্বে অফিস

থেকে একজন নতুন সায়েব এখানকার ডিরেক্টার হয়ে এসেছে। অত্যন্ত কড়া প্রকৃতির লোক, মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে সে রাজী নয়। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে চার পাঁচজন পুরোনো কর্মচারীকে অবসর গ্রহণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ভাবনা হয়েছে নিশিকান্তবাবুর। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ও গ্র্যাচুইটির টাকাটা পাওয়া যাবে বটে, কিন্তু মেয়ের বিয়ের খরচটা তুলে রাখবার পর যা থাকবে, সেটা বাকী জীবন সাদাসিধে ভাবে চালিয়ে দেওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়। বড়ো ছেলে সরোজের চাকরি যদি একটা হোতো তাহলে হয়তো অতো ভাবনা হোতো না। সে যে বুড়ো মা-বাপকে দেখবে সে প্রত্যাশা নিশিকান্তবাবু করেন না। নিজের কনিষ্ঠ দুই ভাই, যাদের তিনি লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছিলেন অনেক অভাব অনটনের মধ্যেও, তারা নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পর তাঁর সঙ্গে যা ব্যবহার করেছে, তাতে তাঁর যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। ছেলে দুটো নিজেরা স্বাধীনভাবে রোজগার করছে, এটা দেখতে পেলেই তিনি খুশী। কিন্তু তার কিছু দেরী আছে।

আরেকটা চাকরি কোথাও দেখতে হবে, নিশিকান্ত বাবু ভাবলেন, তাতে মাসে শ-খানেক টাকা পেলেও কিছুটা নিশ্চিন্ত।

ঠেলাঠেলি করে যাত্রীরা নামছে ট্রাম থেকে, ঠেলাঠেলি করে উঠছে। গাড়ি মোটর ঠ্যালা রিকশর ভিড়ের মধ্যে পথ করে কর্নওয়ালিস স্ট্রীট ধরে ট্রাম চলেছে শম্বুকগতিতে। নিস্তেজ দৃষ্টি মেলে জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখলেন পথ আর কতোটা বাকী।

আকাশের মেঘ একটু ফিকে হয়ে আছে এদিকটা। একটুখানি আকাশ দেখা যাচ্ছে।

নানারকম দুর্ভাবনার মধ্যেও একটুখানি আশার অবলম্বন আছে। অফিসের ক্যাশিয়ার ভবানী বাবু একটি ভালো সম্বন্ধ এনেছেন তাঁর মেয়ের জন্যে। যদি এখানে কথা পাকাপাকি হয়ে যায় তো একটা মস্তো বড়ো বোঝা নেমে যায় ঘাড়ের উপর থেকে।

বাড়ি ফিরতে মনে হোলো সবারই যেন খুব খুশী খুশী ভাব। বাইরের ঘরে বসে জটলা করছিলো তাঁর স্ত্রী তরুবালা, দুই ছেলে সরোজ আর সমর, পাশের বাড়ির একটি মেয়ে মঞ্জুশ্রী, আর সরোজের এক মাসতুতো ভাই সুধীন।

মন আর শরীরের ক্লান্তি নিয়ে খুব আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকলেন নিশিকান্ত বাবু।

প্রথমে তাঁকে কেউ লক্ষ্য করেনি। সরোজ খুব উৎসাহের সঙ্গে বলছিলো, "এত তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ার কী দরকার? নিজের জীবন নিজে গড়ে তুলবার স্বাধীনতা ওকে দেবে না? আরো পড়াশুনো করুক, বি-এ পাস করুক, এম-এ পাস করুক, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াক, আর দশজনের মতো নিজের একটা কেরিয়ার তৈরী করুক, তারপর ও যদি চায়—" বলতে বলতে চোখ পড়লো অফিস-ফেরত জনকের উপর। সে কথা শেষ না করে চুপ করে গেল, তারপর আস্তে আস্তে উঠে ভেতরে চলে গেল। তার পেছন পেছন চলে গেল অন্য সবাই। শুধু রইলো তরুবালা। নিশিকান্ত বাবু রাশভারী লোক, ছেলে মেয়েরা তাঁর কাছ থেকে একটু তফাতে থাকে।

নিশিকান্ত বাবু কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই তরুবালা বলে উঠলো খুব আনন্দোজ্বল মুখে, "জানো, সবিতা পাস করেছে। আজ আই-এর রেজাল্ট বেরিয়েছে। ও সেকেণ্ড ডিভিশান পেয়েছে।"

"তাই নাকি?" শুনে একটু খুশী হলেন নিশিকান্ত বাবুও। বললেন, "আর কি, তোমার মেয়ে পাস করেছে, রসগোল্লা খাইয়ে দাও আমায়।"

"রসগোল্লা আমি খাওয়াবো, না তুমি খাওয়াবে? মেয়ে তোমার নয়?" বলে উঠলো তরুবালা।

একথার উত্তর দিলেন না নিশিকান্তবাবু। বেফাঁস একটা দুটো হাল্কা কথা বলে ফেলেই আরো বেশী গম্ভীর হয়ে যান। খুব গুরুগম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "সরোজ কার কথা বলছিলো?"

সব রাশভারী স্বামীর স্ত্রীর মতোই তরুবালা একটু নিরীহ গোবেচারা ভালোমানুষ, ভয় পায় গুরুগম্ভীর স্বামীকে। ইতস্তত করে বললো, "সরোজ বলছিলো সবিতা যদ্দিন পড়াশুনো করতে চায়——"

তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে নিশিকান্ত বাবু বলে উঠলেন, "ও, সবিতার নিজের পায়ে দাঁড়ানোর কথা বলছিলো? আগে সরোজ নিজের ব্যবস্থা করুক, তারপর অন্যের ভাবনা ভাববে।"

তরুবালার মুখ ম্লান হয়ে গেল। সরোজ গতবার বি-এ পরীক্ষায় ফেল করেছে, এই নিয়ে তরুবালাকে খোঁটা খেতে হয় স্বামীর কাছে।

"সবিতা অন্তত বি-এটা পড়বে তো!" শুকনো মুখে জিজ্ঞেস করলো তরুবালা। তার খুব শখ ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর।

"আমার চাকরি আর চারমাস," গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন নিশিকান্তবাবু।

"সে কি!" তরুবালার মুখ শুকিয়ে গেল।

"হ্যাঁ, রিটায়ার করতে হবে, ওরা এক্সটেনশান দেবে না।"

স্বামীর দুর্ভাবনা ও আশঙ্কা অনুভব করলো তরুবালা। নিজেকে সামলে নিয়ে খুব মিষ্টিকরে বললো, "সে যা হয় পরে দেখা যাবে। এখন হাতমুখ ধুয়ে নাও। গরম গরম কচুরি তৈরী করেছি।"

নিশিকান্তবাবু অফিসের জামাকাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে এলেন। চা আর কচুরি নিয়ে এলো তরুবালা। রান্নার হাত খুব ভালো, সামান্য উপকরণ দিয়ে অসামান্য রান্না করে চিরকাল বশে রাখবার চেষ্টা করেছে সবাইকে। যখন দেখলো যে কচুরী খেতে খেতে পরম পরিতৃপ্তির প্রশান্তি ফুটে উঠেছে নিশিকান্ত বাবুর মুখে তখন খুব মিষ্টি করে বললো, "সবিতা বলছে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বি-এ পড়বে।"

কোনো উত্তর দিলেন না নিশিকান্ত বাবু।

"যদ্দিন বিয়ে না হয় তদ্দিন তো পড়াশুনো করুক" মৃদু গলায় বললো তরুবালা।

"একটা ভালো সম্বন্ধ এসেছে," উত্তর দিলেন নিশিকান্ত বাবু, "অফিসের ভবানীবাবুই যোগাযোগটা করিয়ে দিয়েছেন। ওরা রোববার বিকেলে দেখতে আসছে।"

তরুবালা একটু চুপ করে রইলো। মেয়ের এত তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে তার নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে তার কোনো হাত নেই। নিশি-কান্ত বাবু যা স্থির করেন তাই হবে।

আস্তে আস্তে বললো, "সবিতা এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে চায় না।"

"আগামী নভেম্বর মাসে আমাকে রিটায়ার করতে হবে," নিশিকান্ত বাবু উত্তর দিলেন, "সেটা খেয়াল আছে তো!"

তরুবালা বুঝলো যে, উপস্থিত আর বেশী বলা ঠিক হবে না। আস্তে আস্তে উঠে পড়লো।

নিশিকান্ত বাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সবিতা কোথায়?"

"বাণীদের বাড়ি গেছে।"

'কেন?"

"বাণীর সঙ্গে শ্যামলীর বাড়ি যাবে।"

"ফিরবে কখন?"

"সাড়ে সাতটা আটটার মধ্যে ফিরবে বলেছে।"

"বাদলা দিন, আজ কি না বেরোলে চলতো না?" বললেন নিশিকান্ত বাবু।

"আজ পরীক্ষার খবর বেরিয়েছে, বন্ধুরা সবাই মিলে একটু হৈ চৈ করবে, এই আর কি," কৈফিয়ত দিলো কন্যাবৎসলা জননী।

"ওকে বলে দিয়ো বাইরে বেরোনো কমিয়ে দিয়ে এবার একটু ঘর-সংসারের কাজকম্ম শেখায় মন দেবে," গম্ভীর গলায় বললেন নিশিকান্ত বাবু।

শ্যামবাজার অঞ্চলে আকাশ একটুখানি পরিষ্কার, বৃষ্টির কোনো আশু সম্ভাবনা নেই, কিন্তু চৌরঙ্গি অঞ্চলে ঝিরঝির করে বৃষ্টি সুরু হয়ে গেছে। বড়ো রাস্তায় যানবাহনের দুরন্ত গতি, বড়ো রাস্তার ওপারে ময়দানের দিকটা ঝাপসা, নির্জন, শান্ত। অসংখ্য আলো জ্বলে উঠেছে চারদিকে, পথে যেখানে যেখানে জল জমেছে, সেখানে ঝলমল করছে আলোর প্রতিবিম্ব।

তখন সাতটা বেজে গেছে।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলের ওদিক থেকে হাঁটতে হাঁটতে আসছিলো কুড়ি একুশ বছরের একটি ছেলে ও সতেরো আঠারো বছরের একটি মেয়ে। কথা বলতে বলতে ওরা থিয়েটার রোডের মোড়ে ট্রাম স্টপে এসে দাঁড়ালো। দুজনের গায়ে দুটো বর্ষাতি।

ছেলেটি বললো, "ট্রামে চেপে কি হবে, চলো হাঁটতে হাঁটতে যাই। এখান থেকে লিণ্ডসে স্ট্রীট কতোটুকুই বা পথ? মিনিট দশ পনেরোর মধ্যেই পৌঁছে যাবো। টেরই পাবো না। সত্যি, তোমার সঙ্গে সময়টা কী ভাবে কেটে যায় বুঝতেই পারি না।"

মেয়েটি হাসলো। সুদূর দক্ষিণে তাকিয়ে বললো, "একটিও ট্রামের দেখা নেই।"

এসপ্লানেড থেকে যে ট্রামগুলো আসছিলো সেগুলো অফিস-ফেরত বালিগঞ্জের যাত্রীতে বোঝাই। আধ মিনিট এক মিনিট পর পর আসছিলো একটার পর একটা। কিন্তু এসপ্লানেড-মুখো একটি ট্রামেরও দেখা নেই।

ছেলেটি বললো, "চলো হেঁটেই যাই।"

"নিউ মার্কেটের সামনে বাণী আর শ্যামলী অপেক্ষা করে থাকবে যে," বলে উঠলো মেয়েটি, "ওদের বলেছিলাম সাতটার মধ্যে ফিরবো।"

"দেরী না হয় একটু হোলোই বা।"

"যদি শ্যামলী আর বাণীকে দাঁড়িয়ে থাকতে না হোতো তাহলে নিশ্চয়ই হেঁটে যেতাম। ওই দূরে একটা ট্রাম দেখা যাচ্ছে।"

"আবার কবে দেখা হবে, সবিতা?"

পরশু তো শনিবার। একটু তাড়াতাড়ি এসো, কেমন?"

"আড়াইটে থেকে তিনটের মধ্যে, তার আগে তো হবে না বিদ্যুত, বাড়িতে তো বলে আসতে হবে যে শ্যামলীর সঙ্গে সিনেমায় যাচ্ছি।"

বিদ্যুত হাসলো। এ রকম ব্যবস্থা আজ কয়েক মাস ধরে অনবরত হচ্ছে। শ্যামলী আর বানীর সঙ্গে বেরোচ্ছে সবিতা, তারপর বাড়িও ফিরছে ওদের সঙ্গে। মাঝখানে কিছু সময় বার করে নিয়ে দেখা করছে বিদ্যুতের সঙ্গে। আজও প্রায় ঘণ্টা ছয়েক ওরা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালে ভিজে ঘাসের উপর বসে কাটিয়েছে, সে সময়টা শ্যামলী আর বাণী কাটিয়েছে ভবানীপুরে ওদের এক বন্ধুর বাড়িতে। বাড়ি ফেরার পথে ওরা সাতটা নাগাদ নিউমার্কেটের সামনে অপেক্ষা করবে, সবিতা এলে ওকে সঙ্গে করে বাড়ি পেঁৗছে দিয়ে নিজেদের বাড়ি ফিরবে। হয়তো সবিতা আজ তাদের টেনে বাড়ির ভিতর নিয়ে যাবে, তাহলে বাবা কিছু বলতে পারবেন না। বাড়ি ফিরতে একটু দেরী হয়ে গেলে একা ফেরার চাইতে অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে ফেরা অনেকটা বেশী নিরাপদ। পিতৃদেব হয়তো নেপথ্যে জননীকে জিজ্ঞেস করবেন, "ওর এত দেরি হোলো কেন?" জননী উত্তর দেবেন, "দেরি একটু হয়েছে তো অতো রাগ করবার কি আছে, শ্যামলী কি বাণীদের বাড়ি তো ওর কাছে নিজের বাড়ির মতোই। দেরি হয়েছে বলে কি ওদের কম ভাবনা? দেখ তো, নিজেরাই সঙ্গে করে বাড়ি পেঁৗছে দিয়ে গেছে।" শ্যামলী হয়তো বাইরে থেকে চেঁচাবে, "মাসীমা, ও মাসীমা, সবিতা পাস করলো, আমাদের মিষ্টি খাওয়াবেন না?" সবিতার গলা শোনা যাবে, "আর কতো মিষ্টি খাবি, বাণীদের বাড়ি এত মিষ্টি খেয়ে তোর পেট ভরলো না? এবার বাড়ি যা।" বাইরে ছুটে আসবেন সবিতার মা, "ওমা, সে কি কথা? বাড়ি যাবে কেন? আজকের দিনে বাড়ি এসেছে, শুধু মুখে চলে যাবে সে কি হয়? এসো শ্যামলী, রান্নাঘরে এসো, আজ কচুরি বানিয়ে রেখেছি তোমাদের জন্যে—।" শ্যামলী আর বাণী সমস্বরে বলবে, "না, না, মাসীমা আমরা সারা বিকেল খুব খেয়েছি, এমনি এমনি বলছিলাম—।" "ওসব কথা শুনবো না, এসো," বলবেন সবিতার মা।

কারো খেয়াল থাকবে না সবিতা একটু দেরি করে ফিরেছে। কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না যে সারাটা বিকেল সন্ধ্যে সবিতা কাটিয়েছে আরেকটি ছেলের সঙ্গে।

বিদ্যুত নিজের মনে হাসলো। একটা বিরাট দার্শনিক তথ্য সে শুনিয়ে দিলো নিজের মনকে,—এরকমই হয়। সংসারে কে কাকে আটকাতে পারে? কড়া অভিভাবকের নন্দিনীরা তাদের অভিভাবকদের চাইতে অনেক বেশী চালাক।

শুনলো সবিতা বলছে, "শনিবার তিনটের শো'র দুটো টিকিট কিনে রেখো।"

বিদ্যুত বললো, "না বাবা, ওই দু তিন ঘণ্টা সময় আমি তোমার পাশে চুপচাপ বসে কাটাতে রাজী নই।"

"আমাদের জন্যে নয়। বাণী আর শ্যামলীর জন্যে।"

"ওরা নিজেদের টিকিট নিজেরা কিনতে পারছে না?" বিদ্যুত কপট বিরক্তিতে জিজ্ঞেস করলেন।

"ওদের অতো গরজ কিসের?" হাসতে হাসতে উত্তর দিলো সবিতা।

ট্রাম এসে গেল ইতিমধ্যে।

লিণ্ডসে স্ট্রীটের মোড়ে ট্রাম থেকে নেমে দুজনে চৌরঙ্গি উপর এসে দাঁড়ালো দু ধারের যানবাহন চলাচলে লাল-আলো-দেখানো বিরতির প্রত্যাশায়।

বিদ্যুত বললো, "সবিতা, আমরা একলা আছি আর তিন চার মিনিট। তাহলে কি ঠিক হোলো আমাদের?"

"শনিবার আড়াইটে থেকে তিনটের মধ্যে—"

"না, সে কথা বলছিনা। এতক্ষণ কি বলছিলাম? তুমি ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বি-এ পড়বে।"

"ইতিমধ্যে তুমি এম-এ দেবে সামনের বছর, যেমনি করেই হোক একটি ফাস্ট্ ক্লাস নেবে, ফাস্ট্ হলে তো কথাই নেই, তারপর একটা প্রফেসারি যোগাড় করে নেবে কোথাও না কোথাও—।"

"আর সঙ্গে সঙ্গে আমি তোমার বাবার কাছে গিয়ে—"

তাড়া দিয়ে সবিতা বললো, "লাল আলো জ্বলে উঠেছে, এসো রাস্তা পার হই আগে।"

এপারে এসে সবিতা বললো, "তারপর আমিও এম-এ পাস করবো ইংরেজিতে। তদ্দিনে তুমি প্রফেসারি করে আর টিউশানি করে যা পাবে, সবই জমাবে।"

"সবটাই? মাথা খারাপ!"

"উহুঁ। আমি একটি পয়সাও খরচা করতে দেবোনা। তোমার আবার কি খরচা। তোমাদের অবস্থা ভালো, তোমায় তো আর বাড়িতে টাকা দিতে হবে না।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, না হয় জমালাম। তারপর?"

"তারপর তুমি আর আমি বিলেত যাবো।"

"ওই টাকায়?"

"বিলেতে গিয়ে চাকরি করবো। কিংবা কোনো একটা স্কলারশিপ যোগাড় করে নেবো। কতো রকম স্কলারশিপ হয়েছে আজকাল—।

কথা বলতে বলতে ওরা এসে গেল নিউমার্কেটের কাছাকাছি।

শ্যামলী আর বাণী দাঁড়িয়ে ছিলো একটি ঘড়ির দোকানের সামনে। সবিতাকে দেখতে পেয়ে ওরা এগিয়ে এলো।

তেতলা বাড়ির দোতলার একটি ফ্ল্যাট। লম্বা সরু বারান্দার পাশে পর পর তিনখানি কামরা। সামনেরটা বসবার ঘর, দুটো তক্তপোশ ও খান তিন চার পুরোনো চেয়ার ও একটি কাচের আলমারি আছে সে ঘরে। রাত্তিরে সে ঘরে মশারি খাটিয়ে ঘুমোয় সরোজ আর সুধীন। মাঝখানের ঘরে আছে একটি সেকেলে খাট, আলনা, কাঠের আলমারি আর বই-সাজানো দুটো টেবিল। সে ঘরে সকাল সন্ধ্যা ছেলেমেয়েরা পড়াশুনো করে, রাত্তিরে ঘুমোয় তরুবালা ও সবিতা। পেছন দিকের ঘর পুরোনো ট্রাঙ্ক-তোরঙ্গ, লেপ আর টুকিটাকি জিনিসপত্তরে ঠাসাঠাসি। এক কোনে একটি তক্তপোশ। সে ঘরে নিজের মনে নিরিবিলিতে থাকেন নিশিকান্ত বাবু।

বেশ রাত হয়ে এসেছে। বাইরে রিমঝিম বৃষ্টি। মেঘ ডাকছে আকাশে। নিশিকান্ত বাবুর খাওয়া শেষ হয়েছে অনেকক্ষণ। গড়গড়ার ছিলিম নিভে এলো। আলো নিভিয়ে, গায়ের উপর একটা পাতলা চাদর টেনে তিনি শুয়ে পড়লেম। তরুবালাও রান্নাঘরের কাজকর্ম সব শেষ করে সবে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। চুপচাপ কি যেন কথা হচ্ছে মা-মেয়ের মধ্যে। নিশিকান্ত বাবু চোখ বুজে পাশ ফিরলেন।

হঠাৎ সবিতার গলার আওয়াজ খুব চড়া হয়ে উঠলো। নিশিকান্ত বাবুর কানে এলো, "না, না, কক্ষনো না। আমি এখন বিয়ে করতে পারবো না। বাবাকে বলে দাও ওদের আসতে মানা করে দিতে।"

তরুবালা কি যেন বললো চাপা গলায়, নিশিকান্ত বাবু পরিষ্কার শুনতে পেলেন না।

"আমার অমতে তোমরা আমার বিয়ের ঠিক করাবার কে?" বলে উঠলো সবিতা।

ও ঘরের আলো তখনো নেভানো হয়নি। নিশিকান্ত বাবু গায়ের কাপড় সরিয়ে শয্যা ত্যাগ করে উঠে এলেন। তাঁকে দেখে সবিতা মুখ ঘুরিয়ে ওপাশ ফিরলো। তরুবালা শুয়ে পড়েছিলো, তাড়াতাড়ি উঠে বসলো।

"কি বলছিলো তোমার মেয়ে," জিজ্ঞেস করলেন নিশিকান্ত বাবু।

"না, না, কিছু না," তরুবালা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করলো।

"ওকে বলে দাও, আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি, ততক্ষণ এ সংসারে আমি যা ঠিক করবো তাই হবে। ওনার অমতে আমরা ওনার বিয়ের ঠিক করবার কে! কলেজে পড়ে এই শিক্ষা হচ্ছে! কি গো, তুমি তোমার বাবাকে মাকে মুখের উপর বলতে পারতে একথা? এখন শোনো তোমার মেয়ে কি বলছে! তুমিই তো শখ করে কলেজে পড়তে দিয়েছো।"

"থাক, থাক, তুমি এখন মাথা ঠাণ্ডা করে শুয়ে পড়ো গে যাও," বলে উঠলো তরুবালা।

"আমার মাথা ঠিকই আছে। কথা বলতে গিয়ে যাদের গুরুলঘু জ্ঞান থাকে না, রাতদুপুরে পাড়ার দশজন লোককে শুনিয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করে, তাদের মাথা ঠাণ্ডা করতে বলো।"

"ও এখনো ছেলেমানুষ। ওর কথায় কি কান দিতে আছে? তুমি যাও।"

"ছেলেমানুষ! হুঁঃ।" নিজের মনে গজ গজ করতে করতে চলে গেলেন নিশিকান্ত বাবু। ওঁর ঘরের তক্তপোশে মড়মড় করে একটা আওয়াজ হোলো। সবিতা আর তরুবালা শুনলো নিশিকান্ত বাবু নিজের মনে ওদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলছেন, "মেয়ের বিয়ে মা-বাবা ঠিক করবে না তো কে করবে শুনি? মেমসায়েবদের মতো নিজে ঠিক করবেন? আজ পয়ত্রিশ বছর ধরে আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলছি কিসের জন্যে শুনি?"

তরুবালা দেখতে পেলো সবিতা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আস্তে আস্তে মেয়ের গায়ে হাত বুলিয়ে বললো, "ওর কথায় কান দিস না। ওঁর স্বভাব তো জানিস ওরকমই। বাইরে অতো কড়া মেজাজ। কিন্তু যা করেন, সবার ভালোর জন্যেই তো। নে, এবার ঘুমো।"

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো তরুবালা।

কথাগুলো সবই সরোজের কানে গিয়েছিলো। বোনের জন্যে তার একটু কষ্টও হচ্ছিলো। কিন্তু এ ব্যাপারে তার কোনো হাত নেই। যদি তার নিজের রোজগার থাকতো তাহলে সে সবিতার জন্যে কি করতো, সে সব কল্পনা করতে করতে সে ঘুমিয়ে পড়েছিলো এক সময়।

সকালবেলা হাত মুখ ধুয়ে রান্নাঘরে এসে দেখে, সবিতা চুপচাপ একা

বসে চা তৈরী করছে সবার জন্যে। তার মুখ ভার, চোখ দুটি ফোলা ফোলা। সরোজকে দেখে চায়ের কাপ এগিয়ে দিলো তার দিকে।

সরোজ একটু ভাবলো কি ভাবে কথা সুরু করা যায়। তারপর বললো, ''বাবা এখনো সেই উনবিংশ শতাব্দীতে পড়ে আছেন।''

সবিতা কোনো উত্তর দিলো না। রুটিতে মাখন লাগিয়ে একটি ডিশে রেখে সেটি ঠেলে দিলো সরোজের দিকে।

সরোজ টোস্ট তুলে একটা কামড় দিলো। সবিতা এক কাপ চা তৈরী করে নিলো নিজের জন্যে। সরোজ তাকিয়ে দেখলো সবিতাকে, তারপর খুব স্নিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, ''তোর খুব পড়াশুনো করবার ইচ্ছে, না রে ?''

সবিতা একথার কোনো উত্তর দিলো না। একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, ''দাদা, তোমার রেজাল্টও তো বেরোবে আর কয়েকদিনের মধ্যেই। তারপর চট করে যা হোক একটা চাকরি যোগাড় করে নিতে পারবে ?''

ওর কথা শুনে সরোজ একটু অবাক হোলো। ''কেন রে ?'' জানতে চাইলো- সে।

''আমি একটু জোর পাবো। বাবার অবাধ্য হয়ে তো আর আমার কলেজে পড়ার খরচা ওঁর উপর চাপানো যাবে না। তিন চার মাসের মধ্যেই ওঁকে রিটায়ার করতে হবে।''

সরোজ একটু দমে গেল সবিতার কথা শুনে। ওর চার্টার্ড একাউণ্টেন্সি পড়বার ইচ্ছে। পাশের বাড়ির মঞ্জুশ্রীর বাবার খুব চেনাজানা আছে একটি ফার্মের সিনিয়ার পার্টনারের সঙ্গে। তিনি বলেছেন সুবিধে করে দেবেন। প্রিমিয়ামের টাকা যেটা লাগবে, সেটা বাবার কাছেই চাইতে হবে, যাতে ওঁর প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা থেকে ব্যবস্থা হয়। মা ছাড়া আর কেউ জানে না, মঞ্জুশ্রী ভরসা করে আছে তার উপর।

একটু ভেবে বললো, ''দ্যাখ, তাতে যে কারো খুব সুবিধে হবে বলে মনে হয়না। শুধু বি-এ ডিগ্রী নিয়ে আমি কিই বা চাকরি পাবো, আর—।''

কথা শেষ করতে পারলো না সে। দেখলো সবিতা চায়ের কাপ নামিয়ে তাকিয়ে আছে আর দিকে। চোখে তার বিস্মিত বেদনা।

সরোজ আস্তে আস্তে বললো, ''বিয়ে তো তোকে একদিন না একদিন করতেই হবে। যদ্দূর শুনেছি, ছেলেটি ভালো, মর্টিমার এ্যাণ্ড ফিশার কোম্পানিতে ভালো চাকরি করে। আমার মনে হয় বিয়ের পর তুই যদি আবার কলেজে পড়তে যাস তো সে আপত্তি করবে না। আমরা নিশ্চয়ই বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওকে রাজী করাতে পারবো।''

একটু কঠিন হয়ে উঠলো সবিতার মুখ। কিন্তু খুব শান্ত গলায় বললো, 'থাক, তোমার আর মাথা ঘামাতে হবে না।"

সবিতা বিদ্যুতের কথা শেষ পর্যন্ত মাকে না বলে পারলো না। তরুবালা রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে, গোঁড়া মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহিনী, কিন্তু মন অবুঝ নয়। মন ভরা একটা প্রীতি ভালোবাসা সহানুভূতি আছে, যার দরুণ মানুষের অন্তরের শান্তি ও সুখকে সব কিছুর উপরে স্থান দেয়। কিন্তু প্রকৃতি অতো শক্ত নয় বলে নিজের অভিমত সব সময় জাহির করতে পারে না, যা করবার তা মিষ্টি কথা বলে একটু চালাকি করে একটু মানিয়ে গুছিয়ে রইয়ে সইয়ে করে নেওয়ার চেষ্টা করে। প্রথমটা মেয়েকে বোঝানোর চেষ্টা করলো যে এসব কিছু নয়, বয়েস হবার মুখে ওরকম একটু দুর্বলতা অনেকের হয়, কারো কম কারো বেশী। পরে সব কেটে যায়। এই বয়েসে যা কিছু এত বেদনাময় মনে হয়, বছর কয়েক পরে এসব অত্যন্ত ছেলেমানুষি মনে করে হাসি পাবে। এসব হোলো জীবনের পরীক্ষা, মন শক্ত করে ঠোঁট কামড়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

"কর্তব্যের পথ, মা, বড্ড কঠোর," খুব মিষ্টি গলায় শেষ করলো তরুবালা।

সবিতা মুখ নিচু করে শুনলো, তারপর জিজ্ঞেস করলো, "একজনের প্রতি যা কর্তব্য সেটা যদি আরেক জনের প্রতি যা কর্তব্য তার উল্টো হয়, তখন?"

"যা সত্য, যা ধর্ম, তাই নির্দেশ করে দেবে তোমার কি কর্তব্য।"

সবিতা গম্ভীর হয়ে বসে রইলো কিছুক্ষণ তারপর সমস্ত কুণ্ঠা কাটিয়ে বলে ফেললো, "আমি বিদ্যুতকে ভালোবাসি। তার চেয়ে বড়ো সত্য আমার কাছে আর কিছু নেই।"

সতেরো বছর বয়েসের বাচ্চা মেয়ের মুখে এত বড় কথা শুনে তরুবালা স্তম্ভিত হোলো। বুঝলো যে, ব্যাপারটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। জোর খাটানো যাবে না এ মেয়ের উপর, তাতে কেলেঙ্কারি হবার সম্ভাবনা। বেশ তো, বিদ্যুতের সঙ্গে যদি বিয়ে হয় তো আনন্দের কথা। কিন্তু স্বামীকে তরুবালা চেনে, উনি এরকম সমস্ত ব্যাপারের অত্যন্ত বিরোধী, এবং কিছুতেই রাজী হবেন না। কিন্তু, সব কিছুর উপরে মেয়ের সুখের প্রশ্ন বড়।

একটু ভাবলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "ওদের পদবী কি?"

"চৌধুরী।"

"কোন জাত? আমাদের মতো কায়েত তো?"

"তা তো জানিনা!"

"সে কি কথা?" জিজ্ঞেস করলো তরুবালা, "ওর সঙ্গে এত ভাব, ও কোন জাত তার খবর রাখিস না?"

"জাত কুল মিলিয়ে কেউ ভাব করে নাকি?" সবিতা হেসে ফেললো।

"ও কি করছে এখন?"

"এম-এ দেবে এবার।"

"ও তোকে এখনি বিয়ে করতে রাজী হবে তো?"

"এখনি?"

"এখনি?"

"হ্যাঁ, কাউকে না জানিয়ে নয়, দু'পক্ষে রীতিমতো কথাবার্তা করে দিনক্ষণ দেখে দশজনকে ডেকে নেমন্তন্ন করে যে ভাবে হয়, তেমনি, ও যদি ওর মা-বাবাকে রাজী করিয়ে নিতে পারে, তাহলে আমি ওঁর হাতে পায়ে ধরে যেমন করে হোক রাজী করাবোই। তুই ওর সঙ্গে একবার কথা বলে নে।"

— দুই —

বিদ্যুত যথারীতি বাণী আর শ্যামলীর জন্যে সিনেমার টিকিট কিনে অপেক্ষা করছিলো ওদের জন্যে। সবিতার সঙ্গে বাণী আর শ্যামলী যখন এলো তখন তিনটে প্রায় বাজে। বাণী আর শ্যামলীকে সিনেমায় ঢুকিয়ে দিয়ে বিদ্যুত আর সবিতা চলে গেল অন্য দিকে।

সেদিন শনিবার অপরাহ্ন ছিলো খুব স্নিগ্ধ আর হাল্কা রোদ্দুরে ঝলমলো। এসপ্লানেড অঞ্চলে শনিবারের ভিড়। ওরা বাসে চেপে চলে গেল হেস্টিংস্‌এর দিকে, তারপর গঙ্গার ধারে একটি নিরিবিলি জায়গা খুঁজে নিয়ে বসে পড়লো পাশাপাশি।

গঙ্গায় তখন ভরা জোয়ার। একটি ছোটো লঞ্চ হুইস্‌ল্‌ বাজিয়ে মন্থর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিলো উত্তর দিকে। সেদিকে তাকিয়ে ছিলো সবিতা।

বিদ্যুত বললো, "জানো, আজ সারাদিন তোমার কথা ভাবছিলাম।"

সবিতা কোনো উত্তর দিলো না।

বিদ্যুত বলে গেল, "সকাল বেলা সঞ্চয়িতা থেকে কয়েকটি কবিতা পড়ছিলাম। সত্যি, রবীন্দ্রনাথ যেন আমারই মনের কথাগুলো দিয়ে তাঁর প্রত্যেকটি কবিতা রচনা করেছেন। তাই না, সবিতা?"

সবিতা চুপ করে রইলো।

বিদ্যুত সবিতার হাতখানি তুলে ধরলো নিজের হাতে। খুব ঠাণ্ডা আর শুকনো মনে হোলো সবিতার হাতখানি। কিন্তু তার মনে গঙ্গার মতো ভাবাবেগের জোয়ার এসেছে। অন্যের হাতের তাপ ও শুষ্কতা নিয়ে ভাবিত হবার মত মন তখন নয়। জিজ্ঞেস করলো, "কবে আমরা সংসার করবো সবিতা? যখন ভাবি, সত্যি, আমাদের আরো কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হবে, তখন মনে হয়, অতো ধৈর্য কি আমার থাকবে? আমি কিছুই চাই না সবিতা, বিশ্বাস করো আমায়। আমার যদি ছোট্টো একটা কুঁড়ে ঘর থাকে এরকম একটা ছোটো কি বড়ো নদীর ধারে, আর সেঘরে যদি তুমি বধূ হয়ে আসো, ব্যস, তাইতেই আমি সুখী হবো। জীবনে আর কিছু আমার কি দরকার!"

সবিতা ফিরে তাকালো বিদ্যুতের দিকে। তার মুখের উপর বিদ্যুতের চোখ পড়লো। এতক্ষণে বিদ্যুতের খেয়াল হোলো যে সবিতা আজ আর অন্যান্য দিনের মতো তার কল্পনাবিলাসের জাল বোনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজের ছেলে-

মানুষী কথার বর্ণবিন্যাস করছে না। আজ সে একটু গম্ভীর। বললো, "কি হোলো সবিতা ? তুমি কোনো কথা বলছো না যে ?"

সবিতা আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা বিদ্যুত, তোমরা কোন জাত ?"

"আমরা কোন জাত! কেন ?" বিদ্যুত অবাক হোলো সবিতার প্রশ্ন শুনে।

"বলো না !"

"আমরা কায়েত, তোমাদের পালাটি ঘর। সেদিক থেকে কোনো অসুবিধে হবে না।"

সবিতা তাকিয়ে দেখলো বিদ্যুতকে। জিজ্ঞেস করলো, "অসুবিধে তাহলে কোন দিক থেকে হবে ?'"

"অসুবিধে ? অসুবিধে হতে যাবে কেন ? কোনো অসুবিধে হবে না। আমি তোমায় পছন্দ করে বিয়ে করবো, তুমি আমায় পছন্দ করে বিয়ে করবে, অসুবিধে হতে যাবে কেন ? সে জন্যেই তো বলছি, আমি এম-এটা পাশ করে নিই। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারলে তোমার মা-বাবা আপত্তি করবেন না, আপত্তি করলেও—"

"মনে করো আমার মা বাবার কোনো আপত্তি নেই।"

"তাহলে তো কোনো কথাই নেই।"

"তোমার মা-বাবা ?"

"আমার মা-বাবাকে আমি রাজী করাতে পারবো।"

সবিতা চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ।

"কি ভাবছো সবিতা ?"

সবিতা কোনো উত্তর দিলো না।

"আজ তোমার কি যেন হয়েছে।"

সবিতা এবার একটু হাসলো। তবে, সে হাসি কিছুটা বিষণ্ণ।

"আমায় বলবে না সবিতা ?"

"বলবো। তোমায় বলবো বলেই তো আজ এলাম। তা নইলে আজ আর আসার উপায় ছিলো না।"

"কেন ?"

"বাবার হুকুম হয়েছে, বাড়ি থেকে কিছুদিন আর বেরোনো চলবে না।"

"কিছুদিন! কদ্দিন ?"

"যদ্দিন আমার বিয়েটা হয়ে না যায়।"

"বিয়ে-টা ? মানে ?" আকাশ থেকে পড়লো বিদ্যুত।

সবিতা চুপ করে রইলো।

"বলো না সবিতা, কি হয়েছে ?"

সবিতা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

কিছুক্ষণ সাধাসাধি করে বিদ্যুত চটে গেল।

"মেয়েদের ওই এক দোষ। কথার আধখানা মুখে, আধখানা পেটে। পরিষ্কার খুলে বললেই হয়!"

"কিছুই বুঝতে পারছো না ?" বললো সবিতা।

"কি বুঝবো ?"

"বাবা আমার বিয়ের ঠিক করছেন।"

বিদ্যুত স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলো সবিতার দিকে। তারপর বললো, "তুমি তোমার অমত জানাওনি ?"

"জানিয়েছি। তাতে কোনো লাভ হবে না।"

"কেন ?"

"বাবা মাস কয়েকের মধ্যে রিটায়ার করছেন। তার আগে আমার বিয়ে দিয়ে দেবেনই।"

"তুমি বলে দাও তুমি এখন বিয়ে করবে না।"

"বলে কোনো লাভ নেই।"

"তুমি আরো পড়াশুনা করবে।"

"বাবা শুনবেন না।"

"কতো মেয়ে তাই করছে আজকাল।"

"বাবার কাছে সেটা কোনো যুক্তি নয়।"

"মেয়েদের কোনো ব্যক্তি-স্বাধীনতা নেই ?"

"বাবার কাছে ওকথার কোনো মানে নেই। ওঁর কর্তব্য, মেয়ের বিয়ে দেওয়া, রিটায়ার করবার আগে সে কর্তব্য সম্পাদন করে যেতে চান, বিশেষ করে যখন ভাল পাত্র পেয়েছেন।"

"তুমি ছেলে হলে কি হোতো ? উনি তোমায় লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবার চেষ্টা করতেন না?"

সবিতা হাসলো। বললো, "আমার বাবার দুটো পুত্রসন্তান কাছে। ওদের উপর উনি খুব ভরসা করেন না। আর আমি যখন ছেলে নই, তখন এসব আলোচনা করে লাভ কি।"

বিদ্যুত চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে বললো, "তুমি

অন্যের হবে, আর আমাকে সারা জীবন একলা কাটাতে হবে, একথা আমি ভাবতে পারছি না সবিতা।"

"আমিও পারছি না।"

"তা হলে উপায় ?"

"তুমি বলো। আমি তোমার উপর সব ছেড়ে দিলাম।"

"আমার উপর।" বিদ্যুতের মুখের ভাব খুব করুণ হয়ে গেল। কোনো উত্তর দিলো না। কি যেন ভাবছিলো সে। অনেকক্ষণ পরে বললো, "আচ্ছা, সবিতা, মনে করো একদিন দেখা গেল, তুমিও বাড়ি ফেরো নি, আমিও বাড়ি ফিরিনি। সবাই অপেক্ষা করছে। রাত এগারোটা বাজলো, বারোটা বাজলো, একটা বাজলো। তোমার বাবা আর পারলেন না, পুলিসে খবর দিলেন। সারারাত খোঁজাখুঁজি, কোথাও আমাদের পাত্তা নেই। সকালবেলা ওই মাঝিরা হঠাৎ দেখতে পেলো। খবর পেয়ে পুলিস, বাড়ির লোকজন সবাই এখানে এসে গেল। দেখলো, এই গাছের নিচে দুজন দুজনের হাত ধরে শুয়ে আছি। দেহে প্রাণ নেই। পাশে একটা চিঠি পড়ে আছে। তাতে আমরা লিখে গেছি, —আমরা দুজন কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারবো না। তাই, এ জীবনে যখন আমাদের মিলন সম্ভব হোলো না, আমরা চিরবিদায় নিলাম এই নিষ্ঠুর পৃথিবীর অবুঝ সমাজের কাছ থেকে।"

সবিতা হেসে ফেললো। বললো, "আমি মরতে যাবো কোন দুঃখে, মরতে চাও তো তুমি মরো গে যাও।"

বিদ্যুতের মুখ দেখে মনে হোলো সে যেন সবিতার কথা শুনে একটু আহত হয়েছে। সবিতার হাত ছেড়ে দিয়ে সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, বেশ, তুমি বিয়ে করো। আমার যা করবার আমি করবো।"

"কি করবে তুমি ?"

"সেকথা তুমি নাই বা জানলে।"

"কেন ?"

"তোমার কি আসে যায়।"

সবিতার চোখে জল এসে গেল, কিন্তু সে সামলে নিলো নিজেকে, যতোটা সম্ভব সহজ হওয়ার চেষ্টা করে বললো, "সত্যি, আমার কি আসে যায় ?"

বেশ কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইলো। তারপর এক সময় বিদ্যুত আর পারলো না, বলে উঠলো, "আচ্ছা সবিতা, সত্যি করে বলো, আমাদের এত দিনকার এত ভাব ভালোবাসা, এত কথা, এত কল্পনা, সবই কি মিথ্যে ?

তোমার বাবা যাঁর সঙ্গে তোমার বিয়ের ঠিক করছেন, তুমি এত সহজে তার গলায় মালা পরিয়ে দিতে পারবে ?"

"আমি কি সেকথা বলেছি," বলতে বলতে সবিতার গলা ধরে গেল।

"তাহলে ?"

"তুমি বলো আমরা কি করতে পারি ?"

বিদ্যুত একটু ভাবলো, তারপর বললো, "চলো, আমরা পালিয়ে যাই।"

"কোথায় ?"

"এত বড়ো পৃথিবীতে কি আমাদের দুজনের জায়গা হবে না ?"

"না হয় হোলো," বললো সবিতা, "তারপর ?"

"তারপরের জন্যে ভাবিনা। তুমি তো পাশে আছো। ভাবনা কিসের ? থাকবার জন্যে একটি কুঁড়ে ঘর আর দুবেলা দুমুঠো ভাত আমাদের জুটে যাবে।"

সবিতা হেসে ফেললো।

"হাসছো কেন ?"

"এমনি।"

"সত্যি বলছি, চলো আমরা চলে যাই—।"

"না।"

"মানে ?" বিদ্যুত অবাক হোলো।

"ওসব পালানো টালানো আমার দ্বারা হবে না।"

"কেন ? ভয় করে বুঝি ?"

"ভয়-টয় আমার নেই। ওসব আমার আত্মসম্মানে বাধে। পালাতে যাবো কেন ? কী অন্যায় করছি আমরা ?"

"তা হলে আর কি করতে পারি বলো," ব্যথিত কণ্ঠে বিদ্যুত বললো।

একটু চুপ করে থেকে সবিতা বললো, "বলবো ?"

"হ্যাঁ বলো।"

সবিতা ভাবলো কিছুক্ষণ, তারপর বললো, "দেখ, মাকে আমি সব খুলে বলেছি।"

"বলেছো ? আমার কথাও বলেছো ?"

"হ্যাঁ।"

"তা, কি বললেন তিনি," ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো বিদ্যুত।

"মা বললেন, বেশ, বিদ্যুতের মা-বাবা যদি রাজী হন, ওঁকে রাজী করানোর ভার আমার। তবে ওঁর পেনশান হওয়ার আগেই বিয়ে হবে।"

বিদ্যুতের মুখ বিবর্ণ হোলো, "কিন্তু—"
"কিন্তু কি ?"
"এখনই বিয়ে হলে চলবে কি করে ?"
কেন ?"
"আমার তো কোনো রোজগার নেই। তোমার ভার যে নেবো, তার সংস্থান চাই তো।"
"তার জন্যে তোমায় এক্ষুনি ভাবতে হবে না। তুমি ধীরে সুস্থে একটা চাকরি যোগাড় করে নাও। যদি প্রয়োজন হয় আমিও চাকরি করবো।"
বিদ্যুতের ভুরু দুটি কুঞ্চিত হোলো, "আমার এম-এ পরীক্ষা ?"
"সে পরে প্রাইভেট দিয়ে দেবে।"
"কিন্তু এদ্দিন পড়াশুনো করে এম-এটা না দেওয়া কি ঠিক হবে ? বিশেষ করে, যখন আমার খুব ভালো রেজাল্ট করার সম্ভাবনা আছে ?"
সবিতা তাকিয়ে দেখলো বিদ্যুতকে। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি যে বলছিলে দুজনে মিলে মরবার কথা, পালিয়ে যাওয়ার কথা, তখন এম-এ পরীক্ষা দিতে কি করে ?"
"প্রশ্ন সেটা নয়," বিদ্যুত তাড়াতাড়ি উত্তর দিলো, "প্রশ্নটা হোলো এই, আমি এম-এ দেওয়ার আগে আমার বিয়ে দিতে বাবা রাজী হবেন কিনা।"
"তুমিই বলো।"
"উনি রাজী হবেন না সবিতা। আমার জন্যে এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটা ভালো ভালো সম্বন্ধ এসেছে, ভালো পণ দিতে চেয়েছে প্রায় প্রত্যেকেই, বাবা রাজী হন্ নি। এম-এর পর উনি আমায় ব্যারিস্টারি পড়বার জন্যে বিলেত পাঠাবেন স্থির করেছেন, এজন্যে উনি আমার জন্যে খুঁজছেন সলিসিটারের মেয়ে।" বলতে বলতে বিদ্যুত লক্ষ্য করলো একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে সবিতা তাকিয়ে আছে তার দিকে। তখন মনে হোলো, সলিসিটারের মেয়ের কথা না বললেই ভালো হোতো।
"আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না," সবিতা বললো, "তোমার বাবা আমাদের বিয়েতে মত দেবেন না কেন ? আমি সলিসিটারের মেয়ে নই বলে, না তুমি যদ্দিন এম-এ পড়ছো তদ্দিন তোমার বিয়ে দেবেন না বলে ?"
বিদ্যুত নিজেকে সামলে নিয়েছে এতক্ষণে। খুব মিষ্টি করে বললো, 'পরিস্থিতিটা বুঝবার চেষ্টা করো সবিতা, ছেলেমানুষের মতো রাগ কোরোনা আমি শুধু বাবার মনোভাবটা বললাম। দশজন ভালো ছেলের অবস্থাপন্ন বাপ যে রকম, আমার বাবাও তাই। আমি তোমায় শুধু একথাই বোঝাবার চেষ্টা

করছি যে, আমি যতক্ষণ নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারিছি, বাবার মতের বিরুদ্ধে কিছু করবার জোর আমার নেই।"

"তোমার বাবাকে সব কথা পরিষ্কার করে খুলে বলো।"

"সে কি করে সম্ভব সবিতা?"

"আমি কি করে আমার মাকে বললাম?"

"বলে ভালোই করেছো। যদ্দিন আমি এম-এ পাশ করে একটা প্রফেসারি যোগাড় করে নিতে না পারছি তদ্দিন তুমি যে করেই হোক তোমার বিয়ের চেষ্টা ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করো।"

"সে হয়না।"

"কেন?"

"তুমি আমার বাবাকে চেনো না বিদ্যুত।"

"তুমিও আমার বাবাকে চেনো না, সবিতা।"

"আমি তোমার বাবাকে চিনতে চাই না। আমি জানি তোমাকে। আমার জন্যে তোমার যা করবার নিজের জোরেই করতে হবে।"

"এখন আমি কি করতে পারি বলো?"

"তোমার বাবাকে সোজাসুজি বলে দাও যে, উনি যদি আমাদের বিয়েতে রাজী না হন, তুমি পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে যা হোক একটা কাজ যোগাড় করে নিয়ে আমায় বিয়ে করবে।"

"আর আমি যদি বলি সে আমার পক্ষে সম্ভব নয়?"

সবিতার কান দুটো লাল হয়ে গেল। তবু খুব শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, "তাহলে তোমার দ্বারা কি সম্ভব শুনি?"

"আমি এম-এ পাশ করা পর্যন্ত তুমি মাটি কামড়ে পড়ে থাকো, তারপর দেখা যাবে।"

"আমি যদি বলি সে আমার পক্ষে সম্ভব নয়?"

বিদ্যুত কোনো উত্তর দিলো না। তখন বেলা পড়ে আসছে। পড়ন্ত রোদ্দুরে চিকচিক করছে প্রবহমান গঙ্গার অসংখ্য লহরী। একটি নৌকো ভেসে যাচ্ছে দক্ষিণ দিকে। সেদিকে তাকিয়ে রইলো।

সবিতার মনে হোলো বুকের ভিতরটা ফাঁকা হয়ে গেছে। খুব জোরে একটা নিশ্বাস টানলো সে। তারপর বললো খুব সহজ হাসি হেসে, "আমার বিয়েতে তুমি নেমন্তন্ন খেতে আসবে তো?"

বিদ্যুতের মাথার মধ্যে তখন ঝিঁঝিঁ ডাকছে। খুব ধরা গলায় বললো, "আমার দিকটা তুমি একটুও ভেবে দেখলে না সবিতা।"

সবিতা একটু হেসে বললো, "তুমি বা আমার দিকটা কি ভাবলে? যাক, আমার কোনো অভিযোগ নেই। বোধ হয় এসব এরকমই হয়। আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের ধোঁয়াটে আকাশে মাঝে মাঝে একটুখানি রোদ্দুরের ঝিলিক, এই আর কি। মাঝে মাঝে মনে পড়লে ভালো লাগবে।"

"তোমরা কী নিষ্ঠুর হতে পারো, তাই ভাবছি।"

সবিতার মুখ এক মুহূর্তের জন্যে কঠিন হয়ে গেল। কিন্তু পলকে সে ভাব কাটিয়ে লঘুস্বরে বললো, "ওগো দয়াময়ের জাত, একথা বোঝা কি তোমাদের পক্ষে এতই শক্ত যে আত্মসম্মানবোধ আর দায়িত্ববোধ দুটোই থাকলে নিষ্ঠুর বলে মনে হওয়ার অপবাদ মুখ বুঁজে সহ্য করতে হয়?"

"আমাদের এত ভালোবাসার পরিণতি কি এই?" বেদনাতুর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো বিদ্যুত।

"তাই মেনে নেওয়া ছাড়া আর উপায় কি?"

"আমাদের এতদিনকার এই সম্পর্ক কি সব মিথ্যে?" বিদ্যুতের চোখ ছলছল করে উঠলো।

"না, মিথ্যে নয়," সবিতা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, "তবে যে দুর্বল তার পক্ষে নিজের অক্ষমতার আর কি কৈফিয়ত আছে বলো? একে মিথ্যে বলে মেনে নিলে মনে আর কোনো গ্লানি থাকবে না।"

বিদ্যুত একটু চুপ করে থেকে ভারী গলায় বললো, "আজ যে এরকম হবে কে জানতো? সকাল থেকে কতো কথা তোমায় বলবো বলে ভাবছি। এমন সুন্দর বিকেল, সামনে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে——,"

কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে সবিতা বললো হাসতে হাসতে, "হ্যাঁ, গাছে ফুল ফুটছে, ডালে পাখি ডাকছে, দূরে ময়দানে গরু ঘাস খাচ্ছে,——তারপর? আর বেশী বোলো না বিদ্যুত, অনেক হয়েছে।"

"তোমায় একটা কথা বলবো ভাবছিলাম——।"

"থাক, আর দরকার নেই। আমায় এবার বাড়ি ফিরতে হবে।"

তরুবালা চা করছিলো সরোজের জন্যে। সবিতা ফিরে আসতে জিজ্ঞেস করলো, "তুই চা খাবি?"

সবিতা কোনো উত্তর না দিয়ে সাবান তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে ঢুকলো। সবিতার মুখ দেখে তরুবালা আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না।

সে যখন চান করে বেরোলো তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। তরুবালা তাকিয়ে

দেখলো। খুব স্নিগ্ধ ঝরঝরে দেখাচ্ছে সবিতাকে।

সবিতা বললো, "মা, আজ আমিই রান্না করবো। তোমায় কিছু করতে হবে না।"

কিছুক্ষণ কেটে গেল। তরুবালা তখনো বসে আছে দেখে সবিতা বললো, "তুমি এখানে বসে থেকে আর কি করবে, তুমি ওদিকে ওদের সঙ্গে গিয়ে বোসো।"

"চালগুলো বেছে দিই——?"

"না, যা করবার আমি সব একলাই করতে পারবো। আমায় একলা থাকতে দাও।"

তরুবালা বুঝলো মেয়ের মন। তিন রুমের ফ্ল্যাটে বাড়ির সবার মধ্যে একটু একলা থাকবার জায়গা আর কোথাও নেই। তাই রান্নাঘরের কাজের মধ্যে একলা থাকতে চায়। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "বিদ্যুতের সঙ্গে কথা হয়েছে?"

সে প্রশ্নের উত্তর দিলো না সবিতা। একটু চুপ করে থেকে বললো, "হ্যাঁ মা, আমায় দেখতে আসছে কবে?"

"কেন রে?"

"সেদিন বাণী আর শ্যামলীকেও ডাকবো ভাবছি।"

তরুবালা আর কিছু জিজ্ঞেস না করে বেরিয়ে গেল রান্নাঘর থেকে। খুব নিশ্চিন্ত হোলো, কিন্তু মনের কোথায় একটা ব্যথা হঠাৎ টনটন করে উঠলো।

— তিন —

অফিসের ক্যাশিয়ার ভবানীবাবু যেখানকার খোঁজ দিয়েছিলেন, সেখানেই সবিতার বিয়ের ঠিক হয়ে গেল। ছেলে ভালো, বি-কম পাশ, প্রাইভেটে এম-কম দেবার জন্যে তৈরী হচ্ছে, মটিমার এ্যাণ্ড ফিশার কোম্পানির পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্টে ভালো কাজ করে। গানবাজনায় শখ আছে, ভালো সেতার বাজায়। সবিতাকে দেখতে এসে ওদের খুব পছন্দ হয়ে গেল।

নিশিকান্তবাবু তরুবালাকে জিজ্ঞেস করলেন, "মেয়ে কি বলে? ওর ছেলে পছন্দ হয়েছে তো?"

তরুবালা প্রথমটা কোনো উত্তর দিলো না। তারপর শুধু বললো, "ওর কোনো অমত নেই।"

"আমি বলিনি?" নিশিকান্ত বাবু হাসি মুখে বললেন, "বিয়ের নাম শুনলে মেয়েরা প্রথমটা ওরকম চোটপাট করে, তারপর ঠিক হয়ে যায়। পড়াশুনো করলে আর কি হোতো শুনি? এর চাইতে ভালো ছেলে ঠিক করা আমার সাধ্যে কুলোতো না।"

পাকা দেখার দিন বাণী আর শ্যামলীকে ডেকেছিলো সবিতা। সেদিন সিনেমা থেকে বেরিয়ে ওরা দেখতে পেয়েছিলো শুধু বিদ্যুতকে। সে একাই অপেক্ষা করছিলো তাদের জন্যে। তার মুখে এরা শুনলো সে সবিতা সোজা বাড়ি চলে গেছে। বিদ্যুতের মুখ দেখে ওরা বুঝতে পেরেছিলো যে, ওদের দুজনের মধ্যে কিছু একটা হয়েছে। কিন্তু বিদ্যুতকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি ওরা, বিদ্যুতও ওদের কিছু জানায়নি। ওরা জানতো যে সবিতার বিয়ের কথাবার্তা চলছে, ভাবলো তাই নিয়ে হয়তো দুজনের মন খারাপ। শুভার্থিণী বন্ধুর মতো দুজনেই কামনা করছিলো, সবিতার বিয়ের কথা যেন পাকা না হয়, যেন বিচ্ছেদ না হয় সবিতা আর বিদ্যুতের মধ্যে। দু তিন দিন ওরা অপেক্ষা করলো সবিতার জন্যে, তারপর যখন ওর ওখানে যাবে যাবে ভাবছে, এমন সময় সবিতার ভাই সমর এসে দুজনকে নেমন্তন্ন করে বললো, পাকা দেখার দিন যেতে বলেছে সবিতা, বাড়িতে অনেক কাজ, তাই নিজে আসতে পারে নি।

সমরের কথা শুনে ওরা আকাশ থেকে পড়লো। চটকরে সবিতার বিয়ের ঠিক হয়ে যাবে ওরা ভাবতেই পারেনি।

তাদের দেখে সবিতা খুব হাসি মুখে নিজের ঘরে নিয়ে বসালো, বাণী

আর শ্যামলী কি ভাবে কথা সুরু করবে ভেবেই পেলো না। সবিতার মুখে হাসি দেখবে, ওরা ভাবতেই পারেনি।

তরুবালা ঘরের মধ্যে ছিলো কিছুক্ষণ, তাই প্রথমটা হোলো দু-চারটা মামুলী কথা,——কবে বিয়ের তারিখ পড়লো, ছেলে কি করে, ওদের দেশ কোথায়, এই সব। তারপর এক সময় তরুবালা চলে যেতে শ্যামলী জিজ্ঞেস করলো, "হ্যাঁ রে সবিতা, বিদ্যুত জানে তোর বিয়ের ঠিক হয়েছে?"

"হ্যাঁ, জানে বৈ কি। আমি ওকে নিজেই বলেছি," সবিতা খুব সহজ ভাবে উত্তর দিলো।

সবিতার খুব নির্বিকার প্রশান্ত ভাব দেখে বাণী আর শ্যামলী দুজনে আরো অবাক হোলো।"

"সে কিছু বললো না," বাণী জিজ্ঞেস করলো।

"কি আর বলবে?"

"এ বিয়েতে তোর মত আছে তো? না কি জোর করে বিয়ে দিচ্ছে?" জিজ্ঞেস করলো শ্যামলী।

"আমার উপর আবার জোর করতে যাবে কে? আমার মত নিয়েই বিয়ে হচ্ছে," বলে সবিতা হাসলো।

বাণী আর শ্যামলী অবাক হয়ে তাকালো সবিতার দিকে।

"তুই মত দিতে পারলি?" বলে ফেললো শ্যামলী।

"কেন দিতে পারবো না। বিয়ে যখন জীবনে একটা করতেই হবে তখন এ লোকটি আর মন্দ কি?"

"বিদ্যুতের কথা তুই একটুও ভাবলি না?"

"ভেবে যখন কোনো লাভ নেই, তখন আর ভেবে কি হবে বল।"

"ও তোকে বড্ড ভালোবাসে," বাণী বললো, "ওর খুব কষ্ট হবে।"

"হতে পারে, তবে দুদিনে ঠিক হবে যাবে," সবিতা উত্তর দিলো।

শ্যামলীর রাগ হোলো। জিজ্ঞেস করলো, "তোর বুঝি কষ্ট হচ্ছে না একটুও?"

সবিতা হাসলো। বললো, "না, তেমন কিছু নয়।"

"আচ্ছা মেয়ে তো তুই! কেন মিছি মিছি ওকে নিয়ে ছেলেখেলা করলি এতদিন?"

"জীবনটাই বোধ হয় একটা ছেলেখেলা," সবিতা উত্তর দিলো।

"সবার কাছে নয়।"

"সে না হতে পারে," সবিতা অতি কষ্টে উদ্‌গত অশ্রু রোধ করে মুখে

জোর করে হাসি ধরে রেখে বললো, "কিন্তু বোধ হয় সত্যি সত্যি তাই, কেউ সেকথা মানে, কেউ মানে না।"

"বোধ হয় বলছিস কেন, অন্তত তোর কাছে যে ছেলেখেলা সেকথা জোর গলায় বল।"

খুব জোরে জোরে মাথা নাড়লো সবিতা। "না, আমার কাছে একটুও ছেলেখেলা নয়। তাই যদি হোতো, আজ জোর করে মুখে হাসি টেনে আনতে হোতো না, মুখ আপনা থেকে হাসিতে ঝলমল করতো।" বলতে বলতে সবিতার চোখ বেয়ে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো।

এই কদিন পরে এই প্রথম সে অসংযত হোলো। বন্ধুদের কাছে লুকোতে পারলো না বলেই হয়তো।

"বাড়িতে কাউকে না বলে চুপচাপ বিদ্যুতকে বিয়ে করে ফেললেই পারতিস," বাণী বললো, "ওরকম কতো হয়। প্রথমটা গোলমাল হয়, অভিভাবকেরা রাগারাগি করে, পরে সব ঠিক হয়ে যায়। বিদ্যুতকে বললে সে নিশ্চয়ই রাজী হয়ে যেতো।"

"থাক, ওর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার আর দরকার নেই।"

"যদি বলিস তো আমরা একবার চেষ্টা করে দেখি কি করা যায়। এখনো সময় আছে।"

"থাক, আর চেষ্টা করে কাজ নেই। যা হচ্ছে, সবার ভালোর জনেই হচ্ছে।"

লোকজন আসতে সুরু করেছে। ছোটো ফ্ল্যাট বাড়ি, নিরিবিলিতে বসে কথা বলার বেশী সুযোগ নেই। বাণী আর শ্যামলীও কথা বাড়ালো না, বেশ বুঝলো যে কারো কিছু করবার নেই। সবিতা আর বিদ্যুতের মধ্যে নিশ্চয়ই কথা হয়ে গেছে, সুতরাং তারপর যখন সবিতা বিয়েতে মত দিয়েছে, তখন এ নিয়ে আর কোনো আলোচনা করা অনুচিত হবে।

বাণী এক ফাঁকে শ্যামলীকে আস্তে আস্তে বললো, "শেষ পর্যন্ত সব এরকমই হয়। অমিতার কথা ভেবে দ্যাখ। সুলতারও তাই হোলো। কতো দেখলাম।"

"কিন্তু সবিতার মতো শক্ত মেয়ে——"

"যাক, আমাদের তা নিয়ে ভেবে কী লাভ," বলে বাণী সবিতাকে সাজাতে উঠে গেল।

পাত্রের অভিভাবকেরা এলো, বাড়ির মেয়েরা এলো। জ্যেষ্ঠতম অভিভাবক মেয়েকে সোনার নেকলেস দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলো। এ বাড়ির

আত্মীয়ারা উলু দিলো, শাঁখ বাজালো। সদা-রাশভারী নিশিকান্ত বাবুর খুব হাসিহাসি মুখে। নিজের হাতে মিষ্টি প্লেট তুলে দিলেন অভ্যাগতদের হাতে। সবিতা ঈষৎস্মিত লজ্জারুণ মুখে বয়োজেষ্ঠদের পদধূলি গ্রহণ করলো।

একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো বাণী আর শ্যামলী। ওদের মনে কষ্ট হচ্ছিলো, বার বার মনে পড়ছিলো বিদ্যুতের কথা।

একদিন সবিতাই এসে তাদের বলেছিলো বিদ্যুতের কথা।

——আজকালকার ছেলেরা কী অসভ্য........! কাল কি হয়েছে জানিস?

বিশেষ কিছু না। কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথ ধরে দুজনে দুদিক থেকে হেঁটে আসছিলো। তখন কেউ কাউকে চেনেনা। হঠাৎ দুজনে সামনা সামনি হোলো। মাঝে মাঝে এ ক্ষেত্রে একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি হয়, এদের বেলাও তাই হোলো। দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়লো এই ভেবে যে অন্যজন পাশ কাটিয়ে যাবে। তারপর দুজনেই একই সঙ্গে একবার ডাইনে সরলো, একবার বাঁয়ে সরলো, আবার দাঁড়িয়ে পড়লো। সবিতা ভাবলো, আমিই বাঁদিকে সরে এগিয়ে যাই। সরতে গিয়ে দেখে, অচেনা ছেলেটিও সেদিকে সরছে। সবিতার হাসি পেলো, হেসে ফেললো ছেলেটিও। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত একজন দাঁড়িয়েই রইলো, অন্য জন চলে গেল পাশ কাটিয়ে।

আর যদি দেখা না হোতো, এ ঘটনা মনেও পড়তো না। কিন্তু কলেজ স্ট্রীটে এ পর্যন্ত দু-তিনবার ওই ছেলেটির সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেছে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও চোখাচোখি হয়েছে।

——ছেলেটি এমন অসভ্য,——সবিতা বলছিলো,——আমায় দেখলেই ওর হাসি পায়, একটু হাসেও।

বাণী হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করেছিলো,——তোর হাসি পায়না?

——একটুও না,——বলে হেসে ফেলেছিলো সবিতা। বললো,——বোধ হয় এম-এ পড়ে, একদিন ওকে ইউনিভার্সিটি থেকে বেরোতে দেখেছি।

——কি রকম দেখতে? স্মার্ট?——শ্যামলী জিজ্ঞেস করেছিলো।

——চিড়িয়াখানার শিম্পাঞ্জীর মতো। ঠিক তেমনি করে কায়দা করে ধরে সিগারেট টানে।

মাস দুয়েক পরে একদিন বাণী আর শ্যামলী দেখে, ওয়াই-এম-সি-এ রেস্তোঁরার একটি কেবিনে সবিতা বসে আছে একটি ছেলের সঙ্গে। তখন ওরা কেউ কারো সঙ্গে কথা বললো না, কিন্তু পরে শ্যামলী আর বাণী চেপে ধরলো সবিতাকে।

——সেদিন কে ছিলো রে তোর সঙ্গে?

——কোথায়? ও, ওয়াই-এম-সি-এ তে? সে সুধীন-দা, আমার মাসতুতো ভাই।

বাণী আর শ্যামলী হাসতে লাগলো।

——ব্যস, অমনি ভাই হয়ে গেল।

—বিশ্বাস করছিস না? আচ্ছা, মাকে জিজ্ঞেস করিস সুধীনদার কথা। তাহলে বিশ্বাস হবে তো!

আরও বেশ কিছুদিন পরের কথা। বাণী আর শ্যামলী একদিন সবিতার ওখানে গেছে। সবিতা পাড়াতেই আরেকটি বাড়িতে গেছে, খবর পাঠানো হয়েছে, এসে পড়বে এক্ষুণি। ততক্ষণ এরা সবিতার মায়ের সঙ্গে বসে গল্প করছিলো। এমন সময় এসে উপস্থিত হোলো এক সুদর্শন ছেলে।

এসে বললে, "মাসীমা, চা খাবো।"

তরুবালা এদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলো। "এ হচ্ছে বাণী, আর এ শ্যামলী,——সবিতার বন্ধু।"

"হ্যাঁ, সবিতা তো প্রায়ই বলে এদের কথা। আপনারই না শাদা বেড়ালের তিনটে কালো বাচ্চা হয়েছিলো?"

বাণী আর শ্যামলী হেসে ফেললো।

"এ হচ্ছে আমার বোন-পো সুধীন," বললো তরুবালা।

বাণী আর শ্যামলীর চক্ষুস্থির। "ও, আপনিই সবিতার সুধীনদা?"

এ হেন সময় সবিতার প্রবেশ। সে খুব বিব্রত হোলো।

"এই যে, তোর সুধীন-দার সঙ্গে আলাপ হোলো," ডেকে বললো শ্যামলী। "এঁরই কথা তুই সেদিন বলছিলি আমাদের?"

"কি বলছিলো?" জিজ্ঞেস করলো সুধীন।

সবিতা ততক্ষণে বাণী ও শ্যামলীর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সে খুব জোরে একটা চিমটি কাটলো শ্যামলীকে।

"কি বলছিলো?" উত্তর না পেয়ে সুধীন আবার জিজ্ঞেস করলো।

"না, এমন কিছু নয়। আপনি——"

শ্যামলীকে কথা শেষ করতে দিলোনা সবিতা। বললো, "যতো সব আলতু-ফালতু কথা। আমি কিছু বলিনি। ওরা তোমায় ঠাট্টা করছে সুধীনদা। চল, আমরা ওঘরে গিয়ে বসি।"

পাশের ঘরে গিয়ে বাণী আর শ্যামলী চেপে ধরলো সবিতাকে।—— "বলতো ব্যাপার খানা কি? এ সুধীন-দাতো সে-সুধীনদা নয়। ডুবে ডুবে জল খাওয়া হচ্ছে! এক্ষুণি গিয়ে বলে দিচ্ছি মাসীমাকে।"

সবিতা খুবই অপ্রস্তুত। "কাউকে বলবিনা বল? সত্যি সত্যি? কালীর দিব্যি?—সে বিদ্যুত।"

"বিদ্যুত?"

"হ্যাঁ, বিদ্যুত চৌধুরী। ইতিহাসে এম-এ পড়ে। বি-এ অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলো। খুব ভালো ছেলে।"

"কি করে আলাপ হোলো ওর সঙ্গে?"

আস্তে আস্তে সবই খুলে বললো সবিতা। ওদের কলেজে ইতিহাসের প্রফেসার হোলো অর্চনা-দি। বলেছিলো, একদিন বাড়িতে এসো, রোমান হিস্ট্রির অমুক চ্যাপটারটি বুঝিয়ে দেবো। সবিতা গিয়েছিলো অর্চনা-দির বাড়ি। সেখানে গিয়ে দেখে, ও-মা! সেই ছেলেটি বসে আছে। সেই যে, কলেজ স্ট্রীটে যার সামনা-সামনি হয়ে দুজনে একসঙ্গে এদিক-ওদিক করছিলো, তার সঙ্গে পরে দু-একদিন দেখা হতে যে হাসি চাপতে পারে নি।

অর্চনা-দি আলাপ করিয়ে দিচ্ছিলো, কিন্তু ছেলেটি বললো,—এঁকে আমি চিনি। কলেজ স্ট্রীটের সেই ঘটনার এমন সুন্দর একটা বর্ণনা সে দিলো যে, অর্চনা-দি হেসে খুন।

সে অর্চনা-দির ননদের দেওর, বিদ্যুত চৌধুরী।

রোমান-হিস্ট্রির সেই বিশেষ পরিচ্ছদ শেষ পর্যন্ত তাকেই বুঝিয়ে দিতে হোলো সবিতাকে। অর্চনা-দি তাদের চা করে খাওয়ালো।

সেদিন অদ্ভুত ভালো লেগেছিলো সবিতার। বাড়ি ফিরে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ বারান্দায় একলা গুম হয়ে বসে ছিলো। একটা অদ্ভুত আবেশে ভরে উঠেছিলো তার মন। ভালো লাগছিলো, ভয়ও করছিলো, কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলো না এটা কিসের উপলব্ধি।

প্রচুর আগ্রহভরে শুনছিলো বাণী আর শ্যামলী।

সবিতা থামতে বাণী বললো, "হুঁম। তারপর?"

"তারপর আর কি। আরো দু-চার বার দেখা হোলো। একদিন কলেজ স্ট্রীটে আবার দেখা হোলো। সে বললে, এক সঙ্গে বসে চা খেলে কি রকম হয়। —আমার ভয় করছিলো, কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারলাম না যে, যদি কেউ দেখে ফেলে। একথা বলা যায় নাকি আজকাল। লোকে শুনলে হাসবে।" বলতে বলতে সবিতা চুপ করে গেল। কি যেন ভাবলো, তারপরে বললো, "আমার যে কি হয়েছে আজকাল, জানিনা।"

"কি আবার হবে, ন্যাকা!" বলে শ্যামলী সবিতাকে জড়িয়ে ধরলো।

....পাশের বাড়ির মঞ্জুশ্রী খুব জোরে শাঁখ বাজাচ্ছে। সবিতার দাদা সরোজ

তার পাশে দাঁড়িয়ে তার কানে কানে কি যেন বললো। সে একটু আরক্ত হোলো। সেদিকে কারো চোখ পড়লো না। সবাই তাকিয়ে দেখছে সবিতাকে। সবিতা তখন পাত্রের এক পিসীমাকে প্রণাম করছে। তিনি তাকে আশীর্বাদ করছেন ধানদুর্বা দিয়ে।

দেখতে দেখতে বাণীর মনে পড়েছিলো,——সেদিন এক বিকেল বেলা শ্যামলী বলাছলো, "কি আবার হবে? ন্যাকা!" বলে জড়িয়ে ধরেছিলো সবিতাকে।

বাণী শ্যামলীর দিকে তাকালো। শ্যামলীও তাকালো বাণীর দিকে। দুজনে আস্তে আস্তে সরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো।

শ্যামলী বললো, "আমার কি রকম যেন লাগছে। সবিতা কি রকম সহজ ভাবে নিয়েছে সমস্ত ব্যাপারটা। একজনকে ভালোবেসে আরেকজনকে এত সহজ হয়ে বিয়ে করা যায়? সত্যিকারের ভালোবাসার একটা জোর নেই?"

বাণী নিচু গলায় উত্তর দিলো, "আমি ভাবছি ভালোবাসা কি সত্যি সত্যি গড়ে উঠেছিলো?"

"কেন?"

"দুজনের আকর্ষণ ছিলো পরস্পরে জন্যে, একটা মধুর সম্পর্ক ছিলো, অন্তরঙ্গতা ছিলো, কিন্তু ভালোবাসা কি গড়ে উঠেছিলো?"

শ্যামলী কোনো উত্তর দিলো না।

বাণী বলে গেল, "অনেক গভীরে গিয়ে ভালোবাসার উপলব্ধি হয়। গভীরে যেতে হলে পরস্পরের জন্যে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, দুঃখ পেতে হয়। এরা কে কার জন্যে কী করেছে? হ্যাঁ, বাড়িতে লুকিয়ে দুজন দুজনের সঙ্গে দেখা করেছে, বেড়িয়েছে, মনের কথা বলেছে। কিন্তু ভালোবাসা? জানিনা। ভালোবাসা জোর দেয়। ভালোবাসা থাকলে দুজনেই এত দুর্বল কেন? সবিতাই বা কি করে বিয়ে করতে রাজী হোলো, বিদ্যুতই বা কি করে সহ্য করছে?"

"ভাই, ভেতরের কথা আমরা কিছুই জানি না। এ একেবারে ওদের দুজনের ব্যাপার।"

"আমি জানতে চাই, এরা ভালোই যদি বাসলো তো ভালোবাসার শক্তিটা এদের মধ্যে এলো না কেন?"

"হয়তো দুজনেই দুর্বল নয়। যদি একজন দুর্বল হয়, আরেকজন কি করতে পারে?"

"কেন, চুলের ঝুঁটি ধরে নিজের কাছে বেঁধে রাখবে।"

"তুই বুঝি ধরে নিচ্ছিস, সবিতাই মনের জোর দেখাতে পরেনি?"

"তা ছাড়া আর কি," বাণী উত্তর দিলো, "তা নইলে সবিতা বিয়েতে মত দিতে পারতো না।"

"সবিতা খুব শক্ত মেয়ে। ও অতো দুর্বল হবে সেকথা আমার মনে হয় না, শ্যামলী বললো, "ওর কথাবার্তা শুনে আমার মনে হোলো ওর মন ভেঙে গেছে। দুর্বল মেয়ের মন ভাঙেনা। আমার ধারণা, বিদ্যুতই ওকে কোনো ভরসা দিতে পারেনি।"

বাণী একটু ভেবে জিজ্ঞেস করলো, "বিদ্যুতের সঙ্গে একবার কথা বলে দেখবো?"

"কি লাভ হবে তাতে?" শ্যামলী বললো, "আজ আশীর্ব্বাদ হয়ে গেল, দিন পনেরো পরে বিয়ে। এর মধ্যে আর অনর্থক গণ্ডগোল বাধিয়ে লাভ কি?"

"গণ্ডগোল আর কি? আমি শুধু জানতে চাইছি কী ব্যাপার।"

কয়েকদিন পরে একদিন নিউমার্কেটের কাছে শামলী আর বাণীর সঙ্গে বিদ্যুতের দেখা হয়েছিলো। এরা হেঁটে যাচ্ছিলো, হঠাৎ দেখতে পেলো, উল্টো দিক থেকে বিদ্যুত আসছে। খুব উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা, উস্কোখুস্কো চুল।

"ঢং দ্যাখো," শ্যামলী বললো বাণীকে।

বিদ্যুত কাছে এসে এদের দেখে দাঁড়িয়ে পড়লো। দু চার কথার পর বাণী হঠাৎ সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলো, "সবিতার বিয়ে হচ্ছে, জানেন তো?"

ম্লান হেসে বিদ্যুত বললো, "হ্যাঁ, জানি।"

"আপনি সইছেন কি করে?" বাণী জিজ্ঞেস করলো, "ওকে বোঝাতে পারলেন না?"

শ্যামলী খুব অপ্রস্তুত বোধ করছিলো বাণীর সোজাসুজি প্রশ্ন শুনে। "থাক না, এসব কথা আর কেন?" সে বললো বাণীকে।

"তুই থাম," বললো বাণী, "আমরাও জড়িত ছিলাম আপনাদের সঙ্গে, তাই জিজ্ঞেস করছি, তা নইলে আমাদের কি? সবিতা আরেকজনকে বিয়ে করছেন, আর আপনি চুপ করে আছেন?"

বিদ্যুত হাসলো, বললো, "আমি কি করতে পারি বলুন।"

"আমি হলে সবিতাকে গুলি করে মেরে ফেলতাম, নিজেও মরতাম।"

বিদ্যুত আস্তে আস্তে উত্তর দিলো, "সবিতা তো মরতে চায়না, ও বাঁচতে চায়।"

"মানে?"

বিদ্যুত কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো, তারপর বললো, "এসব কথা থাক, আমি আর সবিতার সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করতে চাই না। চা খাবেন?"

বাণী আর শ্যামলী দুজনের মন একই সঙ্গে টনটনিয়ে উঠলো। সবিতা, বিদ্যুত, বাণী আর শ্যামলী একসঙ্গেই চা খেতো প্রায়ই।

এরা বিদ্যুতের কথার কোনো উত্তর দিতে পারলো না। বিদ্যুতও আর জিজ্ঞেস করলোনা।

"আচ্ছা, পরে আবার দেখা হবে," বলে বিদ্যুত চলে গেল।

"আমি কিন্তু চা খাবো," শ্যামলী বললো, "যাঃ, সবিতাটা কি করলো? খুব খারাপ লাগছে।"

বাণী আর শ্যামলী নিউমার্কেটের কাছে একটি রেস্তরাঁয় গিয়ে বসলো।

চা খেতে খেতে শ্যামলী হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো," আচ্ছা, সবিতার না বিয়ে হয়েছিলো বিদ্যুতের সঙ্গে?"

বাণী শ্যামলীর প্রশ্ন শুনে প্রথমটা বিস্মিত হোলো। "সে কি কথা? কবে?" তারপর মনে পড়তে হেসে ফেললো। বললো, "যতো সব ছেলেমানুষী!"

সেদিন এক সন্ধ্যায় এই রেস্তরাঁতেই বসেছিলো বিদ্যুত, সবিতা, শ্যামলী আর বাণী। গত শীতের পরে। তখন ময়দানের আর পার্কের পাছে গাছে একটা দুটো কোকিল সবে ডাকতে সুরু করেছে।

এটা ছিলো তাদের প্রায় দৈনন্দিন প্রোগ্রাম। প্রথম দিকে দু-চারবার সবিতা একলা দেখা করেছিলো বিদ্যুতের সঙ্গে। কিন্তু বেশীদিন সেরকম সম্ভব নয়। রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে সে, বাড়িতে বাবার অত্যন্ত কড়া শাসন। কলেজে পড়লেও গন্তব্যস্থল না জানিয়ে বাড়ির বাইরে বেরোনো সহজ নয়। সুতরাং বাণী এবং শ্যামলীর সহায়তার প্রয়োজন হোলো। বাড়িতে বলে যেতে হবে, সুতরাং বাণীদের-বাড়ি-যাচ্ছি কিংবা শ্যামলীদের-বাড়ি-যাচ্ছি বলে বেরোনোই নিরাপদ। কিন্তু হঠাৎ ওখানেও খোঁজ পড়তে পারে। সুতরাং ওদেরও নিয়ে বেরোতে হয়। সিনেমা দেখতে গেলে বন্ধুর জন্যে এটুকু করতে ওদের বিন্দুমাত্রও আপত্তি নেই।

সুতরাং ওরা তিনজনে এক সঙ্গেই বেরোতো। কোথাও কোনো সিনেমা হলের বাইরে দুটো টিকিট কিনে অপেক্ষা করতো বিদ্যুত। বাণী আর শ্যামলী ঢুকতো সিনেমায়, কিংবা কখনো অন্য কোথাও যাওয়ার থাকলে যেতো। সবিতাকে নিয়ে বিদ্যুত চলে যেতো অন্য দিকে। পরে এক

সময় চারজনে আবার মিলিত হোতো কোনো না কোনো পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে। একসঙ্গে চা খেয়ে নিতো চারজনে, তারপর ওদের খানিকটা পথ এগিয়ে দিয়ে বিদ্যুত চলে যেতো, বাণী আর শ্যামলী বাড়ি পৌঁছে দিতো সবিতাকে। সংসারে অসংখ্য বুদ্ধিমান কন্যার রক্ষণশীল পিতা একই দৃশ্য দেখেন সন্ধ্যার পর——বান্ধবীর বাড়ি থেকে বান্ধবীর সঙ্গেই কন্যা বাড়ি ফিরছে। অতএব, শান্তি বিরাজ করে পৃথিবীতে।

অন্যান্যদিনের মতো সেদিনও ওরা চা খেতে খেতে গল্প করছিলো। এদের সামনে বিদ্যুত একটু রাশভারী, গাম্ভীর্য বজায় রাখবার চেষ্টা করে, ঠাট্টা তামাসা করতে দেয়না। তবু বাণী আর শ্যামলী ছাড়ে না, মাঝে মাঝে দুষ্টুমি করে সবিতার সঙ্গে।

সেদিন চায়ের কাপে চিনি মেশাতে মেশাতে বাণী হঠাৎ লক্ষ্য করলো, বিদ্যুতের পাঞ্জাবির পাশের পকেট থেকে একটি বেলফুলের মালা উঁকি দিচ্ছে। বাণী চট করে হাত বাড়িয়ে সেটা বার করে নিলো। বললো, "বাঃ ভারী সুন্দর মালা, এটা নিয়ে আপনি কি করবেন, আমায় দিয়ে দিন, আমি খোঁপায় বাঁধবো।"

বিদ্যুতের মুখ হঠাৎ লাল হয়ে গেল। বললো, "না, না, ওটা কেন, ওটা কিছুক্ষণ পরে আর টাটকা থাকবে না, আমি আপনাকে আরেকটি টাটকা মালা কিনে দিচ্ছি।"

"না, এটাই আমার চাই," বলে বাণী সবিতার দিকে তাকালো। দেখলো সবিতার মুখও লাল হয়ে গেছে।

শ্যামলী হেসে বললো, "ওটা কেন, কার মালা কার খোঁপা থেকে কার পকেটে গিয়ে পড়েছে, তাতে লোভ করে কী লাভ! আমরা অন্য মালা কিনে নেবো।"

বাণী মালাটি বিদ্যুতের পকেটে রেখে দিলো।

তখনকার মতো ততোটুকুই।

বিদ্যুত তাদের ট্রামে তুলে দিয়ে অন্যদিকে চলে গেল। ট্রামে শ্যামলী আর সবিতা বসেছিলো পাশাপাশি। হঠাৎ দেখতে পেলো সবিতার ব্লাউসের অভ্যন্তরে থেকে একটি গোড়ের মালা উঁকি দিচ্ছে।

শ্যামলী হেসে ফেললো। পাশে ঝুঁকে শ্যামলীর কানে কানে বললো, "মালাটা খোঁপায় জড়িয়ে নে। মাসীমা ব্লাউসের ভেতরে মালা দেখতে পেলে কি ভাববেন।"

"যাঃ, ভারী অসভ্য, কথা বলবো না তোর সঙ্গে" বলে মুখ লাল করে সবিতা অন্যদিকে ফিরে বসলো।

হাসতে লাগলো শ্যামলী।

"কি হয়েছে রে?" পাশের সীট থেকে বাণী জিজ্ঞেস করলো।

"ভালো হবে না, বলে দিচ্ছি," বলে উঠলো সবিতা।

"পরে বলবো," শ্যামলী হাসতে হাসতে উত্তর দিলো।

ট্রাম স্টপে নেমে খানিকটা হেঁটে যেতে হয়। তখন রাত প্রায় আটটা। মাঝ-আকাশে ফিক-ফিক করছে আধখানা চাঁদ।

শ্যামলী আর বাণী সবিতাকে চেপে ধরলো।—ছাড়বো না ভাই, শোনাতে হবে মালার রহস্য। ওর পকেটে মালা, তোর ব্লাউসের ভেতরে মালা, ব্যাপারটা কি বলতে হবে।

অনেক সাধাসাধির পর সবিতা বললো। বলতো সে এমনিতেই, না বলে থাকতে পারা যায় নাকি? তবে সাধাসাধি শুনতে ভালো লাগে।

তাই কিছুক্ষণ পর বলে ফেললো।

আজ তারা মালা বদল করেছে সন্ধ্যার চাঁদকে সাক্ষী রেখে, ঠিক গঙ্গার পাড়ে একটি গাছের গুড়ির উপর বসে। ধারে কাছে কেউ ছিলো না।

শ্যামলী আর বাণী রাস্তার মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

শ্যামলী চোখ পাকিয়ে বললো বাণীকে, "বুঝেছিস ব্যাপারখানা? গান্ধর্ব বিবাহ।——ধারে কাছে কেউ ছিলো না।"

হাসলো দুজনেই, কিন্তু সবিতা তাদের খুব বন্ধু, খুব ভালোবাসে তাকে, রাস্তার মাঝখানেই জড়িয়ে ধরলো।

"কী করছিস? ছাড় ছাড়। লোকে কি ভাববে?"

"ভাবুক গে। তোকে যে আজ কী ভালো লাগছে সবিতা! উলু দিতে ইচ্ছে করছে, শাঁখ বাজাতে ইচ্ছে করছে........"

রেস্তরাঁয় চা খেতে খেতে সে কথা আজ শ্যামলীরও মনে পড়লে, বাণীরও মনে পড়লো।

"সবিতার না বিয়ে হয়েছিলো বিদ্যুতের সঙ্গে?" জিজ্ঞেস করেছিলো শ্যামলী।

"যতো সব ছেলেমানুষী!" উত্তর দিয়েছিলো বাণী। শ্যামলী একটু চুপ করে থেকে বললো, "ছেলেবেলায় পাশের বাড়ির ভোম্বলের সঙ্গে আমিও কতো বৌ-বৌ খেলেছি।"

"ওসব তো ছেলেবেলার কথা," বাণী বললো, "তখন কেই বা কি বোঝে। কিন্তু বড়ো হয়ে তো এসব ছেলেমানুষী করা ঠিক নয়। চাঁদ সাক্ষী রেখে তো সবিতা মালাবদল করলো,——শুনতে বেশ লাগে। কিন্তু সেই মালা বদলের কী সম্মান রাখলো শুনি? এর পর আরেকজনের গলায় মালা দেওয়া যায়?"

শ্যামলী উত্তর দিলো, "এ তো মধ্যযুগের রোমান্স নয় যে, মুখ ফুটে যাকে ভালোবাসি বললাম, তাকে ছাড়া জীবনে আর কাউকে বিয়ে করবো না, আর কারো সঙ্গে সংসার করবো না। পরিস্থিতির পরিবর্তনে অনেক কিছু করতে হয়।"

বাণী তাকালো শ্যামলীর দিকে। তারপর বললো, "ও কথা আমি মানতে রাজী নই। ভালোবাসার আদর্শ প্রাচীন যুগে যা ছিলো, মধ্য যুগেও তাই ছিলো, বর্তমান যুগেও তাই আছে, ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। ভালো-বাসার প্রাণ হোলো তার অন্তর্নিহিত সত্য, আর রূপ হোলো তার নিষ্ঠা। তার থেকে আসে শক্তি।——সে জন্যেই তো বলছি সবিতা আর বিদ্যুতের সে জিনিসটা ছিলোনা যাকে ভালোবাসা বলা যায়, ছিলো একটা কলেজী রোমান্স, ছিলো কিছু ভাবালুতা। তাই আজ সবিতাও নির্বিকার ভাবে আরেকজনকে বিয়ে করতে যাচ্ছে, বিদ্যুতের চুল এখন একটু উস্কোখুস্কো হলেও, দুদিন পরে আবার তাতে তেল পড়বে।" একটু চুপ করে থেকে বললো, "সিনেমায় কি থিয়েটারে অগ্নিসাক্ষী করে মন্ত্র উচ্চারণ করে নায়ক নায়িকার বিয়ে হয়। কিন্তু সেটা তাদের সত্যিকারের জীবনে সত্য নয়। অথচ সত্যিকারের ভালো-বাসার ক্ষেত্রে শুধু মনে মনে স্বীকার করে নেওয়াটাও সৃষ্টি করে একটা পরম সত্য, যেটা কোনো আচার অনুষ্ঠানের অনুমোদনের অপেক্ষা রাখে না। সবিতা আর বিদ্যুতের জীবনে কি ছিলো-সে ওরাই জানে। যে টুকু দেখলাম তাতে আমার কোনো শ্রদ্ধা থাকলো না। এত বড় একটা মিথ্যের সঙ্গে যে আমরা জড়িত ছিলাম, সেটাই আমার খারাপ লাগছে।"

বাপের এক মেয়ে সবিতা, তাই বিয়ে হোলো একটু ঘটা করে। ফ্ল্যাট বাড়ির উপরে লম্বা ছাদ, সামিয়ানা খাটিয়ে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন হোলো সেখানে। পাশের ফ্ল্যাটের পড়শীরা তাদের ঘরগুলো ছেড়ে দিলো। বর এসে আসর আলো করে বসলো সেখানে। আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব অফিসের সহকর্মী প্রতিবেশী, নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলো অনেকেই।

দেউড়িতে খুব মিষ্টি ইমনে শানাই বাজছে।

বাণী আর শ্যামলী অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে মিলেমিশে সবিতাকে সাজিয়ে দিলো। খুব সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। অন্য বন্ধুরা এসে এক একজন করে গাল টিপে আদর করলো। তবে বাণী আর শ্যামলী পারলো না।

বিয়ের লগ্নের তখনো দেরী আছে।

সবিতা শ্যামলীকে ডেকে চুপি চুপি বললো, "বাইরে গিয়ে একবার দেখতে পারিস বিদ্যুত এসেছে কিনা।"

শ্যামলী চুপ করে রইলো দু-চার মুহূর্ত। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "ওকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে বুঝি?"

"হ্যাঁ, সমর গিয়ে ওকে নেমন্তন্ন করে এসেছে।"

"সে কি আসবে?"

"হ্যাঁ, আসবে বলেছে।—তুই একটু দেখিস্, ও তো এখানে কাউকে চেনে না, নিজে কাছে দাঁড়িয়ে একটু ভালো করে খাইয়ে দিস।"

সবিতা বললো খুব সহজ ভাবে, কিন্তু শ্যামলীর বুকের অন্তঃস্থল থেকে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে এলো।

কিছুক্ষণ পরে তরুবালা ঘরে ঢুকলো। পেছন পেছন একটি ছেলে।

"সবিতা," ডাকলো তরুবালা, "বিদ্যুত এসেছে।"

শ্যামলী প্রথমটা লক্ষ্য করেনি। মেয়েরা একজনের পর একজন করে অনেকেই আসছে উপহার নিয়ে, মাঝে মাঝে এ বাড়ির অতি-পরিচিত দু-চারজন পুরুষও আসছে। তাই সে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখেনি, সবিতার মায়ের কথা শুনে ফিরে তাকালো।

গরদের পাঞ্জাবি আর জরি-পাড় ধুতি-চাদরে খুব সেজেছে বিদ্যুত। চুলে তেল পড়েছে, খুব কায়দা করে আঁচড়ানো। তাকে এত ফিটফাট শ্যামলী আর কোনোদিন দেখেনি, চোখ দুটি খুব শান্ত, মুখে স্নিগ্ধ হাসি। শ্যামলী মুখ ফিরিয়ে সবিতার দিকে তাকালো।

সবিতাও মুখ তুলে তাকিয়ে আছে বিদ্যুতের দিকে। মাথায় তার মুকুট, মুখে চন্দনের ফোঁটা, জীবনে প্রথম আজ ঠোঁটে একটু ওষ্ঠরাগ লাগিয়েছে। খুব মধুর দেখাচ্ছে তাকেও।

শ্যামলী পাশে তাকিয়ে দেখলো বাণীও দেখছে এদের দুজনকে।

তরুবালার দাঁড়াবার ফুরসত নেই। বিদ্যুতকে পৌছে দিয়ে চলে গেল।

প্রথমটা ওরা কি বলবে ভেবে পেলো না।

শ্যামলী ভাবছিলো,—নিজের প্রিয়তমা কনে সেজে অন্য একজনকে বিয়ে করবার জন্যে তৈরী হয়ে বসে আছে এটা দেখতে কেমন লাগে ছেলেদের? এত সহজ ভাবে হাসিমুখে তার সামনে এসে দাঁড়ানো যায়?

এই যে এত লোক ঘরের মধ্যে বসে আছে, এরা যদি জানতো যে, এই দুজন একদিন লুকিয়ে নিরালায় ঘুরে বেড়াতো!—ভাবছিলো বাণী।

বিদ্যুতই প্রথম কথা বললো।

"তোমার জন্যে একটা সামান্য উপহার এনেছি, সবিতা।"

সে সবিতার দিকে এগিয়ে দিলো রঙিন কাগজের একটি মোড়ক। সবিতা সেটি গ্রহণ করলো হাত বাড়িয়ে।

"আচ্ছা, এবার বাইরে গিয়ে বসি। পরে দেখা হবে।"

"খেয়ে যাবে কিন্তু," বললো সবিতা।

বিদ্যুত হাসলো।

"বিয়ে বাড়িতে এসে না খেয়ে যাবো কেন? বেশ ভালো করে খেয়ে যাবো।"

বিদ্যুত ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। পেছন পেছন এলো শ্যামলী।

"আপনাকে আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে," শ্যামলী বললো।

"আজকের দিনে সবাইকেই সুন্দর দেখায়," বিদ্যুত হেসে বললো, "আপনাদের সবাইকে দেখে তো মনে হচ্ছে ও ঘরে রূপের হাট বসেছে।"

"তাই বুঝি?" শ্যামলী হেসে ফেললো, "বিয়ের এখনো দেরী আছে। তাই খাওয়া দাওয়া সুরু হয়ে গেছে এখন থেকেই। চলুন আপনাকে বসিয়ে দিই।"

"বিয়ের লগ্ন কটায়?"

"দশটায়।"

"আমি তো বিয়ে না দেখে নড়বো না," বিদ্যুত হাসিমুখে বললো।

শ্যামলী কি বলবে ভেবে পেলো না। তারপর হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "প্রাণে ধরে দেখতে পারবেন?"

বিদ্যুতের মুখের প্রসন্নভাবের কোনো পরিবর্তন হোলো না, তবে কণ্ঠস্বর একটু গভীর হোলো।

"ওসব কথা আর কেন?"

শ্যামলী একটু চুপ করে রইলো। তারপর বললো, "বর দেখেছেন?"

"হ্যাঁ, একবার একটু উঁকি মেরে দেখে নিয়েছি। বেশ ভালো বর। দুজনকে মানাবে খুব।"

খাওয়ার সময় সারাক্ষণ বিদ্যুতের কাছেই দাঁড়িয়েছিলো শ্যামলী। পরিবেশনকারীদের ডেকে ডেকে বিদ্যুতের পাতে দু-বার তিনবার করে এটা সেটা পরিবেশন করালো। বিদ্যুত যে এত খেতে পারে শ্যামলী ভাবতেই পারেনি। তার বেশ ভালো লাগছিলো ওকে খাওয়াতে। ওর পাতে মিষ্টি তুলে দিলো নিজের হাতে।

"রান্না ভালো হলে আমি খুব খেতে পারি," বললো বিদ্যুত।

"আমি খুব ভালো রাঁধতে পারি," হঠাৎ বেরিয়ে গেল শ্যামলীর মুখ থেকে।

বিদ্যুত হাসলো। "ও কথা শুধু কানে শুনলে তো আমার মন ভরবে না," বললো সে।

"বেশ তো কবে আসবেন বলুন?"

"যেদিন বলবেন।"

হাতমুখ ধুয়ে বাইরে এসে দেখলো শ্যামলী পান হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পান নিয়ে বিদ্যুত বাইরে চলে গেল। শ্যামলী ফিরে এলো বাড়ির ভিতর। বাণী বারান্দা পেরিয়ে এদিকে আসছিলো। শ্যামলীকে দেখতে পেয়ে বললো, "চল, বর দেখে আসি।"

"না, আমি আর ওদিকে যাবো না। সম্প্রদানের সময় দেখবো'খন"।

বাণী চলে গেল। শ্যামলী ঘরে ঢুকতে সবিতা তাকে ইসারায় কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, "ও খেয়েছে তো?"

"খেয়েছে মানে? রাক্ষসের মতো গিলেছে। কী খেতে পারে, বাপরে বাপ!"

সবিতা একটু চুপ করে রইলো। তারপর বললো, "ও কিন্তু খেতে বড়ো একটা পারে না।"

শ্যামলী অবাক হয়ে তাকালো সবিতার দিকে।

সবিতা আস্তে আস্তে বললো, "ও যাওয়ার সময় ওকে বলে দিস রাত্তিরে বাড়ি ফিরে যেন ফ্রুট্-সল্ট কি হজমি কিছু একটা খেয়ে নেয়।"

বাণী এসে বললো, "বেশ বর। দুজনকে মানাবে ভালো।"

সবাই তাই বলছে। ওদের নাকি আশ্চর্য কুষ্ঠির মিল, একেবারে রাজ-যোটক।

শ্যামলী কিন্তু বর দেখে আসবার জন্যে কোনো উৎসাহ বোধ করলো না।

দেখতে দেখতে কখন বিয়ের লগ্ন এসে গেল। শানাইতে তখন খাম্বাজ ধরেছে। শাঁখ বাজছে, হুলুধ্বনি হচ্ছে মুহুর্মুহু। মধ্যবিত্ত বাড়ির বিয়ে, কিন্তু সমারোহের আনন্দ ও হট্টগোল যেন রাজবাড়িকেও হার মানায়। টোপর মাথায়

দিয়ে জোড় পরে বর বসে আছে পিঁড়ির উপর। বাণী আর শ্যামলী অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে কনে নিয়ে এলো।

সাত পাক হচ্ছে। শ্যামলী দাঁড়িয়ে ছিলো এক পাশে। চারদিকে মেয়ে পুরুষ বড়ো ছোটোদের ভিড় ও কলরব। শ্যামলী এদিক ওদিক তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজলো। দেখলো, সে দাঁড়িয়ে আছে এক কোনে। শ্যামলী আস্তে আস্তে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। সে শ্যামলীকে দেখে একটু হাসলো, কিন্তু কোনো কথা বললো না। সে গভীর মনযোগের সঙ্গে অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি লক্ষ্য করছে।

সাত পাক হয়ে গেল। মালা বদল হচ্ছে এবার।

খুব জোরে শাঁখ বেজে উঠলো। উলু দিলো মেয়েরা। চাপা পড়ে গেল শানাইয়ের সুর, তারপর আস্তে আস্তে আবার স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

শ্যামলী তাকিয়ে ছিলো বিদ্যুতের দিকে। ভাবলেশহীন সেই মুখ। চারপাশের হাসি ও সংলাপের মধ্যে বিদ্যুতের মনের স্তব্ধতা এতক্ষণে অনুভব করতে পারলো শ্যামলী।

বিদ্যুত ফিরে তাকালো। দেখলো শ্যামলী তার দিকে তাকিয়ে আছে। একটু হেসে বললো, "রাত হয়ে যাচ্ছে, এবার আমি যাই।"

সবিতা তার বরের হাতে হাত রেখে চোখ নিচু করে মন্ত্র পড়ছিলো। একবার চোখ তুলে চকিতে চারদিক তাকিয়ে নিলো। দেখলো, ভিড়ের মধ্যে শ্যামলী একপাশে দাঁড়িয়ে আছে।

সে কোথায়?—ভাবলো সবিতা। কিছুক্ষণ পরে আরেকবার চকিত দৃষ্টি সঞ্চালিত করলো চারদিকে। মনে হোলো,—সে চলে গেছে। হঠাৎ তার চোখ দুটি সজল হোলো।

বেশী দিনের কথা নয়, এই তো সেদিন—কলেজ স্কোয়ারের এক কোনে বসে সে খুব আস্তে আস্তে বিদ্যুতকে বলেছিলো, আমরা দুজন দুজনের, চিরকালের জন্যে, জন্মজন্মান্তরের জন্যে, কেউ কোনোদিন আমাদের দুজনকে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারবে না।

তখন বিদ্যুত বলেছিলো—, সবিতা ভাবলো, না থাক, ওসব কথা আর ভেবে কি লাভ। ভাববো না ওর কথা, কোনোদিন না, যে আমার কথা একটু ভেবে দেখেনি, আমার জন্যে একটুও মনের জোর দেখাতে পারেনি, কী হবে তার কথা ভেবে।

নতুন জীবন সুরু হচ্ছে। আর পেছন ফিরে তাকাবো না। সবাই তো খুশী হয়েছে, বাবা খুশী হয়েছেন, মা খুশী হয়েছে, ভায়েরা নিশ্চিন্ত হয়েছে। ঝামেলা রইলো না বলে বিদ্যুতও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে।—আমার আর দুঃখ কিসের।

এতক্ষণে অনুভব করলো যে, তার হাত আরেকটি হাতে ধরা আছে। উষ্ণ, বলিষ্ঠ সেই হাত। জোর করে সে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস চাপলো।

— চার —

বিয়ের মাসখানেক পরের কথা। সবিতা কয়েকদিনের জন্যে বেড়াতে এলো বাপের বাড়ি। খবর পেয়ে শ্যামলী দেখা করতে এসেছিলো। সবিতা খবর দিয়েছিলো বাণীকেও। বাণী আসেনি, শ্যামলীকে বলেছিলো, "তুই যা, আমি এখন আর যাবো না। পরে কোনো একদিন ওর শ্বশুরবাড়ি গিয়ে দেখা করবো'খন। কলকাতায় তো থাকবে। দেখা হবেই।"

"এখন যাবি না কেন?" শ্যামলী জিজ্ঞেস করেছিলো।

"গিয়ে আর কি হবে। শুনবো তো শ্বশুরবাড়ির গল্প আর স্বামীর সঙ্গে ভাব হওয়ার উপাখ্যান। ওর মুখে একদিন বিদ্যুতের গল্প শুনেছি, আর সেই মুখে অন্য লোকের সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস আমার সইবে না।"

শ্যামলী একাই এলো। এসে দেখলো, খুব ঝলমলো হয়েছে সবিতার চেহারা। একটা নতুন লাবণ্যের ঢল নেমেছে শরীর ভরে।

"কী দেখছিস?" সবিতা জিজ্ঞেস করলো।

"দেখছি, তুই এইকদিনেই অনেকটা বদলে গেছিস," শ্যামলী আস্তে আস্তে বললো, "তোর চেহারা অনেক ভালো হয়েছে। কি রকম রোগা হয়ে গিয়েছিলি বিয়ের আগে।"

ঘরের ভিতর ছিলো মা, মাসীমা, পাশের বাড়ির মঞ্জুশ্রী আর আরো দুতিনজন আত্মীয় মহিলা। সবিতা শ্যামলীর হাত ধরে বারান্দায় গিয়ে বসলো। চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, "তুই কি বলতে চাইছিস আমি জানি। তোর খুব অবাক লাগছে, না?"

"অবাক খুব একটা লাগছে না," উত্তর দিলো শ্যামলী, "তবে ভাবছিলাম, এই কি হয় শেষ পর্যন্ত? এত সহজে অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে মনকে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়?"

"তোর কি ধারণা এটা খুব সহজে হয়েছে," একটু গম্ভীর হয়ে গেল সবিতা।

"তোর চেহারা দেখে আর কি ভাববো বল?"

সবিতা একটু তাকালো শ্যামলীর দিকে, তারপর বললো, "দ্যাখ, যদ্দিন বিয়ে হয়নি তদ্দিন মনে নানারকম উৎকণ্ঠা ছিলো, উদ্বেগ ছিলো, কষ্ট ছিলো। বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছি আমার বিয়ের জন্যে মা-বাবার কী দুর্ভাবনা, তাতে আমার মনে আর সুখ কি করে থাকবে, বল? পড়াশুনো করবার ইচ্ছে

ছিলো, কিন্তু জানতাম সে হবে না। আজকালকার আর দশজন মেয়ের মতো স্বাধীন-ভাবে রোজগার করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ইচ্ছে, বুঝতে পারলাম তারও কোনো সম্ভাবনা নেই। একজনকে ভালো লাগলো। দেখলাম, সোজা রাস্তায় তার সঙ্গে বিয়ে হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। নানারকম দুর্ভাবনা মনে চেপে বসলো। এক এক সময় রাগে চোখে জল আসতো। মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলে, নিজের জীবন নিজের পছন্দ মতো গড়ে তুলবার অধিকার আমার নেই? ভাবলাম,—বেশ, কাউকে কিছু বলে নিজের অধিকারে যখন কিছু পাবো না, এ সংসারে যখন গুরুজনদের একমাত্র কর্তব্য কোনোরকমে আমায় আরেকটি সংসারে পার করে দেওয়া, তখন আমার একমাত্র উপায় হচ্ছে এ সমস্যাটা একদিন থেকে আরেকদিনে ঠেকিয়ে রাখা, যদ্দিন না একমাত্র যার উপর ভরসা করতে পারি সে আমার ভার নিতে সক্ষম না হচ্ছে। কিন্তু বেশীদিন পারা গেল না, বাবার রিটায়ার করবার সময় এসে গেল, উনি আমায় আর বেশীদিন ঘরে রাখতে নারাজ। মায়ের কোনো জোর নেই। দাদাকে বললাম, সেও আমার দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে চাইলো না। তাকে দোষ দিই না, তার নিজের স্বপ্ন আছে, পরিকল্পনা আছে, আমার জন্যে সে ফেঁসে যাবে কেন বল? তখন ভরসা করবার মতো শুধু একজন ছিলো। কিন্তু সেও পেছিয়ে গেল—।"

"পেছিয়ে গেল কি রকম," শ্যামলী কৌতূহলভরে জিজ্ঞেস করলো।

"ওসব কথা এখন আর বলে কি লাভ! যা হবার হয়ে গেছে। আমি শুধু বলতে চাই একথা যে, আমার আর কিছু করবার ছিলো না। বাণী কি তুই যে আমার বিয়ে করতে রাজী হওয়াটা ভালো ভাবে নিতে পারিসনি, সে কি আমি বুঝিনা? তোরা ভাবছিস এ খুব সহজে হয়েছে। খুব গোলমাল হলে, খুব হৈ চৈ হলে তোরা খুব খুশী হতিস। তোরা রোমান্স দেখেছিস, তাই এই রোমান্সের পরিণতি রোমান্টিক উপন্যাসের মতো হতে দেখলে তোরা খুব খুশী হতিস। যদি প্রায়োপবেশন করে কি জিদ করে কি যে করেই হোক মা-বাবাকে রাজী করাতে পারতাম বিদ্যুতের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে, কিংবা কারো কথা না শুনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে যেতাম বিদ্যুতের হাত ধরে, তোরা আমায় আদর্শ নারী মনে করতিস। যদি বিষ খেয়ে কি গলায় দড়ি দিয়ে নিজেকে শেষ করে দিতাম, দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলে মনে মনে আমায় বাহবা দিতিস। কিন্তু ওসব তো করতে গেলাম না, মা-বাবার কথা মতো যে চুপচাপ বিয়ে করতে বসলাম, পারিপার্শ্বিক অবস্থা স্বীকার করে নিলাম, সেটা তোদের রুচিতে বাধছে। এর মধ্যে তোরা আমার মনের জোরের অভাবই দেখলি, সত্যি সত্যি যে কতো-খানি মনের জোর আমার প্রয়োজন হয়েছে, সেটা জানলিও না।"

শ্যামলী সবিতার একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে চাপ দিলো একটুখানি।

সবিতা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো। তারপর বলে গেল নিজের মনে, "বিয়ের আগে অতো মনের কষ্ট গেছে, তাই রোগা ছিলাম। এখন তো কোনো দুর্ভাবনা নেই। অতীতকে নিয়ে কোনো দুঃখ নেই, ভবিষ্যতের কোনো ভাবনা নেই, কাজের মধ্যে শুধু খাওয়া, নতুন বৌ বলে সেজে গুঁজে বেড়ানো, বিকেল বেলা একটু ঘরদোর গুছোনো, রাত্রিবেলা স্বামীসেবা। এখন কোনো ব্যথা নেই, দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, কোনো ইমোশান নেই, আছে শুধু নতুন সংসারের প্রতি একটা কর্তব্যবোধ। সুতরাং শরীরটা ভালো হয়েছে, শরীরটা শরীর তো, মনের উপর যখন কোনো চাপ নেই, তখন শরীরের ওজন দু-তিন সের বাড়বেই। তা-ছাড়া, স্ত্রী-পুরুষের পারিবারিক জীবনযাপনের একটা মানসিক স্বাস্থ্যকর দিক আছে তো, সেটা প্রথম দিকে শরীরে একটা লাবণ্য এনে দেয়।"

শ্যামলী চুপচাপ শুনছিলো। একটু হেসে বললো, "সবাই তোকে দেখে মনে করবে তুই সুখী হয়েছিস।"

"তা হবো না কেন? এও এক রকমের সুখ বৈকি। যখন বাপের বাড়ি এলাম, প্রথমটা সবারই চোখে কৌতূহল, সবারই চোখে প্রশ্ন। আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিলো একজন একজন করে প্রত্যেকে। তারপর দেখলাম সবারই মুখে স্বস্তির হাসি, বাবা মায়ের দিকে তাকালো, মা দাদার দিকে তাকালো। ভাবখানা যেন,—আগে বলিনি! সব ঠিক হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত। দেখে দেখে আমাদের চুল পাকলো, কিসে ভালো হবে [illegible]সে মন্দ হবে আমরা বুঝিনা?"

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো শ্যামলী [illegible]পর জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, একটা কথা বল, তোর স্বামীকে পেয়ে তুই সুখী হয়েছিস?"

"আমার কোনো দুঃখ নেই," সবিতা হেসে উত্তর দিলো।

"তুই ওকে ভালোবাসতে পারবি?"

"আমার যা কিছু কর্তব্য সব করে যাবো," উত্তর দিলো সবিতা।

"আমার কথা এড়িয়ে যাস নে। সোজাসুজি বল, ওকে তুই ভালোবাসতে পারবি?"

সবিতা উত্তর দেওয়ার আগে একবার আকাশের দিকে তাকালো। তারপর বললো, "হয়তো পারবো। এক সঙ্গে ঘর করতে করতে, দুজনের সুখ দুঃখের ভাগ নিতে নিতে স্নেহ, বন্ধুত্ব, সহানুভূতি সবই গড়ে উঠবে, তারপর তার থেকে ভালোবাসাও গড়ে উঠবে। আর সে না হলেই বা ক্ষতি কি, যদি দুজন দুজনের

প্রতি কর্তব্য করে যেতে পারি, তাই যথেষ্ট। লোকে সংসার করে ভালোবাসার জন্যেই শুধু নয়। এ একটা সামাজিক কর্তব্য। সেখানে ভালোবাসাটা একটা ফাউ। হলে ভালো, না হলে ক্ষতি কি। কর্তব্যটা করে গেলেই হোলো। তবে এটা যৌথ ব্যাপার। যে কোনো একজনের যদি কর্তব্যে গুরুতর অবহেলা হয়, তখন প্রশ্নটা অন্যভাবে ভেবে দেখতে হবে।"

"তুই অনেক বড়ো বড়ো কথা বলতে শিখে গেছিস এরই মধ্যে", শ্যামলী হাসতে হাসতে বললো।

সবিতা একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উত্তর দিলো, "ভাই, আমার মনের বয়েস এই কদিনে অনেক বেড়ে গেছে।"

সবিতার বরের কথা তাকে আর জিজ্ঞেস করেনি শ্যামলী, কিছু জানতে চায়নি। সে যে তার নতুন সংসারে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে, তাইতেই সে মনে একটু শান্তি পেলো। সবিতাকে খুব ভালোবাসতো সে, ভাবলো—সবিতা সুখে থাকলেই হোলো। বর ভালো ফার্মে ভালো চাকরি করে, সংসারে বিশেষ কোনো অভাব নেই—এতটা সৌভাগ্য কটা মধ্যবিত্ত মেয়ের হয়। তার নিজের হবে কিনা কে জানে। তার বাবা হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, মাথার উপর বড়ো আর কেউ নেই, অন্য ভাই বোনেরা সব ছোটো ছোটো। বাপের যা অবস্থা, ঠিক মতো বিয়ে দিতে যে পারবেন না, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাকে চাকরি করে সংসারে সাহায্য করতে হবে। বি-এ পড়ছে এখন, তাও শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠবে কিনা কে জানে। এরই মধ্যে চাকরির খোঁজ খবর নিতে হচ্ছে।

বাণী প্রথমটা অতো নিরুৎসাহ প্রকাশ করলেও শেষ পর্যন্ত না এসে পারলো না। সবিতাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলো তার শ্বশুরবাড়ির কথাবার্তা, জিজ্ঞেস করে করে জেনে নিলো তার বিবাহিত জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বিবরণ।

তারই কাছে শ্যামলী শুনেছিলো সবিতার ফুলশয্যার রাত্তিরের কাহিনী।

বৌভাতের পাট শেষ হতে রাত একটা প্রায় বাজলো। সবিতার বর কমলেশ বাড়ির অন্যান্য সবার সঙ্গে অভ্যাগতদের তদারক করছিলো। তার মামাতো পিসতুতো খুড়তুতো জ্যাঠতুতো বোনেরা তাকে ধরে একরকম জোর করেই ঘরে নিয়ে এলো।

সবিতার তখন খুব ঘুম পাচ্ছিলো। তবু নিরুপায় হয়ে বসে ছিলো অন্যান্য সবার সঙ্গে। মেয়েরা তাকে ফুলের মুকুট ফুলের আভরণে সাজিয়ে দিয়েছে। ঘরের চারদিকে ফুলের ছড়াছড়ি, খাটের বাজুতে গোছা গোছা রজনীগন্ধা লাল সাটিনের ফিতে দিয়ে বাঁধা। বিছানায় গোলাপের পাঁপড়ি বেলফুলের মালা ছড়ানো। কে এক জন বুদ্ধি করে সেণ্টের একটা পুরো শিশি সারা বিছানায় ছড়িয়ে দিয়েছে।

নানারকম মেয়েলী আচার শেষ হওয়ার পর বোনেরা কমলেশকে খাটের উপর সবিতার পাশে বসালো। নানারকম রসিকতা করলো সম্পর্কের বৌদিরা। একজন হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে ফিল্মের একটা সাম্প্রতিক মিলন-সঙ্গীত গাইতে সুরু করেছে, এমন সময় কমলেশের মা আর কাকীমা এসে মেয়েদের ধমকে বকুনি দিয়ে ঘর থেকে বার করে নিয়ে গেলন সবাইকে। সবার শেষে যে গেল সে ভেজিয়ে দিয়ে গেল দরজাটা।

"বাঁচা গেল," বললো কমলেশ, তারপর আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে দরজার শেকল তুলে দিলো।

সবিতা বসে রইলো মুখ নিচু করে।

কমলেশ পকেট থেকে বার করলো একটি নীল ইলেকট্রিক বালব্। পাশের একটি টেবিল ল্যাম্পের সাদা বালব্‌টি খুলে সেটি বসিয়ে দিলো সেখানে। তারপর টেবিল ল্যাম্পটি জ্বালিয়ে দিয়ে নিভিয়ে দিলো ঘরের অন্য দুটো আলো।

স্নিগ্ধ নীল আলোয় ঘর ভরে গেল।

কমলেশ এসে বসলো সবিতার পাশে। একটা হাই তুললো, ঘড়ি দেখলো। তারপর আস্তে আস্তে উন্মোচন করলো সবিতার অবগুণ্ঠন। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললো, "নীল আলোয় তো[illegible] খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।"

সবিতার হাসি পেলো। ভাবলো,—রোদ্দুর নয়, চাঁদের আলো নয়, প্রদীপের আলো নয়, বাইরে সাজানোর জন্যে যে নানারঙের বালব আনা হয়েছে, তারই একটি চুরি করে এনে দেখতে হোলো নববধূর রূপ!

কমলেশ পাঞ্জাবিটা খুলে ছুঁড়ে দিলো আলনার দিকে। জিজ্ঞেস করলো, "তোমার ঘুম পাচ্ছে না?"

মাথা নাড়লো সবিতা।

"আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে। এমন খাটুনি গেছে সারাদিন যে, কী বলবো।" বলতে বলতে ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখলো কমলেশ। নতুন খাট, নতুন আলমারি, নতুন ড্রেসিং টেব্‌ল্, নতুন আলনা। এত ফুলের সৌরভের মধ্যেও নতুন বার্ণিসের গন্ধ নাকে লাগছে। বললো, "তোমার বাবা কিন্তু ফার্ণিচার

ভালো দেননি। দেখে মনে হয় যেন, শেয়ালদা থেকে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড কিনে তাতে নতুন পালিশ করা হয়েছে। ঝর্ণা ঠিকই বলেছে।"

ঝর্ণা কে, বুঝতে পারলো না সবিতা। তবে জানতেও চাইলো না।

কমলেশ সবিতার কাছ ঘেঁষে বসলো আরেকটুখানি, সবিতার হাতখানি তুলে নিলো।

"আমাকে তোমার পছন্দ হয়েছে, সবিতা ?"

হ্যাঁ—সবিতা মাথা কাত্ করলো।

"তোমাকেও আমার খুব পছন্দ হয়েছিলো, একেবারে সেই প্রথম দেখাতেই।"

সবিতা একটু হেসে মাথা নিচু করে রইলো।

"তোমার বুঝি লজ্জা করছে ?"

সবিতা আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো।

"আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি তোমায়। ভালোবাসতে কতো সময় লাগে ?"

সবিতা একটু হাসলো। কোনো উত্তর দিলো না। ভাবলো, শেষ হতেই বা কত সময় লাগে।

"যাও, তুমি কোনো কথা বলছো না। একটু এদিকে মাথা নাড়ছো, একটু ওদিকে মাথা নাড়ছো।"

"কি বলবো বলুন," খুব মৃদু গলায় সবিতা বললো।

"বলুন নয়, বলো।"

"আচ্ছা, তাই।"

"ওই যে জিজ্ঞেস করলাম,—ভালোবাসতে কতো সময় লাগে।"

"জানি না," নরম গলায় সবিতা উত্তর দিলো।

"আমি জানি। এদ্দিন জানতাম না। ভাবতাম ভালোবাসা গড়ে উঠবার জন্যে অনেক সময় দিতে হয়, অনেক অন্তরঙ্গতা, অনেক চেনাশোনা, গভীর পরিচয় দরকার হয়। এখন দেখছি, ওসব কিছু নয়। ঠিক এক মিনিট লাগে। তোমায় দেখেই ওকথা বুঝেছি।"

খুব ভালো কথা,—মনে মনে ভাবলো সবিতা। প্রকাশ্যে মুখ ব্রীড়াবনতা করে বসে রইলো।

"তুমি আমায় ভালোবাসো, সবিতা ?" বলতে বলতে কমলেশের হাই এলো। প্রাণপণ চেষ্টা করেও চাপতে পারলোনা।

হাই অত্যন্ত ছোঁয়াচে। হাই এলো সবিতারও। বললো, "বড্ড ঘুম পাচ্ছে।"

"আচ্ছা, শুয়ে পড়ো। কাল কথা হবে," বালিশে ঠেশ দিয়ে কমলেশ বললো, "ফুলশয্যার দিনে বৌভাত আইন করে তুলে দেওয়া উচিত। লোকজনকে খাওয়াতে এত পরিশ্রম হয় যে, আর কিছু করবার জোর থাকে না।"

সবিতা একপাশে শুয়ে পড়লো গুটিসুটি হয়ে।

তখন রজনীগন্ধা আর বেলফুলের গন্ধে ঘর ভরে গেছে। জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে ঘরের মধ্যে। নেমন্তন্নবাড়ি একেবারে স্তব্ধ। কয়েকটা কুকুরের শোরগোল শোনা যাচ্ছে রাস্তার ডাস্টবিনের আশ-পাশ থেকে।

কমলেশ উপুড় হয়ে কনুইতে ভর দিয়ে মাথা তুললো। আস্তে আস্তে ডাকলো ," সবিতা।"

সবিতা চোখ খুলে তাকালো।

"দেখ সবিতা, আজ আমাদের ফুলশয্যার রাত। জীবনে এটা দুবার আসবে না , আমার জীবনেও না, তোমার জীবনেও নয়। আজকের এই রাত যেন আমরা চিরকাল মনে রাখতে পারি।"

সবিতার মনে একটু সহানুভূতি এলো কমলেশের জন্যে। জীবনে এই প্রথম একজন পুরুষের নিভৃত অন্তরঙ্গ সাহচর্য, একটা অজানা অনুভূতিতে সবিতারও বুক ঢিপ ঢিপ করছে।

"তাই বলছিলাম—,"বলে কমলেশ একটু থামলো।

একটু বলার অপেক্ষায় থেকে সবিতা জিজ্ঞেস করলো, "কি?"

কিছুক্ষণ উসখুস করলো কমলেশ। তারপর বললো, "না, ভাবছিলাম, আমি একটু সেতার বাজাবো। তুমি শুনবে?"

"বাড়ির সবাই কি ভাববে?"

"ওরা জানে, আমি ঘুমোনোর আগে কিছুক্ষণ সেতার বাজাই। খুব আস্তে বাজাবো।"

ঘরের মেঝেতে সেতার নিয়ে বসলো কমলেশ। খুব আস্তে আস্তে সুরু করলো বাহারের আলাপ।

শুনতে শুনতে সবিতা মুগ্ধ হয়ে গেল। সত্যি, বেশ ভালো বাজাতে শিখেছে কমলেশ। সবিতা একটুখানি উঠে বালিশে ঠেস দিয়ে আধশোয়া হয়ে বসলো।

বাজাতে বাজাতে কমলেশ লক্ষ্য করলো সবিতা তাকিয়ে তাকিয়ে শুনছে তার বাজনা। এক ঝলক হাওয়া এলো ঘরের ভিতর, মাতাল হয়ে গেল অজস্র গোলাপের পাঁপড়ির গন্ধে।

আলাপ শেষ করে আর গৎ ধরলো না কমলেশ। সেতার একপাশে রেখে দিয়ে সবিতার কাছে এসে বসলো।

শ্যামলীকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে শোনাচ্ছিলো বাণী।

"কী আশ্চর্য ব্যাপার ভেবে দেখ, প্রথম রাত্তির থেকেই ভাব। আমি জিজ্ঞেস করলাম,—আচ্ছা সবিতা, আমায় সত্যি করে বল, তোর একবারও বিদ্যুতের কথা মনে পড়েনি?"

বাণীর প্রশ্ন শুনে সবিতা কিছুক্ষণ চুপ করে ছিলো। তারপর বললো, "না ভাই, সারা সন্ধ্যা একটুও মনে পড়েনি। মনে পড়েছিলো শুধু একবার, সে অনেক রাত্তিরে। আমার কর্তা তখন খুব ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু আমার চোখে আর ঘুম নেই। জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি তো তাকিয়েই আছি। হঠাৎ দেখি একটি মস্তো বড়ো তারা দপদপ করে জ্বলছে। তখন মনে হোলো বাবা কি করছে এখন, মা কি করছে, দাদা কি করছে, বাণী কি করছে, শ্যামলী কি করছে, বাড়ির সামনের রাস্তা এখন নিশ্চয়ই সেই বাচ্চা ছেলে দুটো রাধা-কৃষ্ণ সেজে হারমোনিয়ামের ক্লান্ত বাজনার সঙ্গে সঙ্গে ঘুঙুর ঝুমঝুম করে আস্তে আস্তে বাড়ি ফিরছে,—আর, হ্যাঁ, বিদ্যুত কি করছে? কি আবার করবে, সবাই নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। এই ভাবতে ভাবতে আমারও কখন ঘুম পেয়ে গেল।"

সবিতার কথা শুনে বাণী ব্যথিত হয়ে চুপ করে ছিলো, কিন্তু বাণীর মুখে শুনে শ্যামলী একটু হাসলো

না, নাক ডাকিয়ে ঘুমোয় [illegible]দ্যুত।

শ্যামলী জানতো।

সবিতার বৌভাতের পরদিন সন্ধ্যেবেলার ঘটনা।

ভবানী দত্ত লেনে শ্যামলী একটা টিউশানি করতো। সেটা সেরে ফেরার পথে হ্যারিসন রোডের মোড়ে এসে দেখলো বিদ্যুত ট্রাম ধরবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে।

"বাড়ি ফিরছেন?" শ্যামলী জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ, বড্ডো ভিড়, দুটো তিনটে ট্রাম ছেড়ে দিতে হয়েছে।"

ট্রাম ধরবে শ্যামলীও। দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ট্রামের অপেক্ষা করতে

লাগলো। আরো গোটা ছয়েক ট্রাম বেরিয়ে গেল। বড্ড ভিড়, ওঠা অসম্ভব, তাই ট্রাম ছেড়ে দিতে হোলো।

"আপনি কদ্দুর যাবেন?" শ্যামলী জিজ্ঞেস করলো।

"শ্যামবাজারের চৌমাথা অবধি। আপনি?"

"আমি থাকি বীডন স্ট্রীটের কাছাকাছি। চলুন হেঁটে যাই ওই পর্যন্ত। সেখান থেকে আপনি ট্রাম নিয়ে নেবেন। ফাঁকা হয়ে যায় ওদিকটায়।"

দুজনে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ধরে হাঁটতে লাগলো পাশাপাশি।

"কাল সবিতার বৌভাতে গিয়েছিলেন?" বিদ্যুত জিজ্ঞেস করলো কিছুক্ষণ পর।

"হ্যাঁ। আপনি যান নি?"

"না। আমার তো বৌভাতের নেমন্তন্ন ছিলো না। ওখানে কাউকে তো চিনি না।"

"অনেক লোক এসেছিলো। প্রচুর প্রেজেন্ট পেয়েছে সবিতা।"

"তাই নাকি?"

"আচ্ছা, আপনি কি প্রেজেন্ট দিয়েছেন সবিতার বিয়েতে?"

"আমি?" একটু চুপ করে রইলো বিদ্যুত, "আমি দিয়েছি একটি মেঘদূত, আর একটি ওমরখৈয়াম। ও ওমরখৈয়াম খুব ভালোবাসতো।"

শ্যামলী কিছু বললো না। একটু পরে বিদ্যুত জিজ্ঞেস করলো, "এদিকে আপনি কোথায় এসেছিলেন?"

"একটা টিউশানি করি ভবানী দত্ত লেনে। সেখানে গিয়েছিলাম।"

"আপনি টিউশানি করেন!"

"হ্যাঁ। করতে হয়।" শ্যামলী এক[illegible]হাসলো।

আলাপ চলছিলো এভাবেই। দুটো চারটে কথা, তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ, আবার দুটো চারটে কথা,—এমনি। একটু যেন অসোয়াস্তি বোধ করছিলো দুজনেই। এক সময় কতো গল্প, কতো হৈ হুল্লোড় এরা দুজনে করেছে বাণী আর সবিতার সঙ্গে বসে। কতো কথা তখন বলার ছিলো, বলে বলে যেন ফুরোতে চাইতো না। আজ সবিতা নেই, তাই যেন কথা বলারও কিছু নেই। একথা শ্যামলীর বার বার মনে পড়ছিলো। বেশ অনুভব করতে পারছিলো যে বিদ্যুতেরও মনে পড়ছে।

হঠাৎ এক সময় বিদ্যুত জিজ্ঞেস করলো, "সবিতার বরের নাম কি?"

"কমলেশ।—কমলেশ বোস।"

"আচ্ছা, কি করেন তিনি?"

"ভালো চাকরি করেন মার্টিমার এ্যাণ্ড ফিশারে, বোধ হয় পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্টে আছে।"

"ও।"

কিছুক্ষণ আবার চুপচাপ।

এবার প্রথম কথা বললো শ্যামলী। জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, একটা কথা বলবেন আমায়?"

"কি?"

"কিছু মনে করবেন না?"

"না, মনে করবো কেন? বলুন।"

"সত্যি সত্যি কি হয়েছিলো আপনাদের মধ্যে? এক কথায় বিয়ে করতে রাজী হয়ে যাবে, সবিতা তো সেই মেয়ে নয়।"

বিদ্যুত গম্ভীর হয়ে গেল। বললো, "ওসব আলোচনা করে আর কী লাভ?"

"অন্তত আমাদের জানবার অধিকার নেই?"

বিদ্যুত একটু চুপ করে রইলো, তারপর বললো, "আমাদের মধ্যে কি হয়েছিলো জানতে চাইছেন? না, বিশেষ কিছু হয়নি। দোষ আমার। আমি ঠিক মনের জোরটা দেখাতে পারিনি। ও বললে, এক্ষুনি বিয়ে করো। আমি বললাম বছর খানেক অপেক্ষা করো। সে বললে, না সে হয় না। আমি বললাম, আমার পক্ষেও বা কি করে হয়? আমার বাবা সাংঘাতিক লোক। একথা শুনে সে উত্তর দিলো, নিশ্চয়ই আমার বাবার চাইতে বেশী নয়। এ ধরণের দুটো চারটে কথা কাটাকাটি।"

"ব্যস? এতেই এত!"

"আমারই মস্তো ভুল হয়ে [illegible]ছে।"

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ পথ চললো দুজনে। এ প্রসঙ্গ নিয়ে আর আলোচনা করতে চাইছিলো না শ্যামলী। তাছাড়া লক্ষ্য করলো যে, বিদ্যুত অত্যন্ত ক্লান্ত। জিজ্ঞেস করলো, "আজ খুব ঘুরেছেন বুঝি?"

"না, তেমন কিছু নয়। কাল রাত্তিরে ঘুম হয়নি। তাই বোধ হয় খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। দুপুরটাও ঘুমোতে পারলাম না।"

"কেন?"

"আজ আবার সকাল থেকে বাবার শরীরটা খারাপ। তাই ডাক্তারের বাড়ি যেতে হয়েছিলো।"

কাল রাত্তিরে ঘুম হয়নি। শ্যামলী বুঝতে পারলো। খুব মৃদু কণ্ঠে বললো, "কেন মিছিমিছি রাত জাগলেন?"

"এমনি। কাছেই একটি বাড়িতে সেদিন খুব বৌভাতে হট্টগোল। চুপচাপ বসে একটি বই পড়েছিলাম। বই যখন শেষ হোলো তখন চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। ভাবলাম, একটুখানি বারান্দায় বসি। চমৎকার শুক্ল-পক্ষের রাত। জ্যোৎস্নায় চারদিক ধবধব করছে। হঠাৎ কখন দেখি ভোর হয়ে আসছে।"

"বাবার কি হয়েছে?"

"হার্টের ট্রাব্‌ল্‌ ছিলো অনেকদিন থেকেই। আজ খাওয়া-দাওয়া করেছিলেন অন্যান্যদিনের মতো। হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমারও শরীরটা ভালো নেই। বিকেল থেকেই একটু শরীর খারাপ লাগছে।"

ততক্ষণে ওরা বিবেকানন্দ রোডের কাছাকাছি এসে পড়েছে।

"জ্বর হয়নি তো?" শ্যামলী হঠাৎ বিদ্যুতের গায়ে হাত দিয়ে দেখলো, "একি, গা যে একটু গরম মনে হচ্ছে। আমার ভয়ানক অন্যায় হয়ে গেছে। আপনাকে এতটা হাঁটিয়ে আনা আমার উচিত হয়নি। শুনুন, আপনি এখান থেকে ট্রাম ধরুন। আর হাঁটতে হবে না আপনাকে।"

বিদ্যুত হঠাৎ একটু বিপর্যস্ত বোধ করলো। বললো, "না, না, বীডন স্ট্রীটের মোড় থেকেই ট্রামে চাপবো। আর এই তো একটুখানি।"

"না।" বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে ট্রামস্টপে দাঁড়িয়ে পড়লো শ্যামলী, "আপনাকে ট্রামে তুলে দিয়ে তবে আমি যাবো।"

ট্রামে বসবার জায়গা ছিলো। ট্রাম ছাড়বার পর জানলা দিয়ে মুখ বার করে তাকিয়ে দেখলো বিদ্যুত। শ্যামলী তখন রাস্তা পার হবার জন্যে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।

বিদ্যুতের মাথাটা একটু ধরেছে। গা একটু গরম। সে ভাবলো, এখন জ্বর হলে তো বিপদে পড়বো।

সেদিন তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লো শুধু একবাটি দুধ খেয়ে। রাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেল তিনচার বার। প্রত্যেক বারই মনে হোলো কেউ যেন তার গায়ে হাত দিয়ে তাপ অনুভব করছে। খুব ঠাণ্ডা স্নিগ্ধ সেই হাত।

শ্যামলীও বাড়ি ফিরলো বিদ্যুতের কথা ভাবতে ভাবতে। এই তো সেদিনকার কথা, কিরকম হৈ-চৈ করে দিন কাটতো সবার। এরই মধ্যে কতো-খানি বদলে গেল। এই বিশ্বসংসারে আর কারো কিছু এলো গেল না, শুধু নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লো বিদ্যুত।

নিঃসঙ্গতা ভালো নয়, তার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বোঝে শ্যামলী। তার

বাড়িতে যে কী কষ্ট, কাউকে সে বলে না। অভাব নেই কোন মধ্যবিত্ত বাড়িতে, কিন্তু তাদের বাড়িতে সেই সঙ্গে আছে মনের দৈন্য, তাইতে যেন বিষিয়ে থাকে বাড়ির আবহাওয়া।

ছোটো ভাই এসে দরজা খুলে দিলো। বাবা বসেছিলো একটি মোড়ার উপর। চিন্তা কুঞ্চিত ললাট, মুখে দু-দিনের দাড়ি। শ্যামলীকে দেখে জিজ্ঞেস করলো, "মাইনে দিয়েছে?"

"না, কাল দেবে বলেছে।"

হাতে রেসের খাতা। সেটি একপাশে রেখে শ্যামলীর বাবা অবিনাশ ভটচায উঠে দাঁড়ালো। নিজের মনে বিড় বিড় করে বললো, "কাল শনিবার। সেটা খেয়াল আছে? এই যে এতবড় সংসারটা চালাচ্ছি, সেটা কেউ ভেবে দেখে না? গেলবার বেলায় সব আপন।"

শ্যামলী চলে যাচ্ছিলো। ডেকে বললো অবিনাশ ভটচায, "হ্যাঁ রে, সত্যি সত্যি টিউশানিতে গিয়েছিলি তো?"

শ্যামলী তার জনককে শুধু একটু তাকিয়ে দেখলো।

অবিনাশ ডাক্তার বলে গেল, "ওপর তলার হারাধন ফিরেছে কিছুক্ষণ আগে। বলছিলো, ট্রাম থেকে নাকি দেখেছে তুই হেঁটে আসছিস। সঙ্গে একটি ছেলে।—কে ছিলোরে সঙ্গে?"

"এমনি চেনা একজন।"

"কে, শুনি না!"

"তুমি চিনবে না।"

"চিনতে আমি চাইনে," হঠাৎ গর্জে উঠলো অবিনাশ ডাক্তার, "আমি শুধু তার পরিচয় চাই। আমি এই সংসারের কর্তা, না কি?"

বাপকে চিনতো শ্যামলী। মিথ্যে বলতে হোলো তাকে। বললো, "আমার এক বন্ধুর সঙ্গে ওর বিয়ের ঠিক হয়েছে।"

"কোন বন্ধু?"

"বাণী।"

"ও। তা ওর সঙ্গে রাস্তা ধরে হেঁটে আসবার কি দরকার? ও বাড়ির কেষ্ট হালদার যখন তার বোনের সঙ্গে তোকে সিনেমায় নিয়ে যেতে চায়, তখন তো ন্যাকামোর পার পাওয়া যায় না। আমার ভালো লাগে না, আমি অন্য কারো সঙ্গে সিনেমায় যাই না, অমুক না, তমুক না। লেখাপড়া সে বেশী না করুক, দোকানদারি করে হাতে দুটো পয়সা করেছে তো। আজ যে তুই তোর টিউশানির টাকাটা আনলিনা, এখন আমায় টাকা ধার করতে ওরই কাছে যেতে

হবে তো! কাল শনিবার, এ কথা তুই ভুলে গেলি? বাপের জন্যে তোর এটুকু কর্তব্য নেই?"

শ্যামলী চুপচাপ ভেতরে চলে গেল। ভেতর থেকে মায়ের গর্জন শোনা গেল।—শখ দেখ, ছোঁড়ার শখ দেখ, মাছের মুড়ো খাবে। বলি, দুটো কুচো চিংড়ি পাচ্ছিস, তাই তোর কপাল, না মাছের মুড়ো খাবে। যেমন বাপ, তেমনি ছেলে।—ওরে নন্তু, তুই ওখানে কি করছিস। কতোবার বলেছি আচারের বোতলে হাত দিবি না, ফের হাত দিয়েছিস।"

পিঠে ঠাঁই ঠাঁই চড় চাপড়ের আওয়াজ এলো। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র চিৎকার।

শ্যামলী একটু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো।

এই পরিবেশ নিয়েই বেঁচে থাকবার জন্যে যুঝতে হবে।

তাদের একতলার দু-কামরার ফ্ল্যাটে আলো নেই, বাতাস নেই, তাদের জানলা দিয়ে আকাশ দেখা যায় না। রান্না ঘরের পাশে আছে একটুখানি দাওয়া, সামনে পাশের বাড়ির মিত্তিরদের মস্তো বড়ো সেকেলে বাড়ির মস্তো উঁচু দেওয়াল। রাত্তিরের অন্ধকারে থিয়েটারের ড্রপসীনের মতো দেখায়। সেখানেই একটু নিরিবিলিতে চুপচাপ বসে থাকতে পারে শ্যামলী।

সেদিনও রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর সেখানেই বসে ছিলো শ্যামলী।

হঠাৎ তার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়লো।

নিজের মনে ভাবলো,—কদ্দিন, এমনি করে আর কদ্দিন?

বিদ্যুত শ্যামলীকে বলেছিলো, আজকাল ক্লাস শেষ হওয়ার পর সে সোজা বাড়ি ফেরেনা, লাইব্রেরীতে বসে পড়াশুনো করে সন্ধ্যে অবধি।

চারদিন পাঁচদিন সে সন্ধ্যের পর অনেকক্ষণ ট্রাম স্টপে দাঁড়িয়ে ছিলো। দেখা হয়নি বিদ্যুতের সঙ্গে। দিন আট নয় পরে দেখা হয়ে গেল।

"আপনার বাবার শরীর কি রকম?" শ্যামলী জিজ্ঞেস করলো।

"ভালো নয়। সেই একরকমই আছেন।"

"আপনাকেও একটু রোগা দেখাচ্ছে।"

"কয়েকদিন জ্বরে ভুগলাম।"

"ওমা, তাই নাকি?" উৎকণ্ঠা অনুভূত হোলো শ্যামলীর কণ্ঠে।

"এখন সেরে গেছি।"

"এরকম ভিড়ে ট্রামে উঠবেন কি করে?"

"তাই তো ভাবছি।"

"কিন্তু হেঁটে যাওয়া তো ঠিক হবে না আপনার পক্ষে।"

বিদ্যুত হঠাৎ হেসে ফেললো, বললো, "না, তা ঠিক হবে না, অথচ এখন ট্রামও ধরা যাবে না। ওই রেস্তরাঁয় ঢুকে দু-কাপ চা খেলে কি রকম হয়?"

একটি কোচিনে গিয়ে বসলো দুজনে। বেয়ারা এসে পর্দা টেনে দিয়ে গেল।

সেখানে বসে দুজনেই বিষণ্ণ হয়ে গেল। দুজনেরই মনে পড়লো সবিতার কথা। দুজনে দুজনের দিকে তাকালো, তারপর চোখ নামিয়ে নিলো শ্যামলী।

কিছু একটা বলতে হবে। শ্যামলী বললো, "আমায় সেকেণ্ড পেপারটা একটু পড়িয়ে দেবেন?"

"কিসের সেকেণ্ড পেপার? হিস্ট্রির?"

"হ্যাঁ।"

বিদ্যুত খুব আনমনা হয়ে গেল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, "পড়াশুনো করাটা আপনাদের কাছে শুধু একটা সময় কাটানোর উপলক্ষ, না?"

"সে কথা কেন বলছেন?"

"তা ছাড়া আবার কি? আমাদের পড়াশুনো করতে হয়, রোজগার করবার পথ করবার জন্যে। আপনাদের শুধু যদ্দিন বিয়ে না হয়, তদ্দিন পড়াশুনো।"

শ্যামলী একটু চুপ করে থেকে বললো, "আমায় চাকরি করে সংসার চালাতে হবে। ভাই বোনেরা সব ছোটো ছোটো, শুধু আমিই বড়ো। আমার শুধু যদ্দিন চাকরি না পাই, তদ্দিন পড়াশুনো।"

কি যেন ভাবলো বিদ্যুত। তারপর বললো, "আপনি চাকরি পেলে চাকরি করবেন?"

"এক্ষুনি।"

"আমার এক বন্ধু ভালো চাকরি করে এক বিলিতী ইলেকট্রিক্যাল ফার্মে। ওদের অফিসে মেয়েদের জন্যে কয়েকটি চাকরি খালি হয়েছে। মাইনে বোধ হয় সব কিছু মিলিয়ে একশো চল্লিশ কি দেড়শো। ওর হাত আছে। আমায় বলছিলো, যদি চেনাজানা কেউ থাকে তো ঢুকিয়ে দিতে পারে। আপনি করবেন?"

"দেড়শো?" ভাবতেই পারলো না শ্যামলী।

"কাল ওকে বলবো। যদি কাল বিকেলে কি পরশু আপনার বাড়ি গিয়ে আপনাকে খবর দিই?"

"না, না, বাড়ি নয়। পরশু সন্ধ্যেবেলা আমি ওখানে ট্রামস্টপে দাঁড়িয়ে থাকবো।"

দিন পোনেরো পরে নতুন চাকরিতে যোগ দিলো শ্যামলী।

বিদ্যুতের সঙ্গে তারপর আর দেখা হয়নি এ পর্যন্ত। বাণী বা সবিতাকে জানিয়েছে যে সে কলেজ ছেড়ে দিয়ে চাকরিতে ঢুকেছে, কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারেনি যে চাকরিটা বিদ্যুতের যোগাযোগেই পাওয়া।

বাণী সবিতাকে জিজ্ঞেস া বিদ্যুতের কোনো খবর সে রাখে কিনা

"কোত্থেকে রাখবো বল," সবিতা উত্তর দিয়েছিলো, "আর, রেখেই বা কী হবে।"

বিদ্যুতের জন্যে বাণীর কৌতূহল খুব। কিন্তু কোনো যোগাযোগ নেই।

বাণীর কাছে এসব কথা শুনতে শুনতে শ্যামলীর মনে হচ্ছিলো, বলে দিই যে, আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। ভালোই আছে।

তারপর ভাবলো, আমার কী দরকার।

বাণী বলে গেল, "কিন্তু এমন অদ্ভুত ব্যাপার, বিদ্যুতের খবর পাওয়া গেল সেদিনই।"

শ্যামলী খুব উৎসুক দৃষ্টিতে বাণীর দিকে তাকালো, জিজ্ঞেস করলো, "সেদিনই? কেন, কি খবর পেলে।?"

বাণী সবিতার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলো দুপুর বেলা। গল্প করতে করতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। বাণী যখন চলে আসছে, নিচে রাস্তা অবধি এগিয়ে দিতে এলো সবিতা।

কোনো মেয়ে যখন আরেকটি মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে যায়, ভেতরে বসে হয় দুনিয়ার যতো সব অপ্রাসঙ্গিক কথা। আসল কথাগুলো হয় চলে আসার সময়, সিড়িতে দাঁড়িয়ে।

বাণী বলছিলো, "তুই রোববার আমাদের বাড়িতে আয়। সেখানেই খাওয়া দাওয়া করবি। শ্যামলীকে খবর দোবো, গল্প করবো সারাদিন। বিকেলে চা-টা খেয়ে বাড়ি ফিরবি।"

সবিতা রাজী হোলো।

"যদি বলিস তো খোঁজ খবর করে বিদ্যুতকেও ডাকিয়ে আনতে পারি বিকেলে চায়ের সময়।"

"না, থাক, ওকে আবার কেন ?"

"হাজার হোক, আমার আর শ্যামলীর পুরোনো বন্ধুতো। তোর সঙ্গে না থাক, আমাদের সঙ্গেও যে যোগাযোগ থাকবে না, সেটা ভাবতে ভালো লাগছে না। ওকে আমাদের খুব ভালো লাগে।"

সবিতার মুখে কোনো ভাবান্তর ঘটলো না। সহজ ভাবেই বললো, "না, ওকে আর ডাকিসনে। ওকে চা খাওয়াতে চাস তো আরেকদিন ডেকে খাওয়াস, যখন আমি থাকবো না।"

"না," বাণী বললো, "আমি চাই না যে, তোর মনে সে, কিংবা তার মনে তুই কাঁটা হয়ে থাকিস, যা হয়েছে তো হয়ে গেছে, কিন্তু তাই বলে সারাজীবন মনে একটা ব্যথা পুষে রেখে লাভ নেই। আমাদের সবারই মধ্যে একটা সহজ সম্পর্ক থাক। তুই ভয় পাচ্ছিস কেন ?"

"না, আমি তো ভয় পাচ্ছি না।"

"তাহলে ওকে ডাকতে মানা করছিস কেন ?"

"এমনি, আমাদের তিনজন মেয়ের মধ্যে সে একটি পুরুষ মানুষ কি করবে ?"

"একটি পুরুষ মানুষ হতে যাবে কেন। বাঃ তোর বরকেও ডাকবো যে।"

"বেশ, যাকে খুশী ডাকিস। আমার কোনো আপত্তি নেই।"

"কিন্তু আমার কাছে বিদ্যুতের ঠিকানা নেই।"

"সমরের কাছে আছে। সে চেনে ওদের বাড়ি। আমার বিয়েতে ওকে নেমন্তন্ন করতে গিয়েছিলো।"

"ওকে তাহলে ডেকে দে না রে। ঠিকানাটা নিয়ে নিই।"

"ও তো বাড়ি নেই। কোথায় যেন বেরিয়েছে।"

"তা হলে ?"

"ওকে কাল সকালে তোর বাড়ি পাঠিয়ে দেবো।"

"বেশ, তাই করিস। আচ্ছা, আমি যাই এবার।"

কিন্তু তখনো গেল না। মেয়েদের সিঁড়ির কথাবার্তা সহজে ফুরোয় না, আরেকটা কি প্রসঙ্গ উঠে পড়লো।

ওরা যখন কথা বলছে, এমন সময় সমর এসে পড়লো।

"এই, তোমাকেই খুঁজছিলাম," বললো বাণী।

"কেন ? কি ব্যাপার ?"

"বিদ্যুতবাবুর ঠিকানাটা দাও তো। আমার একটু দরকার।"

"বিদ্যুতবাবু ? আরে ওর সঙ্গে তো খানিকক্ষণ আগে দেখা হোলো

সুকিয়া স্ট্রীটের মোড়ে। খালি পা, খালি গা, গায়ে, শুধু একটি চাদর, মাথার চুল উস্কোখুস্কো।"

"কেন রে? ওর আবার কি হোলো?" সমস্বরে জিজ্ঞেস করলো বাণী আর সবিতা।

"ওঁ বাবা মারা গেছেন তিন চার দিন হোলো। হার্টের অসুখে ভুগছিলেন।"

"মারা গেছেন!" বলে উঠলো বাণী।

"তিন চারদিন আগে!" বলে উঠলো সবিতা।

"বিদ্যুতের বাবা!" বাণীর কথা শুনতে শুনতে বলে উঠলো শ্যামলী।

শ্যামলী যে হঠাৎ একটা ধাক্কা খেলো বাণীর কাছে খবরটা শুনে, বাণী সেটা খেয়াল করলো না।

"সমরের কাছ থেকে ঠিকানাটা নিয়েছিস?" শ্যামলী জিজ্ঞেস করলো।

"না, তখন আর নেওয়া হোলো না, এখন আর ঠিকানা নিয়ে কী হবে? ওকে তো আর চায়ে ডাকতে পারবো না। কিন্তু আসল কথাটা শোন্—সমরের কাছে খবরটা পেয়ে সবিতার মুখ যে কি কালো হয়ে গেল না যে, কি বলবো।"

"বোধ হয় বিদ্যুতের কথা ভেবে ওর একটু কষ্ট হয়েছে," বললো শ্যামলী।

"বিদ্যুতের কথা ভেবে না আরো কিছু। লটারির টিকিট কিনে লোকে যদি দেখে শুধু এক নম্বরের জন্যে ফার্স্ট প্রাইজটা ফস্কে গেছে, তখন যে রকম মুখের চেহারা হয়, ঠিক তেমনি চেহারা হোলো সবিতার। ভাই, আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত। আমি ঠিক ধরতে পেরেছি ওর মনের কথা।"

"কি?"

"ওর নিশ্চয়ই একথা মনে হয়েছে যে, বুড়োটা যদি মরলো তো আর কিছুদিন আগে মরলো না কেন। তা হলে তো আমার আর বিদ্যুতের বিয়ে কেউ আটকাতে পারতো না।"

"যাঃ—।"

"সত্যি তাই। বাজী রাখ আমার সঙ্গে। তোকে একটা কথা বলে দিচ্ছি, সবিতা যতোই দেখাক যে, সে খুব সুখী হয়েছে, সে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে তার নতুন সংসারে, আমি বলে দিচ্ছি ও বিদ্যুতকে ভুলতে পারেনি, ভুলতে পারবেও না।"

"দুদিন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। ভোলা কি অতো সহজ নাকি," বললো শ্যামলী।

"কিছু ঠিক হবে না। যাই হোক, আমি ওদের দুজনের ঠিক দেখা করিয়ে দেবো, ওর বরের সঙ্গে বিদ্যুতের ভাব করিয়ে দেবো। ওদের বাড়ির দরজা খুলে দেবো বিদ্যুতের জন্যে। আমি মজাটা দেখতে চাই।"

"না রে। কেন মিছিমিছি—।"

"তুই থাম। দ্যাখ না কি হয়। সবিতার অতো সতীত্বপণা কোথায় থাকে আমি একবার দেখে নেবো।"

শ্যামলী অবাক হয়ে বাণীর দিকে তাকালো। ভাবলো, আশ্চর্য, বাণীর মনে এই কুটিলতা এলো কোত্থেকে।

"তুই কিন্তু রোববার সকাল সকাল আমার বাড়ি চলে আসবি।"

"আচ্ছা।"

বিদ্যুত দোতালার বারান্দায় কুশাসনের উপর চুপচাপ একা মুখে বেদনার একটা শান্ত সমাহিত ভাব। এই মাসখানেকের মধ্যে তার বয়েস যেন অনেক বেড়ে গেছে। দুতিন মাস আগে যে ছেলেমানুষী চঞ্চল ভাবটা ছিলো, সে একেবারে কেটে গেছে। কতো পরিবর্তন হয়ে গেল এর মধ্যে, সে ভাবছিলো,—সবিতাও সরে গেল তার জীবন থেকে, বাবাও চলে গেলেন। সবিতাকে নিয়ে কতো কাল্পনিক তর্ক সে মনে মনে করেছে বাবার সঙ্গে, আজ দুজনের কেউই নেই। মনে আজ আর কোনো দুঃখ নেই, কোনো কষ্ট নেই, শুধু আছে একটা অতল বেদনা। সমুদ্রের তীরে বসে লোকের যেমনি মনে হয়, তেমনিই মনে হচ্ছিলো বিদ্যুতের।

চাকর এসে খবর দিলো,—এক দিদিমণি দেখা করতে এসেছেন।

দিদিমণি? কে আবার?

"এখানেই নিয়ে আয়। আচ্ছা থাক, আমিই নিচে যাচ্ছি।"

নিচে গিয়ে দেখে, শ্যামলী।

"আপনি?"

"হ্যাঁ। খবর শুনে এলাম।"

"আপনি কেন এলেন কষ্ট করে?"

"বাঃ, কষ্ট আবার কি? আপনি আমার জন্যে এত করলেন, আর আমি আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে আসতে পারবো না?"

"আমার ঠিকানা পেলেন কোথায়?"

"পেলাম।"

"কোথায় ?"

"সমরের কাছে।"

"সমর ? সমর কে ?"

"চেনেন না ? সবিতার ভাই।"

"সবিতার ভাই।" স্তব্ধ হয়ে গেল বিদ্যুত।

বিদ্যুতের বাড়ি শ্যামবাজারের চৌমাথার কাছে একটি বড়ো রাস্তার উপর। রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে অনেক পথিক, অনেক গাড়ি ঘোড়া। বাস, রিকশ, সাইকেল।

বিদ্যুত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো অচেনা পথিকদের সেই আসা যাওয়া, তারপর জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, সবিতা জানে ?"

"কি ?"

"আমার বাবা মারা গেছেন ?"

"হ্যাঁ, জানে।"

খুব সহজ ভাবে উত্তর দিলো শ্যামলী। কিন্তু একটা অব্যক্ত ব্যথা তার মন মুচড়ে দিলো।

— পাঁচ —

কয়েক মাস কেটে গেল।

সবিতার স্বামী কমলেশ বড়ো ঘরের ছেলে। শিউলিবাগান লেনের বোসেদের খুব নাম ডাক ছিলো এক সময়, কিন্তু এখন অড়বস্থা পড়ে গেছে। তাদের মস্ত বড় বাড়ি এখন ভাগ হয়ে গেছে নানা সরিকের মধ্যে। খুড়ো, জ্যাঠা এবং অন্যান্য জ্ঞাতি বাস করে বাড়ির বিভিন্ন অংশে। কারো সঙ্গে কারো বনিবনাও নেই, ঝগড়াবিবাদ মন কষাকষি লেগেই আছে সামান্য সামান্য ব্যাপার নিয়ে। সবাইকে একজোট হতে দেখা যেতো শুধু বিয়ে কি শ্রাদ্ধ এ ধরণের কোনো সামাজিক ব্যাপারে।

কমলেশদের অংশে ছিলো দোতলার উত্তর কোনে তিনটি ঘর আর একটি রান্নাঘর। ওর নিজের সংসার ছিলো ছোটো, তাই কোনো অসুবিধে ছিলো না। ওর সঙ্গে থাকতো ওর মা, ছোটো ভাই পুলকেশ আর বিধবা ছোটো বোন ঝর্ণা।

মধ্যবিত্ত সংসারে ছোটোখাটো অভাব অভিযোগ অসুবিধে থাকে, এদেরও ছিলো, কিন্তু বিশেষ কোনো অশান্তি ছিল না। সবিতার কোনো অবহেলা ছিলো না সংসারের কাজে, সব কিছু গুছিয়ে ঠিক মতো করতো, এজন্যে তার উপর খুব প্রীতই ছিলো কমলেশের মা সাবিত্রী। শ্বাশুড়ি বর্তমান, সুতরাং সবিতার সংসারের কর্ত্রী হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু সাবিত্রীর বয়েস হয়েছে, বাতের ব্যথা আছে, সুতরাং আসল কর্তৃত্ব ছিলো ঝর্ণার হাতে। সংসার খরচার টাকা-কড়ি থাকতো তারই কাছে , হিসেবপত্তরও সে-ই রাখতো। সাবিত্রীর মনে প্রথম দিকটা একটু ভয় ছিলো যদি এ নিয়ে ননদ-ভাজে কোনো সংঘাত বাধে। স্বামীর অকালমৃত্যুর পর শ্বশুরবাড়িতে ঝর্ণার স্থান হয়নি, তাই তাকে আশ্রয় নিতে হয়েছে বড়ো ভায়ের কাছে, তার আত্মমর্যাদা বোধ যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, নিজের দুর্ভাগ্যের বেদনা যাতে ভুলে থাকতে পারে, এজন্যে তার হাতে কিছু কর্তৃত্ব আর দায়িত্ব থাকা প্রয়োজন। কিন্তু নতুন বৌ পুরোনো হয়ে গেলে এই ব্যবস্থা মেনে নিতে আপত্তি জানাতে পারে, বিশেষ করে যখন তার স্বামীর রোজগারে সংসার চলে। সাংসারিক হিসেবপত্তর রাখবার দায়িত্ব সাবিত্রী তুলে দিতে চেয়েছিলো সবিতার হাতে, কিন্তু সবিতা খুব সহজ ভাবেই জানালো যে, সে হয়না। একজনের কাছে থাকবে তহ্‌বিল আর আরেকজনের কাছে থাকবে হিসেব, তাতে নানারকম অসুবিধে হতে পারে। যেমনটা চলছে তেমনই চলুক।

সাবিত্রী একথা শুনে খুসী হয়েছিলো, বুঝে নিয়েছিলো যে সবিতা খুব বিচক্ষণ মেয়ে।

কিন্তু ঝর্ণা শুনে ঠোঁট উল্টে বললো, "এ একটা ঢং। বেশ তো, তহবিলও হাতে চাই, একথা বলুক না। আমার কি? আমি এ বাড়ির কে? ওর সংসার, ও-ই সব দেখুক। আমার দু-বেলা দু-মুঠো ভাত জুটলেই আমি খুশী। তার জন্যে ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসনমাজা যা করতে বলো, আমি করবো।"

কমলেশ সবিতাকে বলেছিলো, "ঝর্ণা বড়ো দুঃখী, ওর কথা শুনে তুমি কিছু মনে কোরো না, ওকে কিছু বোলোও না ,।"

"তুমি কি মনে করো আমার বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু নেই?" উত্তর দিয়েছিলো সবিতা, "আমি মেয়েমানুষ, ঝর্ণা আমার সমবয়েসী, ওর দুঃখু তোমার চাইতে আমি অনেক বেশী বুঝি।"

সংসারের কাজেকর্মে যা কিছু নির্দেশ সবিতা শ্বাশুড়ির কাছ থেকেই নিতো, যা কিছু প্রয়োজন জানাতো তাঁকেই। শ্বাশুড়ির সেবা পরিচর্যা করতো প্রাণভরে। সাবিত্রী সবাইকে জানাতো, এ তো বৌ নয়, সাক্ষাত লক্ষ্মী। এত ভালো বৌ পাওয়া অনেক ভাগ্যের কথা।

ঝর্ণার ভালো লাগতো না। সে বলতো, সব বৌ সমান। একদিন না একদিন নিজের স্বামীকে তার মা, বোন, ভায়েদের কাছে থেকে আলাদা করে নেবেই।

তার মনে একটা ভয় ছিলো যে সংসারের যাবতীয় কর্তৃত্ব সব একদিন তার হাত থেকে চলে যাবেই। তাই কমলেশের বিয়ের পর থেকেই তার মনে একটা প্রতিরক্ষা-বৃত্তি জেগে উঠেছিলো। নিজের মনকে প্রস্তুত করে রেখেছিলো সংঘর্ষের জন্যে। কিন্তু সবিতা যে তাকে সে সুযোগ দিলো না, তাতে তার মন আরো আশঙ্কিত হয়ে উঠলো। সবিতা যে তার কাছ থেকে কোনো নির্দেশ চায় না, যা কিছু জিজ্ঞেস করবার সাবিত্রীকে জিজ্ঞেস করে, এসব অসহ্য হয়ে উঠলো তার কাছে। মাঝে মাঝে সবিতার কাছে কর্তৃত্ব জাহির করবার চেষ্টা করতো। বয়েসে একটু ছোটো বলে তাকে সে বৌদি বলে ডাকতো না, সম্বোধন করতো বৌ বলে। বলতো,—ও বৌ, ওদিকের জানলায় বেশী দাঁড়িও না, ওদিকের বাড়ির ছেলেটা বড়ো বজ্জাত—কালো পাড় শাড়ি পোরো না বৌ, ওতে তোমায় মানায় না—ও সব বাজে ইংরেজি নভেল পড়ে কি হবে, কথামৃত পড়ো, রামায়ণ পড়ো, গীতা পড়ো,—"

সবিতা তার কথা গায়ে মাখতো না। যা করবার নিজের ইচ্ছে মতো করে যেতো। মনে হোতো যেমন ঝর্ণার কথাগুলো তার এক কান দিয়ে ঢুকছে, অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

ঝর্ণার রাগ হোতো। একদিন মায়ের কাছে গিয়ে নালিশ করলো, "তোমার ছেলের বৌ কোনো কথা শোনে না মা।"

সাবিত্রীর ভালো লাগলো না মেয়ের এই বাড়াবাড়ি। আস্তে আস্তে বললো, "তুই ওকে কিছু বলতে যাস নে। আমি তো আছি।"

ঝর্ণা চলে গেল মুখ ভার করে।

তেতলার একদিকে থাকতো কমলেশের জ্ঞাতি খুড়তুতো ভাই পরাশর। তার বৌ অঞ্জলির সঙ্গে সবিতার একটু অন্তরঙ্গতা ছিলো। খুব ভালো সেলাই জানতো সে। অবসর পেলে সবিতা তার কাছে যেতো অনেক সময়।

ঝর্ণা একদিন সবিতাকে বললো, "অঞ্জলির সঙ্গে অতো বেশী মাখামাখি কোরো না। মেয়েটি ভালো নয়।"

"ভালো নয়?" সবিতা একটু হাসলো, "আমি তো তার মধ্যে খারাপ কিছু দেখি নি।"

"তুমি এখানে নতুন, তুমি কি করে জানবে? পরাশরদা'র এক বন্ধু এক-সময় খুব যাওয়া আসা করতো। নানা রকম কথা উঠেছিলো তাকে নিয়ে। এখন পরাশর-দার সঙ্গে ওর বন্ধুর মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত নেই।"

সবিতা মনে মনে একটু হাসলো। কিছুদিন ধরে পরাশরদের সঙ্গে ঝর্ণার খুব বনিবনাও নেই। অথচ তার আগে খুব বেশী রকম মাখামাখি ছিলো। বাড়িতে কোনো ভালো রান্না হলে ঝর্ণা পরাশরের জন্যে নিয়ে যেতো বাটি ভরে, বাড়িতে খাওয়ানোর কোনো উপলক্ষ হলে পরাশরকে আমন্ত্রণ করা হোতো। ঝর্ণার কিছু প্রয়োজন হলে, পরাশরের হাতে টাকা দিয়ে তার নিজের পছন্দ মতো কিনে আনবার ফরমাশ দেওয়া হোতো। পরাশরের তিনচারটে জামা ঝর্ণা নিজের হাতে রিপু করে দিয়েছে। একটি সোয়েটারও বুনে দিলো এক সময়।

তদ্দিন অঞ্জলি শুধু লক্ষ্য করেছে, কিছু বলেনি। হয়তো গায়েও মাখে নি। তার সঙ্গে ঝর্ণার কোনো সখ্য, কোনো রকম মাখামাখি, কিছুই ছিলো না। কথাবার্তা যতোটুকু না বললে নয়, তার বেশী বলতো না কেউ।

একদিন ঝর্ণা পরাশরকে ধরে পড়লো তাকে থিয়েটার দেখাবার জন্যে। যে নাটকটা সে দেখতে চায় সেটা পরাশর আর অঞ্জলি দুজনেই দেখেছে।

"তাতে কি?" বলেছিলো ঝর্ণা, "অঞ্জলি বৌদি না হয় তাহলে একদিন বাড়িতেই থাকবে। দেখবো তো আমি, তুমি শুধু আমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। তোমরা না নিয়ে গেলে আমায় কে নিয়ে যাবে পরাশর দা? দাদা তো আমায় নিয়ে যায় না কোথাও। কি বলো অঞ্জলি বৌদি? তোমার কর্তাকে এক বেলা ছুটি দিতে পারবে না?"

"তোমার দাদা তোমায় থিয়েটার দেখিয়ে আনবে, তার জন্যে আমায় জিজ্ঞেস করবার কি আছে," উত্তর দিয়েছিলো অঞ্জলি।

ছ-টার মধ্যে বেরোনোর কথা। ঝর্ণা তৈরী হয়ে বসেছিলো। ছ-টা পেনেরো হোলো পরাশরদার দেখা নেই। অধৈর্য হয়ে ঝর্ণা যখন উপরে খোঁজ করতে যাওয়ার জন্যে উঠে এলো, তখন দেখা গেল অঞ্জলি সেজেগুঁজে নেমে যাচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে।

পরাশর ছিলো একটু পেছনে। ঝর্ণাকে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে বললো, "তোকে থিয়েটারে আরেকদিন নিয়ে যাবো ঝর্ণা। তোর বৌদি বলছে আজ একটু মেজো পিসীকে দেখে আসতে হবে। কিডনির অসুখে ভুগছেন অনেক দিন, যাই যাই করে যাওয়া হচ্ছে না। দুপুর বেলা অঞ্জলি বললো, পিসীর খবর পাঠিয়েছে অনেকবার, আজ একবার না গেলেই নয়।"

ঝর্ণা কোনো কথা না বলে চুপচাপ ফিরে এলো। সেদিন থেকে সে আর পরাশরদের ঘরে যায় না।

অঞ্জলিরই কাছে এ ঘটনা শুনেছিলো সবিতা। এ নাকি ঝর্ণার একটা বাতিক, এক এক সময় এক একজনের জন্যে তার মনে একটু বেশী মায়ামমতার বাণ জাগে। কখনো সামনের বাড়ির অচিন্ত্যবাবু, কখনো একতলার পান্তুর ছোটোমামা, কখনো দোতলার পেছনদিকের নিখিল-দা, কখনো বা পাশের বাড়ির মেডিকেল স্টুডেণ্ট্ মনতোষ,—কারো না কারো জন্যে একটু অতিরিক্ত-দরদ। যার উপর যখন টান, তখন তার জন্যে তরকারি রেঁধে পাঠাচ্ছে, আচার তৈরী করে পাঠাচ্ছে, বাড়িতে লুচি খেতে ডাকছে, সোয়েটার বুনে দিচ্ছে, রুমাল তৈরী করে দিচ্ছে, গল্পের বইয়ের ফরমাশ করছে,—অশোভন এমন কিছু নয় তবে একটু মাত্রাতিরিক্ত। তারপর হঠাৎ যেই মনে হোলো আশে পাশে সবার চোখে হয়তো একটু বড়োবাড়ি ঠেকছে, অমনি সচেতন হয়ে আত্মস্থ হোলো, উঠে গেল সমস্ত মায়ামমতা। কিছুদিন চুপচাপ, তারপর দেখা গেল তেতলার রানীবৌদির ছোটো ভায়ের জন্যে কাঁচকলার কোপ্তা তৈরী হচ্ছে।

"এঁরা জানেন?" সবিতা জিজ্ঞেস করেছিলো।

"কে? জ্যাঠাইমা, কমলেশ ঠাকুর-পো এঁরা? কেন জানবেন না," উত্তর দিয়েছিলো অঞ্জলি, "তবে কোনোরকম বেহায়াপণা তো নেই, তাই কেউ কিছু বলতেও পারে না।"

"কিছু না বলাই ভালো। ঠিক আছে। জীবন তো এভাবেই কাটাতে হবে," বলেছিলো সবিতা।

"হ্যাঁ," একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো অঞ্জলি, "বেচারীর কপাল মন্দ, নইলে

ওর অভাব কি ছিলো। বিয়ে তো ভালোই হয়েছিলো।" একটু চুপ করে থেকে বললো, "একটি ছেলেও যদি হোতো, অন্তত তাকে নিয়ে ভুলে থাকতে পারতো।"

"অন্তত লোকে তাই বুঝতো যে, ছেলেকে নিয়ে ভুলে আছে," সবিতা মুখ টিপে হেসে বললো।

অঞ্জলি হেসে ফেললো। "হ্যাঁ, যার যেমন স্বভাব। যাক এসব আলোচনা করে আর কী লাভ।"

একদিন একটি মেয়ে বেড়াতে এলো সবিতাদের বাড়ি। তাকে দেখে কমলেশের মা সাবিত্রী একটু গম্ভীর হয়ে নিজের ঘরে চলে গেল, কিন্তু কমলেশ আর ঝর্ণা তাকে খুব খাতির করে বসালো।

"আপনাদের বৌ দেখতে এলাম কমলেশ বাবু," সে হেসে বললো, "বিয়ের সময় তো নেমন্তন্ন করেন নি।"

"কী অন্যায়! নেমন্তন্ন করো নি কেন," সবিতা হেসে জিজ্ঞেস করলো কমলেশকে।

"তখন এ কলকাতায় ছিলো না," কমলেশ উত্তর দিলো।

কমলেশের উত্তর শুনে ঝর্ণা একটু মুখ টিপে হাসলো।

"তারপর? এদ্দিন পরে তোমার বৌদিকে দেখতে আসবার সময় হোলো?" কমলেশ জিজ্ঞেস করলো।

"আপনি তো বলেন নি একদিনও—। তাই আজ নিজের থেকেই এলাম।"

সবিতা উঠে গেল চায়ের ব্যবস্থা করতে। কমলেশ সবিতাকে মেয়েটির কোনো পরিচয় দেয়নি, শুধু বলেছিললো,—এ আমাদের রমলা। তাই বারান্দার কাছে সাবিত্রীর সঙ্গে দেখা হতে সবিতা জিজ্ঞেস করলো, "রমলা কে, মা?"

সাবিত্রী উত্তর দিলো, "ও কমলেশের পরিচিত একটি মেয়ে। কমলেশ যে ওস্তাদের সাকরেদ, রমলাও তারই কাছে সেতার শেখে। ভালো বাজায়। রেডিওতেও বাজায় মাঝে মাঝে। কেন, কমলেশ ওর কথা তোমায় বলেনি?"

কমলেশ কোনোদিন বলে নি। তবু সবিতা বললো, "হ্যাঁ, বলেছিলেন বটে একবার, ভুলে গিয়েছিলাম।"

রমলা চলে যাওয়ার পর ঝর্ণা সবিতাকে জিজ্ঞেস করলো, "তোমার সতীনকে কিরকম লাগলো?"

"আমার সতীন!" সবিতা হেসে ফেললো।" সে কি কথা!"

"দাদাকে আবার বলে দিও না ভাই, ভুল করে বলে ফেললাম। মিছিমিছি আমার উপর রাগ করবে। এখন অবশ্যি দাদা আর মুখ ফুটে ওর নাম করে না, কিন্তু বিয়ের আগে তো দিন-রাত রমলার নাম জপ করতো। কিছু মনে কোরো না ভাই বৌ, এমনি ঠাট্টা করে বললাম, পুরুষ মানুষের ওরকম এক আধটু হয়।"

সবিতা মনে মনে বিরক্ত হোলো। ঝর্ণার মনটাই এরকম। সব সময় কারো না কারো নামে এরকম একটা কিছু বলবেই। এ বাড়ির ঊর্মিলাকে যদি পরপর দুদিন ও বাড়িতে যেতে দেখা যায়, দত্তদের বাড়ির শ্যামলকে যদি রাস্তার মোড়ে মুখুজ্যেদের বাড়ির করবীর সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায়, পাশের বাড়ির চন্দ্রার কাছে যদি কোনো অনাত্মীয় অমুক-দার উপহার দেওয়া গল্পের বই দেখা যায়, অমনি তার উর্বর মস্তিষ্ক এ নিয়ে গবেষণা করতে বসবে।

মুখে কোনো অপ্রসন্নতা প্রকাশ করলো না সবিতা। একটু হেসে বললো, "শুধু পুরুষ মানুষের কথা কেন বলছো ঝর্ণা-দি, ওরকম এক আধটু মেয়েমানুষদেরও হতে দেখা যায়। এসব সামান্য কথা নিয়ে মাথা ঘামাতে নেই।"

"মেয়েমানুষদেরও হয়?" কপট বিস্ময়ে চোখ কপালে উত্তোলন করলো ঝর্ণা, "কই আমাদের তো হয়নি কোনোদিন। কি জানি বাবা, আমরা বনেদী ঘরের মেয়ে, বনেদী ঘরের বৌ, আমরা ওসব কথা ভাবতেই পারি না। যাদের মধ্যে সায়েবিয়ানা এসে গেছে তাদের ঘরে হয় বলে নাটকে নভেলে পড়েছি। কই, তুমি তো কলেজে পড়েছো, তোমার তো হয়নি!"

পেট থেকে কথা বার করবার এই ছল যে সবিতা বুঝলো না তা নয়, কিন্তু গায়ে না মেখে হাসতে হাসতে বললো, "হ্যাঁ, আমারও সামান্য একটুখানি হয়েছিলো বৈ কি।"

"বলো কি বৌ!" বলে ঝর্ণা সবিতার হাত চেপে ধরলো। সবিতা দেখলো ঝর্ণার কান দুটো লাল হয়ে গেছে, গরম হয়ে উঠেছে ঝর্ণার হাতখানি।

সবিতা একটু করুণা বোধ করলো ঝর্ণার জন্যে, সহজ ভাবে হেসে বললো, "হ্যাঁ, একটু একটু ভাব ছিলো একজনের সঙ্গে।"

"কে সে? নাম কি তার?"

আসল নাম ভাঙলো না সবিতা, বললো, "ছিলো আমাদের পাড়ার এক খোকন্-দা।" নেহাৎ মিছে কথা সে বলেনি। বিদ্যুতের ডাক নাম ছিলো খোকন।

"তারপর?"

"তারপর আর কি, বিয়ের সম্বন্ধ এলো। এখানে বিয়ে হয়ে গেল।"

"তাকে কেন বিয়ে করলে না ?"

"ও রকম বিয়ে হয় নাকি। ও শুধু অল্প বয়েসের একটা ছেলেমানুষী," সবিতা খুব সহজ ভাবেই বললো, কিন্তু বুকের মধ্যে একটা ব্যথা টনটন করে উঠলো।

সাবিত্রীর ডাক শোনা গেল। ঝর্ণা উঠে পড়ে বললো, "আরেকদিন শুনবো তোমার খোকন-দার গল্প।"

"শোনানোর মতো গল্প কিছু নেই। অন্তত তোমার দাদার মতো দিন রাত কারো নাম জপ আমি করতাম না।"

ঝর্ণা চলে যাওয়ার পর সবিতা নিজের মনে খানিকক্ষণ হাসেলো। তারপর চোখ মুছে নিলো আঁচলের খুঁট দিয়ে।

রাত্তিরে খাওয়াদাওয়ার পর রান্নাঘরে কাজকর্মের পাট সেরে নিজের ঘরে শুতে এসে সবিতা দেখে কমলেশ খুব উদাস হয়ে টেবিলের উপর পা দুটো তুলে সিগারেট টানছে।

সবিতা বিছানার চাদরটা ঠিক করে বালিশগুলো সাজিয়ে খাটের উপর উঠে বসলো। কিন্তু কমললেশের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। চুপচাপ সিগারেট টেনে যাচ্ছে নিজের মনে। সবিতা একটু অবাক হোলো। কমলেশের এই ঔদাস্য একেবারে নতুন। প্রত্যেকদিন খাওয়াদাওয়ার পর সবিতা যতক্ষণ ঘরে না আসে কমলেশ ততক্ষণ সেতার বাজায়, সবিতা এসে বিছানা ঠিক করবার পর সেতারটা তুলে রেখে দরজার ছিটকিনি তুলে দিয়ে সারাদিনের সংযত গাম্ভীর্যের মুখোসটি উন্মোচন করে।

"কি হোলো তোমার ?" সবিতা ডেকে জিজ্ঞেস করলো।

কমলেশ কোনো উত্তর দিলো না।

সবিতা আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না। ভাবলো, পুরুষ মানুষের মন, বিয়ের আগের চেনা বান্ধবী বিয়ের পর নতুন বৌ দেখতে এলে মন নিশ্চয়ই ওরকম একটু উদাস হয়। যাই হোক ভালোই হোলো, ভাবলো সে। খুব ঘুম পাচ্ছিলো তার। মস্তো বড়ো একটা হাই তুললো। তারপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে বললো, "আমার ঘুম পাচ্ছে বড্ডো। তুমি যখন শুতে আসবে আলোটা নিভিয়ে দিয়ো," বলে চাদরটা গায়ের উপর টেনে নিলো।

কমলেশ একটুখানি মুখ ফিরিয়ে আড়চোখে তাকালো। অপেক্ষা করলো কিছুক্ষণ, তারপর আর কোনো সাড়া না পেয়ে আস্তে আস্তে উঠে পড়ে খাটের

উপর সবিতার পাশে এসে বসলো। সবিতা চোখ খুলে দেখলো। বললো, "কি ব্যাপার, এত গম্ভীর কেন, কি হয়েছে?"

কমলেশ কোনো উত্তর দিলো না।

"শুনি না কি হয়েছে?" আবার জিজ্ঞেস করলো সবিতা।

"একটা কথা শুনলাম," কমলেশ বললো।

সবিতা হাই তুললো, "কি কথা?"

"সবিতা, সত্যি সত্যি একটা কথা বলবে? আমায় লুকোবে না?"

সবিতার একটি হাত সে নিজের হাতে তুলে নিলো।

"কি কথা?" সবিতা একটু অবাক হোলো।

"তোমার খোকন-দা কে, সবিতা?"

"খোকন দা!" সবিতা চট করে উঠে বসলো। অবাক হয়েছিলো সে। তারপর হেসে ফেললো।

"হাসছো কেন?"

খুব জোরে টেনে টেনে হাসতে লাগলো সবিতা।

এবার কমলেশের মুখ একটু উজ্জ্বল হোলো।

"হাসছো কেন, সবিতা?"

সবিতা হাসতে হাসতে বললো, "এই ব্যাপার? ওমা, তাই তোমার এত মুখভার '? আমি ভাবলাম বুঝি রমলাকে দেখে তোমার মন খারাপ হয়ে আছে।"

"রমলাকে দেখে আমার মন খারাপ হতে যাবে কেন?"

"শুনবে সত্যি সত্যি? কারো উপর রাগ করবে না বলো।"

"না, রাগ করবো না।"

"রমলা চলে যাওয়ার পর ঝর্ণা হঠাৎ আমায় বললে, তোমার সতীনকে কেমন লাগলো—।"

বাধা দিয়ে কমলেশ চড়া গলায় বলে উঠলো, "ঝর্ণা বলেছে—একথা? দাঁড়াও আমি ওকে—"

"শোনো শোনো, রাগ করছো কেন। সে বললে, ও কিছু নয় বৌ, সব পুরুষ মানুষের ওরকম এক আধটু হয়, তুমি কিছু মনে কোরো না। আমি বললাম,—আমি মনে করতে যাবো কেন, অনেক মেয়ে মানুষেরও ওরকম এক আধটু হয়। এ কথা শুনে, কি বলবো তোমায়, ঝর্ণার সমস্ত শরীরটা কিরকম গরম হয়ে গেল। আমার হাত চেপে ধরে বললো, বাজে কথা, ওরকম হয় না। তোমার কি হয়েছিলো? আমি বললাম,—হ্যাঁ। ও জিজ্ঞেস করলো, —কার সঙ্গে। কি নাম ওর? আমি এখন চট করে নাম পাই কোথায়।

খোকন-দা বলে একজনের নাম মনে পড়লো, তাই বলে দিলাম। আচ্ছা! তা হলে ঝর্ণার এই কাণ্ড, অমনি তোমায় এসে বলে দিয়েছে? আর আমায় কিনা বললে রমলা আমার সতীন, তোমায় বলতে মানা করে দিলো। আচ্ছা মেয়ে বাবা তোমার বোনটি।"

কমলেশের মনের উপর থেকে একটা ভার নেমে গেল। বললো, "যাই হোক, ঠাট্টা করেও কিন্তু অন্য কোনো পুরুষ মানুষের নাম ওরকম ভাবে মুখে আনবে না। মনে রেখো তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী।"

"থাক, থাক, আর অতো বড়ো বড়ো কথা বলতে হবে না," সবিতা হাসতে হাসতে বললো, "বিবাহিতা স্ত্রী হলে কি বিয়ের আগে সত্যি সত্যি কারো সঙ্গে ভাব থাকলে তার নাম উচ্চারণ করতে নেই?"

"অন্য পুরুষের চিন্তা মনে আনা পাপ।"

এবার সবিতার রাগ হোলো। বললো, "দেখ, আমায় পাপ পুণ্য শেখাতে হবে না। স্ত্রী হিসেবে আমার কি কর্তব্য আমি খুব ভালো করেই জানি। যদি সেই কর্তব্যে কোনোদিন কোনো অবহেলা দেখতে পাও তাহলে বলতে এসো, তার আগে নয়। আমার বিয়ের আগের জীবনের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?"

"তুমি সত্যি সত্যি বিয়ের আগে কাউকে ভালোবাসতে সবিতা?" কমলেশের মুখ আবার অন্ধকার হোলো।

"তোমার তো সেকথা জিজ্ঞেস করবার কোনো অধিকার নেই। আমি কি তোমায় রমলার কথা জিজ্ঞেস করেছি?"

"তুমি ভুল বুঝো না সবিতা, রমলা আর আমি একই ওস্তাদের কাছে সেতার শিখেছি।"

"আমি ভুল কি ঠিক কিছুই বুঝতে চাই না। আমার বক্তব্য, তোমার আগের জীবন নিয়ে আমি যেরকম মাথা ঘামাই না, আমার আগের জীবন নিয়ে তুমিও তেমনি মাথা ঘামিও না।"

"কেউ ছিলো না কি সত্যি সত্যি?"

"সে তোমার যা খুশি ভেবে নিতে পারো।"

"কিন্তু ওই যে খোকন-দা—?"

"কোন কথা থেকে সেকথা উঠেছে তোমায় বলেছি। তার থেকে যদি তুমি চায়ের কাপে এরকম তুফান তুলতে চাও তো তোলো। আমার কিছু বলার নেই।"

"না সবিতা, আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না ওই খোকন-দার কথা। ও তুমি নিশ্চয়ই বানিয়ে বলেছো।"

"যদি তাই মনে হয়, তবে এতক্ষণ এই কমিক-অভিনয় করার অর্থ কি। ঝর্ণার মুখে রমলার কথা শুনে কি আমি কিছু জিজ্ঞেস করেছি?"

"ওর আর আমার সম্পর্ক নিয়ে তুমি ভুল বুঝো না।"

"তা হলে খোকন-দার কথা নিয়ে তুমি অতো অবুঝ কেন?"

কমলেশ চুপ করে গেল। আস্তে আস্তে শুয়ে পড়লো সবিতার পাশে, তারপর ওকে বুকে টেনে নিলো। সবিতা তার বাহুবন্ধনের মধ্যে আত্মসমর্পণ করলো দৈনন্দিন অভ্যেস অনুযায়ী।

কমলেশ মুখ নামিয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি আমায় ভালো-বাসো, সবিতা?"

"উঁহুঁ, একটুও না।"

"আমি কিন্তু তোমায় ভালোবাসি, সবিতা।"

"তাই তো উচিত।"

"তোমার কি আমায় ভালোবাসা উচিত নয়, সবিতা?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই উচিত, শাস্ত্রে তো তাই বলে।"

"তাহলে?"

"তবু আমি তোমায় ভালোবাসি না।"

"সবিতা, তুমি ভীষণ দুষ্টু," বললো কমলেশ, তার কণ্ঠস্বর আবেগরুদ্ধ হয়ে এলো।

কমলেশ কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু সবিতার চোখে ঘুম নেই। সে ভাবছিলো,—কেন এরা এত ছেলেমানুষী করে? আমি-তোমায়-ভালোবাসি তুমি-আমায়-ভালোবাসো, কতোখানি, হ্যানো ত্যানো,—এ ছাড়া কি আর কথা নেই। কে কাকে ভালোবাসে সেটা কি লেকচার মেরে মেরে বোঝাতে হবে? সংসারে ভালোবাসা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই? যতো সব ন্যাকামো!

গয়লা আজ আবার দুধে জল মিশিয়েছে। কাল ওকে ধরে একটা বকুনি দিতে হবে,—ভাবতে ভাবতে সবিতা ঘুমিয়ে পড়লো।

এক ঝলক দখিন হাওয়া জানলার খড়খড়ি নাড়া দিয়ে বয়ে চলে গেল।

দু-তিন দিন পরে একদিন দুপুর বেলা সবিতা উপরতলায় অঞ্জলির কাছে গিয়েছিলো এম্ব্রয়ডারির একটা প্যাটার্ণের জন্যে। অঞ্জলি মোড়ের দোকান থেকে মিঠে পান আনালো সবিতার জন্যে। কিছুক্ষণ সাধারণ সংসারিক

কথাবার্তার পর অঞ্জলি হঠাৎ বললো, "সেদিন তোমাদের বাড়ি রমলা এসেছিলো, না ?"

"হ্যাঁ, তুমি তাকে চেনো নাকি ?" সবিতা জিজ্ঞেস করলো।

"চিনি না, তবে নামে জানি। দেখেওছি কয়েকবার। ওর সম্বন্ধে অনেক কথাই আমরা জানি।"

"শুনেছি, খুব ভালো সেতার বাজায়।"

অঞ্জলি হাসলো। বললো, "আমরা যে তাকে সেজন্যে জানি তা নয়, অন্য কারণে জানি।"

সবিতার ভালো লাগলো না এ প্রসঙ্গ। সে অন্য কথা পাড়লো।

কিন্তু অঞ্জলি ছাড়বার মেয়ে নয়। বলে গেল, "রমলাকে তোমাদের বাড়ি ঢুকতে দেওয়া উচিত নয়।"

বিস্ময় প্রকাশ করবার চেষ্টা করলো সবিতা। "কেন ?"

"ওমা, তুমি কি কিছুই জানো না ?"

"আমি আবার কি জানবো ?"

"তাও তো বটে। তুমি জানবেই বা কি করে।"

"আর জেনেও বা আমার কি লাভ ?"

অঞ্জলি ভালো করে তাকিয়ে দেখলো সবিতাকে। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা সবিতা, কমলেশ ঠাকুরপো তোমায় ভালোবাসে ?"

সবিতা উত্তর দিলো খুব সহজ ভাবে। "বাসে না এরকম মনে করবার কোনো কারণ তো আমি আজ পর্যন্ত পাইনি।"

অঞ্জলি একটু ভাবলো। এদ্দিনে তার খেয়াল হোলো যে সবিতা কোনো দিন তার সঙ্গে নিজের স্বামীর গল্প করেনি আর দশজন নতুন বৌয়ের মতো। সে সোজাসুজি বলে ফেললো, "তুমি তো কোনোদিন আমাদের কাছে কমলেশ ঠাকুরপোর গল্প করো না। তোমাদের মধ্যে কোনো গোলমাল নেই তো ?"

"কিচ্ছু না," সবিতা হেসে ফেললো।

"তোমাদের সম্পর্কটা কি রকম ? খুব গভীর ?"

সবিতা হাসতে হাসতে উত্তর দিলো, "কি দিয়ে মাপবো বলো ? আমি অতো ভেবে দেখি না। আর দশজন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যেরকম সম্পর্ক, ঠিক তাই। আমার তো অনুযোগ করবার কিছু নেই।"

অঞ্জলি গালে তর্জনি রেখে তাকিয়ে দেখলো সবিতাকে। জিজ্ঞেস করলো, "যদি তোমাদের মধ্যে এতই ভালোবাসা তাহলে কমলেশ তোমায় কোনোদিন রমলার কথা বলেনি কেন ?"

নিশ্চয়ই কিছু বলবার ছিলো না, তাই বলেনি।"

"কিছু ছিলো না?"

"থাকলে নিশ্চয়ই বলতেন। বাইরের দশজন কাউকে নিয়ে দুটো বললেই কি সেটা সত্যি হয় নাকি?"

অঞ্জলি মুখ টিপে একটু হেসে উত্তর দিলো, "এ বিশ্বাস নিয়ে যদি থাকতে পারো সারাজীবন সুখেই থাকবে। আমাদের কিন্তু ভাই এত সুখ সয় না। আমার কর্তা আমায় এত ভালোবাসেন যে একদিনের জন্যেও চোখের আড়াল করতে চান না, আমি কিন্তু আমার কর্তাকে সব সময় চোখে চোখে রাখি। তুমি তো জানো ভাই, ঝর্ণা সম্পর্কে ওঁর বোন হয়, কিন্তু তার সঙ্গেও একলা থিয়েটারে যেতে দিইনি।"

একথা সবিতার আত্মসম্মানে লাগলো। ঝর্ণা যাই হোক, সবিতার ননদ, বাড়ির মেয়ে। তার সম্বন্ধে আরেকজন এরকম কথা বলবে কেন? বলবার সাহস পাবে কেন? সেও খোঁচাটা ফিরিয়ে দিলো। বললো, "হ্যাঁ শুনেছি তোমাদের মধ্যে নাকি এত ভালোবাসা যে তোমার জন্যে তোমার কর্তার বন্ধু-বিচ্ছেদ পর্যন্ত হয়ে গেছে। ঝর্ণা বলছিলো।"

অঞ্জলির কান দুটো লাল হয়ে গেল। কিন্তু সে কোনো উত্তর দেওয়ার আগে সবিতা উঠে পড়লো।

খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে অভিযোগ করতে সুরু করলো ঝর্ণা। সবিতার মাথার তেল চানের ঘরেই থাকতো। এবার নতুন তেলের শিশি আসবার পর ভাবলো নিজের প্রসাধনের সামগ্রী নিজের ড্রেসিং টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখাই বাঞ্ছনীয়।

তাই নিয়ে কথা উঠলো।

কমলেশের ছোটো ভাই পুলকেশ এক ভেষজ প্রতিষ্ঠানের সেলস্‌ম্যান চাকরিতে ঢুকেছে বছর খানেক হোলো। প্রায়ই কলকাতায় থাকতো না। যখন থাকতো, তখনও বাড়িতে বড়ো একটা পাওয়া যেতোনা তাকে। অবসরের বেশির ভাগ সময় পড়ে থাকতো বন্ধুবান্ধবের আড্ডায়। অত্যন্ত অগোছালো ছেলে, নিজের দরকারী জিনিষ পত্র সম্বন্ধে কোনো হুঁশ নেই। এর টুথপেষ্ট, ওর মাথার তেল, আরেকজনের সাবান,—এই করেই চালিয়ে দিতো। চান করতে যাওয়ার সময় নিজের তোয়ালে খুঁজেই পেতো না কোনো কোনো দিন। বেরোনোর সময় দেখা যেতো বাক্সে পাঞ্জাবি পড়ে আছে চার পাঁচটা, কিন্তু ধুতি

একটিও নেই, সব ধোপার বাড়ি। কিংবা হয়তো ধোয়া প্যাণ্ট আছে তিন চারটি, কিন্তু শার্ট প্রত্যেকটাই ময়লা হয়ে গেছে। তার জন্যে সে কিছু মাত্র অসুবিধে বোধ করতো না, ঝর্ণার তোয়ালে কিংবা কমলেশের ধুতি কি শার্ট নির্বিকার ভাবে চেয়ে নিতো। নিজের টুথব্রাশ ছাড়া আর কোনো কিছু সম্বন্ধে তার কোনো খেয়াল থাকতো না।

আগের দিন সে জলপাইগুড়ি থেকে ফিরেছে। সেদিন সকালবেলা যথারীতি ঝর্ণার গামছা কাঁধে কমলেশের ধোয়া গেঞ্জি হাতে সে কলতলায় উপনীত হোলো। একটু পরেই বাইরে এসে হাঁক ছাড়লো, "দিদি, এখান থেকে তেলের শিশিটা কে নিয়ে গেল?"

ঝর্ণা তেড়ে উত্তর দিলো, "তুমি রোজগার করছো, একটা তেলের শিশি কিনে আনতে পারো না? নিজের জিনিষ নিজে না আনলে, কে যুগিয়ে দেবে সব সময়?"

পুলকেশ অবাক হোলো। দিদির মুখে আজ এ কি নতুন কথা। নিজের প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি যখন বাড়ির এখানে সেখানে হাতড়ালেই পাওয়া যায়, তখন অকারণ কেনাকাটার ঝামেলায় কে যায়? কেউ তো তাকে কোনোদিন এরকম কথা বলেনি। নিজের জিনিষ? এক বাড়ির ভিতর নিজের জিনিষ পরের জিনিষ বলে আবার কোনো ভাগ আছে নাকি?

তুমি বৌয়ের তেল ব্যবহার করবে কেন?" ঝর্ণা বলে চললো, "ওর জিনিষ ও তুলে রেখে দিয়েছে।"

সবিতা তেলের শিশি হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, কিন্তু ঝর্ণা তার দিকে দৃকপাত না করে পুলকেশকে ধমকে বললো, "তেল আর মাখতে হবে না। চান করে এসো।"

দিদিকে একটু ভয় পায় পুলকেশ। চুপচাপ চান করতে চলে গেল।

"কেন ওকে ওরকম ধমক দিলে দিদি? আমি ওর জন্যে তেলের শিশিটা নিয়ে এলাম," সবিতা বললো।

ঝর্ণা মুখ ঝামটা দিয়ে বললো, থাক, আর মমতা দেখাতে হবে না। নিজের জিনিষ যখন আলাদা করে রাখতে সুরু করেছো, তখন আবার গায়ে পড়ে এসব কেন? কেউ তো তোমার কাছে চাইতে যায়নি।"

সবিতা কোনো কথা না বলে চলে গেল। মনে একটু লেগেছিলো, রাত্তিরে কমলেশকে বললো। কমলেশ শুনে চুপ করে রইলো।

দু-চারদিন পরের কথা। কমলেশের এক সহকর্মী তার স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে এসেছিলো। সবাই চা-মিষ্টি খেলো, ওদের সঙ্গে কমলেশও। সবিতা

রাত্তিরে পুলকেশকে দেবে বলে দুটো রসগোল্লা তুলে রেখে দিয়েছিলো, কিন্তু চা খেতে খেতে কমলেশ বললো,—অতীনবাবুকে আরো দুটো রসগোল্লা দাও। অতীনবাবু পেটুক লোক, জোর গলায় না বলতে পারলো না। সবিতাকে এনে দিতে হোলো তুলে-রাখা মিষ্টি।

রসগোল্লার খালি ভাঁড় পড়েছিলো রান্না ঘরে। রাত্তিরে পুলকেশ ভাঁড় দেখে বললো, "রসগোল্লা আনানো হয়েছিলো দেখছি। আমার জন্যে এক আধটা আছে নাকি?"

সবিতা ভেবেছিলো ঝিকে দিয়ে সন্ধ্যেবেলা আনিয়ে রাখবে পুলকেশের জন্যে। কিন্তু ঝি ঠিকে কাজ করে। অন্য একটা বাড়ির কাজ সেরে আবার আসবে বলে আসেনি, তাই আনানো আর হয়ে ওঠেনি।

সবিতা একটু হেসে বললো, "কি করবো ভাই, সব যে ফুরিয়ে গেল।"

ঝর্ণা বলে উঠলো, "তুই রসগোল্লা কোনো দিন দেখিসনি পুলকেশ? বড় হয়েছিস, এখনো তোর হ্যাংলামি গেল না। মিষ্টি কি তোর জন্যে আনানো হয়েছিলো? যাদের জন্যে আনানো হয়েছিলো, ওরা খেয়েছে।"

সবিতা বললো, "দাঁড়াও, মেজ কাকীর ঝিকে যদি পাই ওকে দিয়ে আনিয়ে নিচ্ছি।"

"না, থাক, আর আনাতে হবে না," গম্ভীর গলায় উত্তর দিলো ঝর্ণা।

পুলকেশ ব্যাপারটা হাল্কা করে দেওয়ার জন্যে বলে উঠলো, "পরের বাড়ির চাকরকে দিয়ে ফাই-ফরমাশ খাটিয়ে কি দরকার। বরং আমিই গিয়ে নিয়ে আসছি। সেদিন তো বৌদিকে বলেও ছিলাম যে ওকে সন্দেশ খাওয়াবো। দু-চারটে পান্তুয়া হলেও মন্দ হয় না, কি বলো দিদি।"

"থাক, তোমায় আর এত রাত্তিরে মিষ্টি আনতে যেতে হবে," ধমকে উঠলো ঝর্ণা, "আমাদের কারো অতো শখ নেই মিষ্টি খাওয়ার।"

সবিতা রাত্তিরে কমলেশের কাছে ঝর্ণার রূঢ়তার সম্বন্ধে অভিযোগ করলো। শুনে গম্ভীর হয়ে বসে রইলো কমলেশ।

সংসারের গূঢ় মেয়েলী রাজনীতি অনেক প্রবীণ পুরুষও বুঝে উঠতে পারে না, পুলকেশ তো ছেলেমানুষ। তিন-চারদিন পরে একদিন সবিতার কাছে গিয়ে বললো, "আমায় পাঁচটা টাকা ধার দেবে বৌদি? মাইনে পেলে দিয়ে দেবো।"

সবিতা সংসারের আর দশজন বৌদির মতো হাল্কা সুরে হাসি মুখে বললো, "আমায় কতো সুদ দেবে শুনি?"

পুলকেশ উত্তর দেওয়ার আগেই ঝর্ণা তেড়ে উঠলো পুলকেশকে, "তোর

আবার টাকা ধার করবার কি দরকার পড়লো শুনি? কয়েকদিন আগে দাদার কাছে একটা বকুনি খেলি বৌদির তেল ব্যবহার করছিস বলে। পরশু মিষ্টি আনানোর ব্যাপার নিয়ে দাদা তোকে দুটো কথা বলে গেল, আজ আবার টাকা ধার চাইছিস?"

সবিতা অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলো, 'উনি আবার কি কথা শোনালেন? দরকারই বা কি ছিলো?"

"সে আমি কি জানি," ঝর্ণা ঠোঁট উল্টে উত্তর দিলো, "আগে তো কোনো দিন কোনো কথা উঠতো না। পুলুকে কলেজে পড়ানোর খরচা তো দাদাই দিয়েছে, ওকে মানুষ করেছে, কোনোদিন তো কোনো ব্যাপারে একটা কথা বলেনি। আজ কেন বলছে, সেটা তুমিই ভেবে দেখ। এসব সামান্য ব্যাপার তো দাদার কানে যাওয়ার কথা নয়। আমরা তো বলতে যাইনি। কে তুলে দিয়েছে দাদার কানে?"

সবিতা চুপ করে রইলো। কালো হয়ে গেল তার মুখ।

ঝর্ণা নিজের মনে গজ গজ করে চললো, "সংসারে গণ্ডগোলের সূত্রপাত এভাবেই হয়।"

ব্যাপারটা খুব সাধারণ। মায়ের ঘরে মাঝে মাঝে তিন ভাইবোনের কনফারেন্স বসতো। নিজেদের জ্ঞাতি গুষ্টির চর্চা সমালোচনা হোতো সেখানে। সবিতা সেখানে যোগ দিতো না, সেসময় কোনো একটা কাজ নিয়ে বসে থাকতো নিজের ঘরে। এ ধরণের আলোচনা তার ভালো লাগতো না, স্ত্রী হিসেবে খুব কর্তব্যপরায়ণ হলেও এদের আত্মীয়স্বজনের ব্যাপারে তার মন নিস্পৃহ থাকতে চাইতো।

মায়ের ঘরের পারিবারিক অধিবেশনে কমলেশ একটা দুটো কথা বলে-ছিলো পুলকেশকে। তাকে সে অত্যন্ত স্নেহ করতো, খুটিনাটি ব্যাপারে যে তাকে নিয়ে বাড়িতে কোনো কথা উঠবে তার ভালো লাগেনি। সবিতার মুখে শুনে তার রাগ আসলে হয়েছিলো ঝর্ণার উপরে, কিন্তু বোন তার আশ্রিত, তাকে কোনো কথা বলতে তার বাধলো। তাই একদিন পুলকেশকেই বলেছিলো,—বড়ো হয়েছিস, নিজের জিনিস নিজে গুছিয়ে রাখতে শেখ। ভারী এক শিশি মাথার তেল, তাও একটা কিনে রাখতে পারিস না? কেন মিছি মিছি অন্যের কাছে দুকথা শোনো!

ঝর্ণা এই সংলাপের সময় খুব হাসি-হাসি মুখে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে

তাকিয়ে সামনের দত্তদের বাড়ির কার্নিসের পায়রাগুলিকে পর্যবেক্ষণ করছিলো।

তেমনি আরেকদিন কমলেশ বলেছিলো পুলকেশকে,—বাড়িতে মিষ্টি আসে বাইরের লোকের জন্যে, সব সময় তো হিসেব করে বাড়ির প্রত্যেকের জন্যে অতিরিক্ত আনা যায় না, আনলেও রাখা হয়ে ওঠে না। একজনের ভাগে যদি মিষ্টি কম পড়লো তো কি এলো গেল? তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় নাকি? এসব নিয়ে কথা বললে তো মন ছোটো হয়ে যাবে।

কমলেশ ভেবেছিলো পুলকেশকে বললেও, পরোক্ষ ভাবে বলা হোলো ঝর্ণাকে, এবং সেও সেটা বুঝে নিয়ে চুপ করে থাকবে।

কিন্তু কমলেশ পুরুষমানুষ। সংসারের সাধারণ ঘটনা মেয়েদের হাতে কি রকম জটিল রূপ ধারণ করে, এ জ্ঞান তার ছিলো না।

সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে ফিরে কমলেশ দেখলো সবিতা ঘরের এককোনে চুপ করে বসে আছে। তার মুখ ফোলা ফোলা।

"কি হোলো তোমার?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো কমলেশ।

প্রথমটা কোনো উত্তর দিলো না সবিতা, তারপর দু-চারবার প্রশ্নের পুণরাবৃত্তির পর বলে উঠলো, "আচ্ছা, তোমার কি বুদ্ধি শুদ্ধি একটুও নেই? এই সব সামান্য ব্যাপারে তোমার মাথা গলানোর কি দরকার ছিলো শুনি।"

কমলেশের বিস্ময় কাটলো না। জিজ্ঞেস করলো, "কেন, কি হয়েছে?"

"ঝর্ণার কথা শুনে আমি না হয় মনের দুঃখে তোমার কাছে বললাম, কিন্তু তুমি তা নিয়ে পুলুকে দুকথা শোনাতে গেলে কেন?"

"আমি আবার পুলুকে কি শোনাতে গেলাম?"

সবিতার মুখে একটু একটু করে সমস্ত ব্যাপারটা শুনলো। শুনে গম্ভীর হয়ে বললো, "ও, ঝর্ণা পুলুকে এই বুঝিয়েছে তা হলে?"

সবিতা উঠে পড়ে বললো, "ওসব কথা এখন থাক। তুমি হাত মুখ ধুয়ে নাও। আমি তোমার জলখাবার নিয়ে আসি। তোমার আমার মধ্যে যা কথা হবে, আর কোনোদিন কাউকে বলতে যাবে না বলে দিচ্ছি। তাহলে সবাই ভাববে, আমিই এসে তোমার কাছে লাগাচ্ছি।"

সবিতার মন ভার ছিলো সারাদিন, কিন্তু সন্ধ্যের পর বাড়ির কাজকর্মে মন দিয়ে আবার হাল্কা হয়ে গেল। মনে যা ছিলো, সে সব মুখ ফুটে ভাষায় ব্যক্ত করায় যেন মনের সমস্ত বোঝা নেমে গেল।

তার এই ভাবপরিবর্তন লক্ষ্য করলো ঝর্ণা। এক ফাঁকে মাকে বললো, “বৌ নিশ্চয়ই আজ আবার লাগিয়েছে দাদার কাছে।”

এবং একথা কানে গেল সবিতার। রাত্তিরে মুখভার করে আবার বললো কমলেশকে।

কমলেশ ততক্ষণে মনে মনে উত্যক্ত হয়ে উঠেছে। ব্যাপারটা চাপবার জন্যে সে সব কথা চাপা দিয়ে নানারকম ভাবে আদর করে উদ্‌ব্যস্ত করে তুললো সবিতাকে, তারপর এক সময় বললো, “সবিতা, আমার একটা কথা তুমি রাখবে?”

“কি কথা?”

“তুমি ঝর্ণার কথায় কোনোদিন কিছু মনে কোরো না। ও বড় দুঃখী।”

“আমি তো ওকে কোনোদিন কিছু বলি না।”

“তুমি কিছু বলো না জানি, কিন্তু ও কিছু বললেও তুমি গায়ে মেখো না। তোমার আমি আছি, কিন্তু ওর কে আছে বলো তো?”

সবিতা চুপ করে রইলো। মনে মনে বললো—কেন, ওর মা আছে, দাদা আছে, ভাই আছে। ওরা ওর কেউ নয়? তোমাদের কথাবার্তা শুনে তো তা মনে হয় না। আছে মনে করলে সবাই আছে। নেই মনে করলে কারো কেউ নেই। আমার তো সবাই আছে, কে আমার জন্যে কি করছে শুনি?

কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বললো না।

“ঝর্ণার জন্যে মাঝে মাঝে আমার খুব ভাবনা হয়,” কমলেশ বলে গেল, “শুধু দুই ভাই আর মাকে নিয়ে এই সংসার তো চিরকাল এমনি থাকবে না। সংসার আরো বড়ো হবে। সে যদি সবার সঙ্গে মানিয়ে গুছিয়ে এই সংসারকে আপনার করে থাকতে না পারে তো বয়েস হলে খুব কষ্ট পাবে।”

“ওর এত কম বয়েসে বিয়ে দিয়েছিলে কেন?” সবিতা জিজ্ঞেস করলো।

“কম বয়েস কোথায়? তখন ও ষোলো পেরিয়ে সতেরোয় পড়েছে।”

“সতেরো ভারী বয়েস! আজকাল কুড়ি একুশের আগে বিয়েই হয়না মেয়েদের।”

এ তর্কে গেল না কমলেশ, বললো, “ভালো ছেলে পেয়ে গেলাম, তাই দিয়ে দিলাম।

“এক বছরের বেশী তো সংসার করতে পারে নি।”

“পুরো এক বছরও বা হোলো কোথায়,” বলতে বলতে কমলেশের গলা ভারী হয়ে গেল, “আট মাস যেতে না যেতে বিধবা হোলো।”

"ওর শ্বশুর শ্বাশুড়িই বা কী পাষণ্ড! বাড়িতে জায়গা দিলো না?"

"ওর বর ছিলো প্রথম পক্ষের ছেলে। ওর শ্বাশুড়ি দ্বিতীয় পক্ষ। অন্য ছেলে মেয়েরা সব দ্বিতীয় পক্ষের। সৎ-মায়ের সঙ্গে ঝর্ণার বরের বনিবনাও ছিলোনা। ওর শ্বশুর তো বৌয়ের হাতের পুতুল।"

"ঝর্ণাকে পড়তে দিলে না কেন?" সবিতা জিজ্ঞেস করলো।

কমলেশ একটু গম্ভীর হোলো। এদের পরিবার একটু প্রাচীনপন্থী। বললো, "পড়ে কি করবে। আমাদের বাড়ির মেয়ে তো অফিসে চাকরি করতে যাবে না।"

"শুধু চাকরি করবার জন্যেই কি পড়াশুনো? না কি শুধু রোজগার করবার জন্যেই চাকরি," সবিতা উত্তর দিলো, "পড়াশুনো করলে কিছু না কিছু নিয়ে পড়ে থাকতে পারতো। আর চাকরির কথা বলছো, আজকাল কতো মেয়ে চাকরি করছে। কাজকর্ম করলে, নিজে স্বাধীনভাবে দু-পয়সা রোজগার করলে মনে একটা মর্যাদাবোধ গড়ে উঠতো, সংসারের খুঁটিনাটি ব্যাপারে তেতে ওঠার মতো এতখানি হীনমন্যতা থাকতো না।"

কমলেশ সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলো, "ওর পড়াশুনোয় মন নেই। ও পড়তে চাইলে আমি বাধা দিতাম না।"

সবিতা একটু ভাবলো, তারপর জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, ওর আবার বিয়ে দিলে না কেন?"

সবিতার কথা শুনে কমলেশ স্তম্ভিত হোলো। "হিন্দু ঘরের বিধবা, তার আবার বিয়ে! বলছো কি!"

এবার স্তম্ভিত হোলো সবিতা। অল্পবয়েসী বিধবার আবার বিয়ে দেওয়ার কথায় অবাক হয় আজকালকার দিনে, এরকম লোকও আছে নাকি? বললো, "কেন, বিধবার আবার বিয়ে হয়না?"

"তোমার মাথা খারাপ," উত্তর দিলো কমলেশ, "ও কথা মুখে উচ্চারণও কোরো না। আইনে যাই হোক, সমাজে হয় না। অন্তত আমাদের সমাজে নয়। ঝর্ণার কিসের অভাব যে, আমরা এ রকম কাজ করতে যাবো? লোকে যে ছি-ছি করবে, বলবে, বোনের খাওয়া-পরার ভার নিতে চায়না বলে আবার বিয়ে দিলো। তা-ছাড়া, ঝর্ণা বড়ো হয়েছে, বালবিধবা নয়, একজনের সঙ্গে সংসার করে আবার আরেকজনের সঙ্গে ঘর করতে পারবে কি করে? তার মন বলে কিছু নেই?"

সবিতা একটু হেসে বললো, "মন বলে কিছু আছে বলেই তো বলছি। সাত মাসের সংসার তার মনকে যে কিছু দিয়েছে বলে তো মনে হয়না। আর

দিলেই বা। ঝর্ণা মানুষ তো! নিজের মনকে জোর করে পাথর-চাপা দিয়ে রাখলে এখন যেরকম হচ্ছে সেরকম হবেই। পরে আরো ক্ষতি হতে পারে। শরীরের ধর্মকে তো আর মধ্যযুগের নীতির দোহাই দিয়ে অস্বীকার করা যায় না।''

''আমাদের মা-মাসী-পিসীরা যদি তাঁদের জীবন কাটিয়ে দিতে পেরে থাকেন,—''

তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে সবিতা বললো, ''থাক, থাক, ওদের কথা তুলে লাভ নেই। তাঁদের কালের সামাজিক অবস্থা আর আমাদের কালের অবস্থার মধ্যে অনেক তফাত। তোমরা পুরুষেরা কি বুঝবে? শুধু মেয়েরাই বোঝে। কিন্তু উপায় কি, তোমাদের রোজগারের উপর নির্ভর করতে হয় বলে সজ্ঞানে হোক, মনের অগোচরে হোক, তোমরা যা নীতির অনুশাসন বেঁধে দেবে, তাতে সায় দিয়ে হ্যাঁ-হ্যাঁ করে যেতে হবে। যাক, ওসব তর্ক কোরো না,— এসব কথা নিয়ে বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা তর্ক করে সিদ্ধান্তে এসে গেছেন, আমাদের তর্ক করা বৃথা। তবে হ্যাঁ, তোমার বিশ্বাস নিয়ে তুমি থাকো, আমার বিশ্বাস নিয়ে আমি থাকবো। আমি শুধু বলছি, ঝর্ণার আবার বিয়ে দিলে ভালো করতে। যা বলছি, সেটা বুঝবার চেষ্টা করো। তর্ক কোরো না। মেয়েদের মন যা অনেক কিছু বুঝতে পারে, তোমরা পারো না।''

কমলেশের ভালো লাগছিলো না এ আলোচনা। সে বললো, ''ঝর্ণাকে দেখে তো কোনোদিন মনে হয়নি যে সে আবার বিয়ে করতে চায়।''

''সে মুখ ফুটে বলতে যাবে কেন?''

''তার আবার বিয়ে দিতে চাইলে সে কি রাজী হোতো?''

''তোমরা কি একবারও বলে দেখেছো?''

''বললে সে রাজী হোতো না।''

''তুমি কি করে জানো? আর, রাজী না হলে কিছু বলার নেই। সে যদি এভাবেই জীবন কাটাতে চায়, সে স্বাধীনতা তার নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তোমাদের কর্তব্য ছিলো, একবার বলে দেখা।''

সেদিন এক রোববার বাপের বাড়ি গিয়েছিলো সবিতা। সেখানে কয়েকটা কথা কানে এলো। রাত্তিরে যখন ফিরে এলো তখন মন রাগে টগবগ করছে।

ঘরে ঢুকে দেখলো বেশ একটা থমথমে ভাব। সাবিত্রী গম্ভীর হয়ে বসে আছেন। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ঝর্ণা রাগে ফুলছে। কমলেশ গম্ভীর মুখে বারান্দায় পায়চারি করছে। পুলকেশ ম্লান মুখে বসে আছে এক কোণে।

সবিতাকে ঘরে ঢুকতে দেখে পুলকেশ উঠে পড়লো। বললো, "আমি একটু দ্বিজেনদের ওখানে ঘুরে আসি চট করে। আমার খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে দিও।"

কেউ কিছু বললো না। পুলকেশ বেরিয়ে গেল।

কমলেশ চলে গেল নিজের ঘরে।

ওর পেছন পেছন সবিতাও যাচ্ছিলো। আজ একটা ঝগড়া আছে ওর সঙ্গে। সারাটা পথ ভাবতে ভাবতে এসেছে, কমলেশকে কি বলবে।

"দাঁড়াও বৌ। তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

ঝর্ণার কথা শুনে সবিতা ফিরে দাঁড়ালো।

"থাক, ওসব আলোচনা করে কি হবে," বলে উঠলো সাবিত্রী।

"না, আমার যা বলবার বলে নিতে দাও।"

"কি বলছো, বলো," সবিতা বললো।

"আচ্ছা বৌ," গলায় যতোটা সম্ভব বিষ ঢালা যায়, ঢেলে বললো ঝর্ণা, "তুমি বিধবা হলে আবার বিয়ে করবে?"

"বালাই ষাট। কী বলছিস ঝর্ণা," ফ্যাকাসে মুখে বলে উঠলো সাবিত্রী।

"তুমি এখান থেকে যাও মা," বললো ঝর্ণা, "আমার কথার উত্তর দাও, বৌ।"

সবিতা দাঁড়িয়ে পড়লো স্তম্ভিত হয়ে। কমলেশ পরশু রাত্তিরের কথা-বার্তা সব বলে দিয়েছে এদের? তাদের নিভৃত আলোচনা অন্য কাউকে জানাতে মানা করে দেওয়ার পরও?

"চুপ করে আছো কেন বৌ? আমার কথার উত্তর দাও।"

উত্তর দিলো সবিতা। বললো, "যাই করি, কোনোদিন ভান করবো না কোনো রকম।"

"ভান কে করে শুনি? মা করেন, না আমি করি?"

সবিতা একবার ভাবলো কি হবে বাজে তর্ক করে, চলে যাই। কিন্তু পারলো না। গম্ভীর গলায় উত্তর দিলো, "মাকে নিয়ে কোনো নোংরা কথা তুমি বোলো না। সেটা আমি কি তোমার দাদা কেউই সহ্য করবো না। আর তোমার কথা আমি জোর গলায় কিছুই বলতে চাই না। তবে উপরতলার অঞ্জলি-দি যে ভরসা করে তোমায় একলা পরাশর-দার সঙ্গে থিয়েটারে পাঠাতে পারে না সে কথা আমি শুনেছি।"

"চুপ করো। পরাশর-দার নামে যা তা বলার কি অধিকার তোমার আছে? কি বলেছে অঞ্জলি-বৌদি? ডাকো তাকে, এক্ষুণি ডাকো, আমি সবার সামনে তাকে জিজ্ঞেস করবো—"

কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে ঘরের ভিতর থেকে কমলেশ বলে উঠলো, "কাউকে ডাকতে হবে না। তোদের কি লজ্জা শরম বলে কিছু নেই?"

"তুমি তো তোমার বৌয়ের পক্ষ নিয়ে কথা বলবেই," ক্ষেপে উঠলো ঝর্ণা, "লজ্জা শরম আমাদের নেই না বৌয়ের নেই? আমাকে নিয়ে এত কথা বলার সাহস ওর হয় কি করে? কেন, আমরা কি তোমার ঘাড়ে এত বড় বোঝা হয়ে উঠেছি যে তোমার বৌ তোমায় এসব পরামর্শ দেয়? বরং বলে দাও, আমরা সবাই বিদেয় হই এখান থেকে। তুমি আর তোমার বৌ এখানে নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে সুখে থাকো।"

"চুপ কর ঝর্ণা, চুপ কর," বললো ঝর্ণার মা সাবিত্রী।

"আমি কেন চুপ করতে যাবো। আমি কি দোষ করেছি যে আমায় চুপ করে থাকতে হবে। ওই দেখ না, যার চুপ করে থাকবার সে চুপ করে আছে। আমি একটুখানি ঠাট্টা করে রমলার কথা বলেছিলাম, উনি অমনি সাত পাঁচ বানিয়ে লাগিয়ে দিলেন দাদার কাছে। কই, নিজের খোকন-দা'র কথা তো এড়িয়ে গেল—"।

সাবিত্রী মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলো, "এই খোকন ছেলেটি কে, সবিতা?'

সবিতা উত্তর দেওয়ার আগে ঝর্ণা বলে উঠলো, "হবে ওর বাপের বাড়ির' পাড়ার কোনো বাউণ্ডুলে—।"

"চুপ করো," ধমকে উঠলো সবিতা, "অন্যের সম্বন্ধে ওরকম বলার কোনো অধিকার তোমার নেই।"

"কিন্তু সে কে সেকথা জানবার অধিকার তো আমাদের আছে," বললো ঝর্ণা।

"না, নেই।"

"নেই? আচ্ছা আমাদের না হয় নেই। দাদার তো আছে?"

"সে কথা তোমার দাদার সঙ্গে হবে—," বলে সবিতা আর দাঁড়ালো না, গটগট করে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো।

টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে একটি সিগারেট টানছিলো কমলেশ। সবিতা এসে টেবিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো।

কমলেশ একটু অস্বস্তি বোধ করলো। ছাইদানে সিগারেট ফেলে দিয়ে বললো, "তুমি ওদের কথায় কিছু মনে কোরো না সবিতা, ওরা সব কিছু ট্যারা চোখে দেখে।"

সবিতার কণ্ঠস্বর খুব শান্ত, কিন্তু কঠিন।

"ওদের কোনো দোষ নেই। কনফারেন্সে বসলে তো তোমার পেটে কোনো কথা থাকেনা, যা একেবারে আমাদের নিজেদের কথা, তাও বলে ফেলতে তোমার বাধে না। তোমায় আমি মানা করিনি? পুরুষ মানুষদের এসব চালাকি আমরা বুঝি না? মা-বোন-ভাইকে এমন ভাবে সব কথা সাজিয়ে বলবে যেন ওরা মনে করে বৌ বুঝিয়েছে। তোমরা সাধু পুরুষ, নির্বিকার, নিরপেক্ষ। যতো দোষ বৌয়ের, যতো প্যাঁচ বৌয়ের। তারপর ঝগড়া করুক বৌ, সবার কাছে বদনাম হোক বৌয়ের,—তোমরা বেচারারা আর কি করবে, সংসারের শান্তি বজায় রাখতে বৌকে নিয়ে আলাদা হয়ে যাবে। তোমার মতলব আমি খুব টের পেয়েছি।"

"এর মধ্যে তুমি আমার মতলব কি দেখলে?"

"ঝর্ণার আবার বিয়ে দেওয়ার কথাটা যে আমি তোমায় বলেছি একথা বলার কি দরকার ছিলো? তুমি চেয়েছিলে যে এই উপলক্ষে আমার সঙ্গে তোমার মা-বোনের ঝগড়া হোক।"

"আমি তো মিছে কথা বলিনি।"

"কোনো অন্যায় উদ্দেশ্য নিয়ে সত্যি কথা বলা মিথ্যে বলার চাইতেও বড়ো পাপ।"

"থামো, থামো," অধৈর্য হয়ে বলে উঠলো কমলেশ, "তোমাদের এসব মেয়েলী ঝগড়া আমার আর ভালো লাগছে না। দিনরাত এই শুনতে থাকলে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে।"

"থামো বললেই থামা যায় না," বললো সবিতা, "আজ তোমার সঙ্গে আমার অন্য কথা আছে।"

"কি কথা?"

"আজ মায়ের কাছে একটা কথা শুনলাম। কয়েকদিন আগে তুমি যখন আমার বাপের বাড়ি গিয়েছিলে, আমার মায়ের কাছে জিজ্ঞেস করেছিলে আমাদের পাড়ায় খোকন বলে কেউ আছে কিনা।"

হেসে কথাটা উড়িয়ে দিতে চাইলো কমলেশ। "হোঃ হো, এই কথা? আরে, আমার একটু দেখবার ইচ্ছে হয়েছিলো তোমার ছেলেবেলার বন্ধুটি কে। তোমায় না জানিয়ে তাকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে এনে তোমায় অবাক করে দিতাম, হাঃ হাঃ হা।"

"আমায় অবাক করে দিতে—ন্যাকা! ও পাড়ার বিজয় পুলকেশের বন্ধু, তার কাছেও পুলকেশ খোঁজ নিয়েছে, সে খবরও আমি পেয়েছি। সেও কি আমায় অবাক করে দিতে?"

"আরে, তুমি এত রাগ করছো কেন, সবিতা? তুমি ঠাট্টা করে আমায় একটা কথা বানিয়ে বলেছিলে, আমি খবর নিতে গিয়ে যে বোকা বনে গেলাম, এত তোমার ঘর ফাটিয়ে হাসা উচিত। আমি তো নিশ্চিন্ত হয়েছি এ কথা শুনে যে, ওপাড়ায় খোকন বলে কেউ নেই।"

"ভুল শুনেছো," গম্ভীর গলায় উত্তর দিলো সবিতা, "কলকাতা শহরে এমন কোনো পাড়া নেই যেখানে খোকন বলে কেউ না কেউ থাকে না। কিন্তু তুমি আমার মাকে জিজ্ঞেস করতে গেলে কি বলে? পুলকেশ বিজয়কে জিজ্ঞেস করতে গেল কোন মুখে? আমায় এরকম অপমান করতে পারলে তোমরা? জিজ্ঞেস যা করবার আমাকে জিজ্ঞেস করো।" একটু থেমে সবিতা বললো, "আর আমার মুখে যা শুনবে, তাতে আর অতো নিশ্চিন্ত হতে পারবে না, প্রাণে ধরে কাউকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে খাওয়ানোর কথাও ভাবতে পারবে না।"

"সত্যি বলছো?" এবার একটু গম্ভীর হয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করলো কমলেশ।

"হ্যাঁ, সত্যি বলছি। তুমি আমার স্বামী, তোমার কাছে সত্যি কথা বলা আমার কর্তব্য," সবিতা খুব দৃপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিলো।

কমলেশ টেবিলের উপর থেকে পা নামিয়ে সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞেস করলো, "কে এই খোকন-দা?"

"তার আগে আমায় বলো, কে তোমাদের ওই রমলা।"

কমলেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো সবিতার দিকে। তারপর বললো, "শুনতে চাও?"

"হ্যাঁ শুনতে চাইবো না কেন?"

"রমলা আর আমি একই ওস্তাদের কাছে একই সঙ্গে সেতার শিখেছি।"

"সে তো আমি জানি।"

"এক সময় আমার একটা মোহ জেগেছিলো রমলার জন্যে। তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। ওদের আপত্তি হোতো না। কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম সেটা সম্ভব নয়।'''

"কেন?"

"রমলার মা ছিলেন সেকালের থিয়েটারের অভিনেত্রী।" তাদের সামাজিক স্তরটা কোন পর্যায়ের বুঝতেই পারছো। রমলার কোনো পিতৃ-

পরিচয় নেই। ওখানে বিয়ে করে মায়ের মনে আঘাত দেওয়া এবং আমাদের বংশের মাথা হেট করানো আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। ওকে বিয়ে করলে মা-বোন-ভাইকে ছাড়তে হোতো। ওরা কিছুতেই আমার সঙ্গে থাকতো না।"

সবিতা ঠোঁট বেঁকিয়ে একটু হাসলো।

কমলেশ লক্ষ্য করলো সবিতার হাসি। বললো "দেখ, আমার মনে যেটা ছিলো, সেটা একটা মোহ। ওকে যদি সত্যি সত্যি ভালোবাসতাম, তাহলে নিশ্চয়ই তার জন্যে সব কিছু ছাড়তে পারতাম। আমি যে পারিনি, সেটাই সব চেয়ে বড়ো প্রমাণ যে, তার সঙ্গে আমার এমন কিছু গভীর সম্পর্ক ছিলো না।"

সবিতা হেসে ফেললো।

"আমায় বিশ্বাস করো সবিতা, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আজ আর অন্য কোনো মেয়ের সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র মোহ থাকাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সত্যি বিশ্বাস করো, সেজন্যে এখন আমি খুব সহজ ভাবেই রমলার সঙ্গে মিশতে পারি, আমার কিছু মনেই হয় না।"

"ব্যস? এইটুকু?"

"হ্যাঁ, আমায় বিশ্বাস করো সবিতা, আমি তোমায় ভীষণ ভালোবাসি। আর সেই জন্যেই আমার এত কৌতুহল তোমার ওই খোকন-দার সম্বন্ধে, ওর প্রতি আমার ভীষণ হিংসে,—কে সে, যার সঙ্গে বিয়ের আগে তোমার ভাব ছিলো? তোমার জীবনে কেউ যে ক্ষণিকের জন্যেও ছায়াপাত করে ছিলো, সেটা আমি সহ্য করতে রাজী নই। তুমি আমার, তুমি চিরকালের জন্যে আমার, তুমি জন্ম-জন্মান্তরের জন্যে আমার।"

সবিতা হাসলো। বললো, "থামো বাপু, এসব মেলোড্রামা আমার ভালো লাগে না। আমি তোমার স্ত্রী, এর চাইতে বেশী আমি কিছু নই, এর চাইতে কমও কিছু নই। ব্যস, এর বেশী আমি কিছু বুঝি না। যেটুকু বুঝি, তা নিয়ে আমি সুখে মরতে চাই।"

সবিতা ভেবেছিলো হয়তো এখানেই আলোচনার সমাপ্তি হবে, কিন্তু কমলেশ ছাড়লো না। বললো, "সবিতা, আজ যখন সব কথা উঠলো, তখন সব কথা পরিষ্কার করে নিতে হবে। আমায় বলো, কে তোমার ওই খোকন-দা?"

"শুনে কি করবে? মিছি মিছি মনে কষ্ট পাবে," মৃদু কণ্ঠে বললো সবিতা।

"কষ্ট? না সবিতা, তোমার মুখে শুনলে কোনো কষ্ট পাবো না। কষ্ট পেয়েছিলাম ঝর্ণার মুখে শুনে। ওকে বলার আগে তুমি আমায় কেন বলোনি?"

সবিতা চুপ করে বসেছিলো।

"বলো, সবিতা।"

"কি বলবো?"

"কে ওই খোকোন-দা।"

একটু চুপ করে থেকে সবিতা বললো, "খোকোন ওর ডাক নাম।"

"ওর আসল নাম কি?"

"বিদ্যুত।"

কমলেশ সবিতার হাত চেপে ধরলো, "আমার কাছে কিছুই গোপন কোরো না সবিতা।"

"অন্তত তোমার কাছে আমি কিছুই গোপন করবো না।"

সবিতা সবই খুলে বললো। কিছুই লুকোলো না।

শুনে অনেকক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে রইলো কমলেশ। কোনো কথা বললো না।

থমথমে ভাবটা কাটলো না। সবাই যে যার মতো চুপচাপ খাওয়া দাওয়া সেরে নিলো।

সবিতা যখন শুতে এলো কমলেশ তখন ঘরের ভিতর পায়চারি করছে।

সবিতাকে দেখে কমলেশ ফিরে দাঁড়ালো। বললো, "সবিতা, তুমি সত্যি বলছো, তোমার মা তোমায় বলেছিলেন বিদ্যুতের বাবা যদি তোমার সঙ্গে বিদ্যুতের বিয়ে দিতে রাজী হতেন তাহলে তোমার বাবাকে বলে রাজী করাতেন?"

সবিতা ঘাড় নাড়লো।

"তুমি সত্যি সত্যি বিদ্যুতের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে?"

"হ্যাঁ," উত্তর দিলো সবিতা।

"শুধু লেকে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালে, গঙ্গার ধারে,—আর কোথাও নয়?"

"সিনেমায় গেছি। রেস্তরাঁয় বসে চা খেয়েছি।"

"কোনোদিন হোটেলে টোটেলে যাওনি তো?"

এতক্ষণে সবিতা বুঝলো কমলেশের চিন্তাধারা কোন খাতে বইছে। তার সমস্ত শরীর ঘিনঘিন করে উঠলো। তবু মুখের প্রশান্ত ভাব বজায় রেখে দৃপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিলো, "না।" একটু থেমে বললো, "আমরা দুজন দুজনকে খুব শ্রদ্ধা করতাম।"

সবিতার মনের ভাব কমলেশ বুঝতে পারলো না। একটু অধীর হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "বিদ্যুত তোমায় বিয়ে করতে রাজী হলে তুমি ওকে বিয়ে করতে?"

"নিশ্চয়ই করতাম। কেউ রুখতে পারতো না।"

কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলো কমলেশ। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, ওর কথা আজকাল তোমার মনে পড়ে?"

সবিতার রাগ হোলো। বললো, "তোমরা ভাইবোনে মিলে যদি এভাবে আমায় প্রত্যেকদিন মনে করিয়ে দিতে সুরু করো, কি করে ভুলবো বলো।"

কমলেশ হেসে ফেললো। একটু হাল্কা হবার চেষ্টা করে বললো, "যাক গে। ছাড়ো ওসব পুরোনো কথা। নতুন কথা বলো।"

"কি বলবো।"

"তুমি আমায় কোনোদিন বলোনি তুমি আমায় ভালোবাসো। আজ একথা তোমার মুখে শুনতে চাই।"

সবিতা একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো। তারপর বললো, "দেখ, আমি তোমার স্ত্রী, ওসব ভাবপ্রবণ কথাবার্তা আমার মুখে খুব ন্যাকামো মনে হবে। আমার আচরণ ব্যবহার থেকে তোমার যা মনে হবে, সেটাই সত্যি। মুখে বলে কি হবে, অতো বড়ো কথাটাকে খেলো করে লাভ কি?"

কমলেশ একটু তাকিয়ে দেখলো সবিতাকে। হেসে বললো, "তোমার বন্ধু বিদ্যুতকে আমি একবার দেখতে চাই। ওকে একদিন খেতে ডাকো না আমাদের বাড়ি।"

"না। আমি আর ওকে কোনোদিন দেখতে চাই না।"

কমলেশ আবার গুম হয়ে গেল।

বাড়ির থমথমে ভাব আর কাটে না কিছুতেই।

দুদিন কেটে গেল, তিনদিন কেটে গেল, চারদিন কেটে গেল। কেউ কারো সঙ্গে খুব প্রয়োজনীয় কথাবার্তা ছাড়া আর কোনো কথা বলে না। যে যার নিজের কাজ করে যায় চুপচাপ।

কমলেশও বেশী কথা বলে না সবিতার সঙ্গে। অফিস থেকে ফিরে চান করে চা-জলখাবার খেয়ে ইংরেজী ডিটেক্টিভ উপন্যাস পড়তে বসে। খাওয়া দাওয়ার পরও পড়তে থাকে অনেকক্ষণ। তারপর আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে।

সবিতার মনেও কোনো অভিযোগ নেই। সে ভাবে,—যে যা ভাববে ভাবুক, আমি আমার কর্তব্য করে যাবো।

সাবিত্রী কমলেশের ঘরে আসতো না বড়ো একটা, প্রয়োজন হলে কমলেশকে ডাকিয়ে নিতো নিজের ঘরে।

সেদিন ছিলো কোনো একটা ছুটির দিন। সকাল থেকে আকাশ মেঘলা। কমলেশ চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছিলো। সবিতা একটু সকাল করে চান করতে গেছে।

সাবিত্রী ঘরে ঢুকে খাটের উপর একপাশে বসলো। কমলেশ মুখ তুলে তাকালো মায়ের দিকে। আজ মা হঠাৎ তার ঘরে এসেছে দেখে সে একটু অবাক হোলো।

সাবিত্রী আস্তে আস্তে বললো, "দ্যাখ বাবা, এসব আমার ভালো লাগে না। ঝগড়া বিবাদ সব সংসারেই হয়। তাই বলে দিনের পর দিন কেউ মন ভার করে গুম হয়ে থাকে নাকি?"

কমলেশ কোনো উত্তর না দিয়ে সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করলো।

সাবিত্রী বলে গেল, "এখন থেকে ওর জন্যে একটু বেশী যত্ন নিতে হবে। এমন কোনো ব্যবহার করা উচিত নয় যাতে ওর মন খারাপ হয়।"

মায়ের কথার ধরণ শুনে কমলেশ মুখ তুলে তাকালো, তারপর বললো, "আমাদের কোনো কথায় তোমার থাকা ঠিক নয় মা।"

সাবিত্রী একটু হেসে উত্তর দিলো, "তোদের কথায় আমি থাকতে যাবো কেন? আমি তোকে শুধু বলতে এলাম যে, বৌকে একবার ডাক্তার দেখাতে হবে।"

কমলেশ দেখলো সাবিত্রীর খুব হাসি হাসি মুখ। সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কেন, মা?"

সাবিত্রী জানালো, সবিতা সন্তানসম্ভবা।

কথাটা শুনে মায়ের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো কমলেশ। আস্তে আস্তে ঝলমল করে উঠলো তার মুখখানি।

সাবিত্রী কখন উঠে চলে গেছে কমলেশের খেয়াল নেই। সে খুব অধৈর্য হয়ে সবিতার প্রতীক্ষা করছিলো।

তার সন্তান আসছে! ভাবতেই একটা অনির্বচনীয় অনুভূতিতে তার মন ভরে গেল। তার সন্তান! সবিতারও! তাদের দুজনার সন্তান! সবিতার

জন্যে একটা নতুন ধরণের অন্তরঙ্গতা অনুভব করলো সে। এই কদিনের মনের মেঘ এক নিমিষে কেটে গেল, কখন কেটে গেল তার খেয়ালই নেই।

চান সেরে সবিতা ঘরে ঢুকলো। তাকিয়ে দেখলো কমলেশ। মাথায় অবগুণ্ঠন নেই, আলুলায়িত কুন্তলদাম ছড়িয়ে পড়েছে পিঠের উপর। সাবানের হাল্কা মিষ্টি গন্ধে ঘর ভরে গেছে।

. সবিতা দেখলো কমলেশ তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে বুঝতে পারলো। চোখ নামিয়ে মাথার উপর ঘোমটা তুলে দিলো।

"শোনো, এদিকে এসো।"

সবিতা কাছে এসে দাঁড়ালো।

"বোসো আমার কাছে।"

সবিতা বসলো।

কমলেশ বললো, "তুমি আগে আমায় না বলে মাকে বললে?"

"মাকেই আগে বলতে হয়," একটু হেসে সবিতা উত্তর দিলো।

এই সংসারের দৈনন্দিন জীবন আবার আগের মতো সহজ হয়ে গেল সেদিন থেকে।

— ছয় —

জীবন রুটিন-বাঁধা হয়ে গেলে মাসের পর মাস যে কি ভাবে কেটে যায় খেয়াল থাকে না। পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে শ্যামলী চাকরিতে ঢুকেছে অনেক দিন। বিদ্যুত যেখানে প্রথম চাকরিতে ঢুকিয়েছিলো, সে-অফিস ছেড়ে দিয়ে সে এখন অন্য জায়গায় চাকরি করছে। এখানকার খবরও বিদ্যুত দিয়েছিলো, তদ্বিরও করেছিলো সে-ই। মাঝে মাঝে শ্যামলীর বাড়ি আসতো। শ্যামলী তাকে কয়েকবার নিজে রেঁধে খাইয়েছেও। শ্যামলীর বাবা অবিনাশ ভটচায বিদ্যুতের এবাড়ি আসা প্রথম প্রথম ভালো চোখে দেখেনি। শ্যামলীর চাকরি করতে যাওয়া নিয়েও আপত্তি জানিয়ে ছিলো প্রথম দিকে আর দশজন সেকেলে মধ্যবিত্তের মতো। বলেছিলো,—কেন, আমি কি মরে গেছি, আমি কি রোজগার করি না? আমি কি আমার মেয়েকে দুবেলা দুটো শাক-ভাত খাওয়াতে পারি না? বলো কি গো, ভটচায-বাড়ির মেয়ে যাবে অফিসে চাকরি করতে?—কিন্তু আজকালকার আর দশজন মধ্যবিত্তের মতো অবিনাশ বাবুকে মেনেও নিতে হয়েছিলো। ঘোড়দৌড়বাজ স্বল্প-পসার হোমিওপ্যাথের রোজগারে সংসার ভালো ভাবে চর্লে না, সেখানে মেয়ের কেরানীগিরির রোজগারের দাম অনেক। বিদ্যুতের স্বল্প যাতায়াতে বিরক্তি প্রকাশ করলেও আপত্তি করতে পারলো না, কারণ চাকরির ব্যবস্থা তারই করে দেওয়া। সে অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে জেনে আপত্তি ক্রমে মৃদু হয়ে এলো, তারপর দু-চারবার শনিবারের আগে সময়মতো টাকা ধার পেয়ে বিদ্যুতের সম্বন্ধে ধারণারও উন্নতি হোলো। তবে মাঝে মাঝে শ্যামলীর মাকে সাবধান করে দিতো,—দেখো গিন্নি, মেয়ে যেন আবার লভ-টভ না করে বসে, আজকালকার মেয়ে তো, কিছুই বলা যায় না। বিদ্যুত বামুন হলে কিছু বলার ছিলো না, কায়েতের সঙ্গে ওসব ফষ্টি-নষ্টি আমাদের পরিবারে চলবে না।

বিদ্যুতের জন্যে একটা স্নেহ গড়ে উঠেছিলো শ্যামলীর মায়ের মনে। ভাবতো,—শ্যামলীর জন্যে ওর মতো ছেলে বামুনের ঘরে পাবে কি করে? —বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকের শেষদিকের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির চাপে ব্রাহ্মণ-গৃহিণীর মন অত্যন্ত জর্জরিত এবং উত্যক্ত। সমাজ ব্যবস্থার অবক্ষয় সম্বন্ধে মন সচেতন না হলেও নগর-নারীর মনের বিদ্রোহবৃত্তি পুরুষের চাইতে বেশী। সেটা মুখে প্রকাশ না পেলেও চাপা আগুনের মতো জ্বলতে থাকে

মনের ভিতর। একদিন বলে ফেললো,—কিসের ছাই জাত! জাত নিয়ে ধুয়ে খাবে? সব কিছুর উপরে মেয়ের সুখ বড়ো।

অবিনাশ ভটচায সুরু করলো দার্শনিক তর্ক।—সুখ কাকে বলে, গিন্নি? বস্তুতন্ত্রবাদী যেই পাশ্চাত্য সভ্যতা ইন্দ্রিয়ের সুখের পেছনে ছুটে মরছে, ডিমক্র্যাসি, সোসিয়্যাজ্‌ম্‌এর গালভরা বুলি ছাড়ছে, ওরাই কি আমাদের আদর্শ? আমাদের আদর্শ স্থির করে দিয়েছেন আমাদের প্রাচীন কালের মুনিঋষিরা, তাঁদের রচিত শাস্ত্রে এবং সমাজের বিধানে সত্যিকারের সুখের সন্ধান দিয়ে গেছেন। ভালো খাওয়া পরাতেই সুখ? আমি তো কোনো দিন তোমাকে স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে রাখতে পারিনি, তাই বলে কি আমি তোমায় সুখ দিতে পারিনি? তুমিই বলো।"

ভটচায-গিন্নি ভাবলো,—সত্যি কথা বললে তো এখন প্রলয়কাণ্ড হবে। --সমাজের আর দশজন বাধ্য গৃহিণীর মতো বললো, "না, না, তা তো বটেই। তবে কিনা, আজকাল তো--"

বাধা দিয়ে অবিনাশ ভটচায বললো, "আজকালের কথা ছাড়ো। সমাজ আজকাল উচ্ছন্নে যেতে বসেছে বলে কি আমাদেরও সেই পথে যেতে হবে নাকি? ওসব স্বপ্ন দেখা ছেড়ে দাও।"

"স্বপ্ন আমি দেখিনা," উত্তর দিলো ভটচায-গিন্নি, "বিদ্যুতের মতো ছেলের জন্যে মেয়ের অভাব কি? ওদের কায়েতদের মধ্যে তো আছেই, অনেক বামুন-বদ্যির ঘরেও আছে যারা ওরকম ছেলে পেলে জাত দেখবে না। সবাই তো আমাদের মতো এত হতভাগা নয়।"

অবিনাশ ভটচায ক্ষেপে গেল, কিন্তু শ্যামলীর মা সেখানে দাঁড়ালো না। চলে যেতে যেতে ভাবলো,—সত্যি, পুরুষেরা এত ভণ্ড হয়।

এই আলোচনার বিন্দুবিসর্গও শুনতে পেলে শ্যামলী আকাশ থেকে পড়তো। বিদ্যুতের সঙ্গে একটা সহজ বন্ধুত্ব ছাড়া অন্য কোনো রকম সম্পর্কের সম্ভাবনা তার পক্ষে ভাবাই সম্ভবপর ছিলো না। সংসারে অর্থসাহায্য করে মায়ের দৈনন্দিন দুর্ভাবনার ভার একটু হাল্কা করা এবং ছোটো ভাইবোনেদের লেখা-পড়া শিখিয়ে মানুষ করা, এবং বি-এ পরীক্ষা প্রাইভেটে দিয়ে নিজের রোজগার একটু বাড়ানোর চেষ্টা করা,—এ সব ছাড়া আর কোনো ভাবনার অবকাশ তার জীবনে ছিলো না। বন্ধুবান্ধবদের বিয়ের খবর শুনলে এবং কাছাকাছি কোনো বাড়িতে শানাই বাজলে তার মন একটু উদাস হয়ে যেতো বটে, কিন্তু সে

অল্পক্ষণের জন্যে। আর দশজন সাধারণ মেয়ের মতো তার মনে কামনা-বাসনা নিশ্চয়ই ছিলো, কিন্তু তা নিয়ে কোনো স্বপ্ন-বিলাস ছিলো না। নিষ্করুণ নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের রূঢ় বাস্তবতার মধ্যে সে বড়ো হয়েছে, জীবনের সত্যিকারের রূপ সম্বন্ধে তার কোনো গোলাপী ধারণা নেই। তার অন্তরঙ্গ বন্ধু সবিতার প্রিয়তমকে সে সহজভাবে নিজের বন্ধুর মতোই গ্রহণ করেছিলো। ভালো বন্ধু জীবনে কজনই বা জোটে! শ্যামলীকে চাকরি খুঁজ করে দিয়ে বিদ্যুত সত্যিকারের বন্ধুর কাজ করেছিলো, তার জন্যে ওর প্রতি শ্যামলী একটা সহজ কৃতজ্ঞতাবোধ ছিলো, তার বেশী কিছু নয়।

শ্যামলী জানতো, সবিতাকে বিদ্যুত কোনোদিনই ভুলতে পারবে না। সবিতার জন্যে সে প্রয়োজনের সময় মনের জোর দেখাতে পারেনি বটে, কিন্তু তার ভালোবাসা তো ফুরিয়ে যাওয়ার নয়। সবিতার বিয়ে হয়ে গেছে অনেক দিন, ওর ছেলে হয়েছে একটি, এর মধ্যে বিদ্যুতের বাবা মারা গেছে, তারপর বিদ্যুত এম-এ'তে ফার্স্টক্লাস নিয়ে প্রফেসারি সুরু করেছে সম্প্রতি,—কিন্তু ওর মুখ দেখে মনে হয় সে সবিতাকে এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারে না। শ্যামলী জানতো, বিদ্যুতের জন্যে ভালো ভালো বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে, কিন্তু বিদ্যুত সবই প্রত্যাখ্যান করেছে। ছেলের চোখের চাউনি থেকে মেয়েরা ওদের মনের খবর পায়। শ্যামলী কোনোদিনই বিদ্যুতের চোখে প্রণয়-বুভুক্ষার লেশমাত্রও দেখেনি। মুখের হাসি খুব সহজ, কিন্তু চোখ দুটি সব সময় বিষণ্ণ। ওর সঙ্গে শ্যামলী ঘোরাফেরা করে মাঝে মাঝে, লক্ষ্য করেছে যে পথে কোনো অল্পবয়েসী মেয়ের উপর চোখ পড়লেই সে দীর্ঘনিশ্বাস চাপবার চেষ্টা করে, কোথাও কোনো ছেলের সঙ্গে কোনো মেয়েকে দেখলে তার চোখ দুটি একটু ছলছল করে উঠে। শ্যামলীর জন্যে তার যে এত স্নেহ, এ যে শুধু সে সবিতার বন্ধু বলে, সে কথা শ্যামলী বুঝতো। তাই বিদ্যুতকে সে খুব শ্রদ্ধা করতো। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো এই ব্যথা বিদ্যুতকে এক মহত্তর জীবনের সন্ধান দেবে।

দুজন দুজনকে বুঝতে পারতো খুব ভালো করে, তাই দুজন দুজনের সঙ্গে মিশতেও পারতো খুব সহজ ভাবে। সে প্রাইভেটে বি-এ দেওয়ার জন্যে তৈরী হচ্ছে বলে বিদ্যুত তার পড়াশুনোয় সাহায্য করতো, মাসের শেষ দিকে টান পড়লে শ্যামলী অকুণ্ঠভাবে টাকা ধার নিতো তার কাছ থেকে, মাইনে পেলে সহজ ভাবে ফিরিয়ে দিতো। কখনো কখনো ভালো ছবি এলে একজন আরেকজনকে সিনেমা দেখাতো, তারপর গল্প করতো কোথাও বসে। বেশীর ভাগ সময়ই বিদ্যুত তার কাছে নিজের ভবিষ্যত কর্মপ্রণালীর বর্ণনা করতো,

তার রিসার্চের বিষয়, তার বিদেশে পড়তে যাওয়ার ইচ্ছে, এই সব। ইতিহাসের নানা রকম গল্প শোনাতো, সাম্প্রতিক কালের রাজনীতি এটা ওটা সেটা আলোচনা করতো, নানা রকম বই পড়তে দিতো তাকে। আস্তে আস্তে শ্যামলীর বই পড়ার নেশা ধরে গেল, সন্ধান পেয়ে গেল এক নতুন বুদ্ধিতান্ত্রিক জগতের।

বিদ্যুতের একটা কথা তার মনে গেঁথে গিয়েছিলো।—বিদ্যুত তাকে একদিন বলেছিলো, এভাবে সারাদিন অফিসের অন্ধকূপে পড়ে থেকে আর সংসারের অভাবের গোলকধাঁধায় ঘুনে মরে তো সারা জীবন কাটালে চলবে না, এর মধ্যে থেকে বেরোবার পথ খুঁজতে হবে।

বছর দু-বছরের মধ্যে তো হবে না, সময় লাগবে। শ্যামলী জানতো সে কথা।

শ্যামলীর মা বোধহয় কোনো এক সময় বিদ্যুতকে বলেছিলো, "তোমার তো অনেক জানাশোনা, বামুনের ঘরের ভালো ছেলের সন্ধান পেলে দিয়ো। ওঁকে বলে বলে হয়রাণ হয়ে গেলাম। উনি তেমন খোঁজও করেন না, সম্বন্ধ দু-একটা যা আসে, সেখানে আমি প্রাণে ধরে আমার মেয়েকে দিতে পারবো না। কিন্তু ভালো ছেলে পাওয়ার মতো সঙ্গতিও বা আমার কোথায়?"

"বিয়ে দেবেন ওর?" বিদ্যুত একটু আনমনা হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

"কদ্দিন আর আইবুড়ো থাকবে। বিয়ে একদিন না একদিন তো দিতেই হবে—।"

মাস দুয়েক পরে বিদ্যুত একদিন একটি ভালো ছেলের খবর নিয়ে এলো। ছেলে ভাটপাড়ার বাঁড়ুজ্যে, গ্র্যাজুয়েট, স্থায়ী সরকারী চাকরিতে আছে। দাবীদাওয়া কিছু নেই।

"খরচা পত্তরের জন্যে কিছু ভাববেন না মাসীমা," বিদ্যুত বললো, "শ্যামলীর অফিসে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে টাকা ধার নেওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে। আর খাট আলমারি আসবাবপত্তর যা লাগে সেগুলো আমি করিয়ে দেবো।"

"তুমি কেন এত করতে যাবে বাবা?"

বিদ্যুত একটু হেসে বললো, "আপনি তো জানেন মাসীমা, আমার এরকম কোনো আপনজন নেই যার জন্যে শুধু স্নেহের দাবীতে এটুকু করতে পারি। আপনাকে বলতে কোনো বাধা নেই, শ্যামলীর এক বন্ধুকে আমি বিয়ে করবো ভেবেছিলাম। সেটা শেষ পর্য্যন্ত আর হয়ে উঠে নি। আমার খুব কষ্টের সময়

শ্যামলী আমার সঙ্গে ছিলো। এই বন্ধুত্ব আমি কোনোদিন ভুলবো না। ওর জন্যে যা কিছু করা আমার সাধ্যে কুলোয় আমি কোনোদিন করতে পেছপা হবো না।"

শ্যামলীর মা কি বুঝলো কে জানে, খুব নিবিড় স্নেহের দৃষ্টি দিয়ে তাকালো বিদ্যুতের দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "তুমি বিয়ে করবে না বাবা ?"

বিদ্যুতের মুখ বেদনামলিন হোলো মুহূর্তের জন্যে। তারপর সেভাব কাটিয়ে উত্তর দিলো, "করবো না সেকথা জোর গলায় বলি কি করে ? চিরকাল ব্রহ্মচারী থাকবো একজনকে বিয়ে করতে পারিনি বলে, একথা সগর্বে ঘোষণা করা বড্ড নাটুকে শোনাবে। তবে উপস্থিত বিয়ের কথা ভাবতেও ইচ্ছে করে না। আমি বিলেত যাবো ভাবছি।"

শ্যামলীর বাবা অবিনাশবাবু এসে পড়লো ঠিক সে সময়। সেদিন শুক্রবারের বিকেল। তাঁর হাতে একটি রেসের বই। এসেই জিজ্ঞেস করলো, "শ্যামলী কোথায়। ওর কাছে পাঁচটা টাকা থাকে তো দিতে বলো। কাল ওকে সাড়ে সাত টাকা ফিরিয়ে দেবো।"

"বোসো, কথা আছে," বললো শ্যামলীর মা।

শ্যামলীর বিয়ের সম্বন্ধের খবরটা শুনে অবিনাশবাবু খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলো, ছেলের সংসারে কে কে আছে, ছোটো ভাই আছে কিনা, বাবার রোজগার কতো, বিধবা বোন কি পিসী আছে কিনা, আইবুড়ো বোন আছে কিনা, ছোটো ভায়েদের খরচা দেয় কে, এই সব। শুনেটুনে বললো, "না, বিদ্যুত, এই সম্বন্ধ আমার পছন্দ হচ্ছে না। তুমি বরং এমন একটি ছেলে দেখ যার সংসারে কেউ নেই, যে মোটামুটি ভালো রোজগার করে, একলা থাকে। যদি চায় তো, সে আমার সঙ্গে এসে থাকতে পারে, কিংবা আমরা ওর সঙ্গে গিয়ে থাকতে পারি। তোমার মাসীমা শ্যামলীকে চোখের আড়াল করতে পারবে না।"

"খুব পারবো," বললো শ্যামলীর মা, "বিদ্যুত যে ছেলের খোঁজ এনেছে, আমার তো শুনে খুব ভালো মনে হচ্ছে।"

"ওদের সংসার খুব বড়ো। চার পাঁচজনের ভরণপোষণ ওই ছেলেকে করতে হয়।"

"তাতে কি ? শ্যামলীও তো রোজগার করছে।"

"তোমার মাথা খারাপ ? আমার মেয়েকে আমি খাইয়ে পরিয়ে বড়ো করলাম, আর তার রোজগার যাবে অন্য লোকের পেছনে ?"

বিদ্যুত একটু হাসলো।

শ্যামলীর মা বলে উঠলো, "ওমা, এরই মধ্যে মেয়ের রোজগারের জন্যে তোমার এত দরদ? তুমিই না কতো আপত্তি জানিয়েছিলে ওর চাকরি করতে যাওয়ার সময়?"

"আপত্তি আমার আজও আছে। কিন্তু রোজগার যখন করছেই সে রোজগার অন্যের ভোগে যাবে কেন?"

"আপত্তি তোমার আজও আছে!" ব্যঙ্গ করে বললো শ্যামলীর মা, "রেস খেলবার জন্যে শ্যামলীর কাছ্ থেকে টাকা নিতে তো তোমার বাধে না।"

"আরে, সেকথা নিয়ে তুমি অতো সেন্টিমেণ্ট্যাল কেন? শ্যামলীর রোজগার তো আমারই রোজগার। তেমনি আমার রোজগারটাই বা কার জন্যে? ওর জন্যে নয়?" বলতে বলতে সরে পড়লো অবিনাশবাবু।

শ্যামলী পাশের ঘর থেকে সবই শুনতে পেয়েছিলো। পরে এক সময় বিদ্যুতকে বললো, "দোহাই আপনার, আমার বিয়ের জন্যে মাথা ঘামাবেন না। বাবা এখন আমার বিয়ে দেবেন না, মুখে যাই বলুন। মাস গেলে কিছু টাকা ঘরে আনছি তো! তাছাড়া আমার বিয়ে করা এখন উচিতও নয়। মা আছে, ছোটো ভাইবোনেরা আছে, এদের দেখবে কে? বাবাকে তো চেনেন। আমি চাকরি করতে যাওয়ার আগে আমাদের যে কী কষ্টে দিন গেছে, ভগবান জানেন।"

"বুঝছি তো সবই," বিদ্যুত বললো, "তাই বলে আপনি সারাজীবন এমনি করে কাটাবেন?"

"সারাজীবনের কথা তো হচ্ছে না। আগামী কয়েক বছর, যদ্দিন অন্তত একটি ভাই মানুষ না হচ্ছে।"

"তারপর যে বুড়ী হয়ে যাবেন," বিদ্যুত হাসতে হাসতে বললো।"

"তখন একটা বুড়ো যোগাড় করে নেবো," শ্যামলী দীর্ঘনিশ্বাস চেপে হাসতে হাসতে বললো।

শ্যামলী প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়ে বি-এ পাশ করলো। আশ্চর্য ব্যাপার, ডিস্‌টিংশানও পেলো।

বিদ্যুত বললো, "এবার আপনি আস্তে আস্তে এম-এর জন্যে তৈরী হন্। ইতিহাস নিয়ে দিন। আমি তো আছি। যদি ভালো সেকেণ্ড ক্লাসও পান চেষ্টা চরিত্র করে একটা প্রফেসারি যোগাড় করে দেওয়া যাবে। তাহলে কেরিয়ার একেবারে অন্যরকম হয়ে যাবে।

শ্যামলী হেসে বললো, "সে তো এখনো আরো দু বছরের ধাক্কা। দেখা যাক।"

একদিন হঠাৎ বাণী এসে উপস্থিত। ওর সঙ্গে আজকাল দেখাই হয় না বড়ো একটা। কলেজ ছাড়লে কিই বা আর যোগাযোগ থাকে কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে!

বাণী এসেই বললে, "শুনলাম তুই ডিস্‌টিংশান নিয়ে বি-এ পাশ করেছিস? মিষ্টি খাওয়া। এদ্দিন তোর পাত্তাই নেই। আসতে পারিস না মাঝে মাঝে?"

বাণী নিয়মিতভাবে কলেজে পড়ে বি-এ পাশ করেছে। এখন বি-টি পড়তে যাবে।

বাণীদের অবস্থা ভালো। শ্যামলী জিজ্ঞেস করলো, "তুই বি-টি পড়তে যাবি কোন দুঃখে?"

"পড়াশুনো করবো এব মধ্যে আর সুখ দুঃখ কি." বাণী উত্তর দিলো "বাঙালী বাড়ির সেই চিরন্তন সমস্যা। বাবা ঠিকমতো ছেলে পাচ্ছেন না। বাড়িতে তো আর এমনি বসিয়ে রাখা যায় না, স্বতরাং মেয়ে আরো পড়াশুনো করুক। আমি ভাবছি যাই হোক এই তালে পড়াশুনো করে একটা চাকরি-বাকরি জুটিয়ে নিই। নিজের রোজগার না থাকলে সংসারে কোনো ইজ্জত থাকে না, রোজগার থাকলে কারো মন জুগিয়ে চলতে হয় না।"

শ্যামলী হেসে ফেললো বাণীর কথা শুনে। তারপর বললো, "অনেকদিন কারো সঙ্গে দেখা নেই। অন্য সবার কি খবর, বল।"

"কার খবর জানতে চাস? অরুন্ধতীর বিয়ে হয়ে গেছে. চন্দ্রা দিল্লি চলে গেছে। পুষ্প, ইন্দিরা, মাধুরী সবাই পাশ করেছে। পুষ্প ছাড়া আর সবাই ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে। সবিতা সেদিন দুঃখ করছিলো, তুই ওর এখানে একবারও গেলিনে।"

"ওর কি খবর?"

"সবিতাও এবার প্রাইভেটে বি-এ দিয়ে পাশ করেছে। ওর একটি ছেলে হয়েছে নয় দশ মাস হোলো। আমি ওর ওখানে যাই মাঝে মাঝে। ওর বর ভাই খুব মাই-ডিয়ার লোক। ওদের মতো এতো সুখী দম্পতি দেখা যায় না বড়ো একটা। ওর একটি বিধবা ননদ আছে। ও একটু কিরকম যেন। সবিতার সঙ্গে বোধ হয় বেশী বনে না।'

"চল একদিন ওর ওখানে—।"

"ও তো এখন শ্বশুরবাড়িতে নেই। বেড়াতে এসেছে বাপের বাড়ি। থাকবে বোধ হয় কয়েকদিন।

"সেখানেই চল না। মাসীমার সঙ্গেও অনেকদিন দেখা হয়নি।"

"বিদ্যুতের কোনো খবর জানিস ?"

"বিশেষ কিছু না," শ্যামলী খুব মৃদু গলায় উত্তর দিলো, "দু-একবার দেখা হয়েছে। কোথায় যেন প্রফেসারি করে।"

"একদিন কিন্তু বাসে যেতে যেতে দেখলাম তুই আর বিদ্যুত গ্র্যাণ্ডের নিচে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিস।"

শ্যামলী খুব সহজ ভাবে বললো, "হ্যাঁ, সেদিন বোধ হয় শনিবার ছিলো, না ? অফিস থেকে ফেরার সময় লিণ্ডসে স্ট্রীটের মোড়ে দেখা হয়ে গেল। ওরকম দুচার বার দেখা হয়েছে।"

"ও সবিতার কথা জিজ্ঞেস করে ?"

"না।" একটু থেমে শ্যামলী জিজ্ঞেস করলো, "সবিতা ওর কথা জিজ্ঞেস করে ?"

"এমনি সেদিন জিজ্ঞেস করছিলো, বিদ্যুত কি করছে আজকাল।"

ওরা কথা বলছিলো ভেতরের ঘরে বসে। এমন সময় শ্যামলীর মা ঘরে ঢুকে বললো, "ওরে শ্যামলী, বিদ্যুত এসেছে।"

"বিদ্যুত!" বাণী অবাক হয়ে শ্যামলীর দিকে তাকালো।

শ্যামলীর কান দুটো লাল হোলো, বললো, "ও এখানেও আসে মাঝে মাঝে।"

বাণী আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না, শুধু একটু মুচকি হাসলো।

শ্যামলী উঠে গিয়ে বিদ্যুতকে ডেকে নিয়ে এলো ঘরের ভিতর।

বাণীকে দেখে বিদ্যুতও অবাক।

"আরে! আপনি কোত্থেকে ? অনেকদিন পর--।"

"হ্যাঁ, প্রায় দুবছরেরও উপর। আমি কিন্তু আপনার খবর শ্যামলীর কাছে পেয়েছি," বললো বাণী। তারপর একটু মুচকি হেসে বললো, "সেদিন সবিতা আপনার খোঁজ করছিলো। ও প্রায়ই জিজ্ঞেস করে আপনার কথা।

বিদ্যুত একটু গম্ভীর হোলো। কিন্তু সহজভাবেই জিজ্ঞেস করলো, "ওর কি খবর ? কেমন আছে ?"

"ভালোই আছে। ও এখন খুব সুখী। একটি বাচ্চা হয়েছে। এখন বাপের বাড়িতে আছে। যাবেন নাকি ? চলুন না। আমি আর শ্যামলী সেখানেই যাচ্ছি। ও খুব খুশী হবে আপনাকে দেখলে," বলে বাণী শ্যামলীর দিকে আড় চোখে তাকালো। দেখলো, শ্যামলীর মুখের ভাব খুব কঠিন হয়ে গেছে। মনে মনে হাসলো বাণী।

বিদ্যুত বললো, "আজ নয়। আজ আমার একটু কাজ আছে। আরেকদিন যাওয়া যাবে। আপনারা ঘুরে আসুন।"

বাণী আর শ্যামলী যখন সবিতার বাপের বাড়ি এলো তখন সবিতা বাড়ি ছিলো না। কমলেশের সঙ্গে নিউ মার্কেটে গিয়েছিলো। সবিতার মা তরুবালা তাদের আদর করে ঘরের ভিতর বসালো, সবার খোঁজখবর নিলো, কন্যার শ্বশুরবাড়ির প্রশংসা করলো, সবিতা এবং কমলেশ যে কি রকম আদর্শ দম্পতি, তার বর্ণনা করলো। নিজেদের পরিবারেরও নানা খবর দিলো সেই সঙ্গে। বড়ো ছেলে সরোজ চার্টার্ড একাউণ্টেন্সি পড়ছে, ছোটো ছেলে সমর আই-এস-সি পাস করে ঢুকেছে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। নিশিকান্ত বাবু আগের অফিস থেকে রিটায়ার করেছেন অনেকদিন, কিন্তু তাঁকেও বসে থাকতে হয়নি, একটি বিদেশী ফার্মে আবার চাকরি যোগাড় করে নিয়েছেন। মোটামুটি ভালোই আছে সবাই।

ওরা যখন কথাবার্তা বলছে সে সময় কমলেশের সঙ্গে সবিতা ফিরে এলো। ওদের সঙ্গে আলাপ করে কমলেশ খুব খুশী। সবিতাকে বললো, "তোমার এত বন্ধু, এদের কোনোদিন বাড়িতে খেতে ডাকোনি কেন?"

"কতোবার বলেছি," উত্তর দিলো সবিতা, "ওরা আসেই না।"

"হয়ে ওঠেনি এদ্দিন," বললো শ্যামলী, "এবার একদিন নিশ্চয়ই যাবো।"

বাণী হঠাৎ বলে উঠলো, "বিদ্যুতের খবর জানিস সবিতা? শ্যামলীর সঙ্গে ওর দেখা হয় মাঝে মাঝে।"

শ্যামলীর ইচ্ছে হোলো ঠাস করে একটা চড় কষে দেয় বাণীর গালে। তরুবালা সবিতার মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে চায়ের ব্যবস্থা করবার অজুহাতে উঠে চলে গেল। শ্যামলী লক্ষ্য করলো যে কমলেশের মুখখানি মেঘের মতো গম্ভীর হয়ে গেছে। সে একটু বিস্মিত হোলো।

সবিতার বুকে কে যেন একটু ধাক্কা দিলো কিন্তু খুব সহজ ভাবে সে বললো, "ওর কি খবর, কি করছে আজকাল?"

"ও ফার্স্ট ক্লাস নিয়ে এম-এ পাশ করে কোন একটা কলেজে প্রফেসারি করছে।"

"বিয়ে থা করে নি?"

"এখনো তো করে নি। করবে নিশ্চয়ই।"

"হ্যাঁ, আজকালকার ছেলেরা একটু দেরি করেই বিয়ে করতে চায়," সবিতা মুখে হাসি টেনে বললো, "আমার মাসতুতো ভাই সেই সুধীন-দাকে মনে আছে তো? একদিন যে দেখেছিলি! ওঁর সঙ্গে অর্চনা-দির বিয়ে হয়ে গেছে।"

"আমাদের কলেজের অর্চনা-দি? যাঁর ওখানে বিদ্যুতের সঙ্গে তোর আলাপ হয়েছিলো?" প্রগল্‌ভতার সঙ্গে বলে উঠলো বাণী, "বিদ্যুতের দিদি হয় না? তোদের সঙ্গে তাহলে বিদ্যুতের একটা কুটুম্বিতে হোলো বল্।"

শ্যামলীর এমন রাগ হোলো বাণীর উপর! এভাবে কথা না বললে নয়?

সবিতা কিন্তু গায়ে মাখলো না। বললো, "ওরা নিজেরাই নিজেদের বিয়ের ঠিক করেছে।"

"ওমা! তাই নাকি!" চোখ কপালে তুললো বাণী।

শ্যামলী অন্য প্রসঙ্গ পাড়বার চেষ্টা করলো। বললো, "তোর দাদা সরোজ বাবুর চার্টার্ড একাউণ্ট্যাণ্ট হতে আর ক'বছর বাকী আছে?"

"আরো দু-বছর বোধ হয়। ও ভালো লাইন বেছে নিয়েছে। আমাদের পাশের বাড়ির মঞ্জুশ্রীকে মনে আছে তো? ওকে এখানে দেখেছিস দু-তিন বার। ওরই বাবার ফার্মে আর্টিকেল্‌ড্ হয়ে আছে।"

"চার্টার্ড একাউণ্ট্যাণ্ট হওয়ার সুবিধে অনেক," বললো বাণী, "তাড়াতাড়ি ভালো চাকরি পায়, মেয়ের বাপেরা পেছনে ঝুলোঝুলি করতে থাকে—।"

"দাদার সে ভাবনা নেই," সবিতা হাসতে হাসতে বললো, "মঞ্জুশ্রীর সঙ্গেই ওর বিয়ে হবে। ওর সঙ্গে দাদার খুব ভাব। ওরই জন্যে তো দাদা চার্টার্ড একাউণ্টেন্সি পড়বার সুযোগ পেয়েছে।"

কমলেশ এতক্ষণ চুপ করে ছিলো। এবার যেন ফেটে পড়লো। "যতো সব ঢং! এর সঙ্গে ওর ভাব, ওর সঙ্গে তার ভাব, জীবনে যেন প্রেম ভালোবাসা রোমান্স ছাড়া খেয়েদেয়ে আর কোনো কাজ নেই। এখনকার ছেলেমেয়েরা একেবারে গোল্লায় যাচ্ছে। এসব প্রেম করে বিয়ে করার ফল যে কি হচ্ছে সে তো দেখতেই পাচ্ছি চেনা-জানাদের মধ্যে। বিয়ের দু তিনমাস পর যখন সংসারের আসল রূপ দেখতে পায়, তখন আর মনে কোনো রং থাকে না, সমস্ত স্বপ্ন সমস্ত কল্পনাবিলাস সব উবে যায়, তখন চুলোচুলি সুরু হয় স্বামীস্ত্রীর মধ্যে। গুরুজনেরা দেখেশুনে যে বিয়ে দেন, সেটাই ঠিক। সেখানেই সত্যিকারের ভালোবাসা স্নেহ সহানুভূতি সব কিছু গড়ে ওঠে। আমাদের বাপ ঠাকুর্দারা সংসার করেনি? এই তো আমি আর সবিতা সংসার করছি আজ

দু বছর, বিয়ের আগে কেউ কাউকে চিনতাম না, আমাদের চাইতে কি বেশী সুখী তোমাদের আজকালকার কেষ্টঠাকুরেরা ? ধরে চাবকাতে হয় এদের।"

শ্যামলী একটু মুচকি হাসলো।

"সত্যি, আপনারা খুব সুখী, না ?" বাণী হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো কমলেশকে। কিন্তু তাকালো সবিতার দিকে।

সবিতা অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিলো।

বাড়ি ফেরার পথে বাণী শ্যামলীকে বললো, "আমার মনে হয় কমলেশবাবু নিশ্চয়ই জানেন বিদ্যুতের কথা। তা নইলে অতো ক্ষেপে উঠতেন না।"

শ্যামলী অত্যন্ত বিরক্ত হোলো। সে বলে উঠলো, "অন্যের ব্যাপারে তোর মাথা গলিয়ে দরকার কি বাপু ?"

নিজের কর্মকুশলতায় কমলেশের ভাই পুলকেশের পদোন্নতি হয়েছে কিছুদিন হোলো। এখন সে এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডিস্ট্রিক্ট সেলস্ ম্যানেজার। কাজে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তার জীবনধারারও পরিবর্তন হতে সুরু করেছে। আগে ছিলো সাদাসিধে জীবন। নিজের অবসর সময়ে পাড়ার ক্লাব থিয়েটার আর বন্ধুবান্ধবের আড্ডা এসব নিয়েই পড়ে থাকতো। এখন নানা জাতের নানারকম লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়। অবসর বলতে কিছুই নেই। অফিসের সময় ছাড়া অন্য সময়ও যা কিছু মেলামেশা সামাজিকতা সব নিজের কাজ উপলক্ষ করেই। সংসারে আগে যা দিতো, এখন রোজগার বেড়ে যাওয়ার পরও তার বেশী দেয় না, বলে খরচা বেড়ে গেছে। এই অজুহাতে কমলেশ সবিতা পীড়িত হয় কিন্তু মুখে কিছু বলে না। খরচা তো তার ট্যাক্সির আর জামাকাপড়ের। বার্-এ যেতে সুরু করেছে, ককটেল পার্টিতেও যায় মাঝে মাঝে। সবিতাকে বলে, কাজের জন্যে এসব করতে হয়। দশটা পাঁচটা করে নিরামিষ জীবন যাপন করা সম্ভব শুধু কেরানীদের পক্ষে। দায়িত্ব-পূর্ণ কাজে থাকলে সেটা সম্ভব নয়। বদলে যাচ্ছে বাণিজ্য নির্ভর সমাজের হালচাল। মা আর বোন মনে মনে সব বুঝলেও মুখে সায় দেয়, কারণ ওদের ব্যক্তিগত খরচার টাকাটা দেয় পুলকেশ। এবং এ ব্যাপারে সে একটু হাত-খোলা।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা ঈভনিং-সুট পরিধান করে সবিতাকে ডেকে বললো, "বৌদি, ঝি-কে পাঠিয়ে একটা ট্যাক্সি আনিয়ে দাও তো।"

"যাচ্ছো কোথায় ?"

"বোম্বের একটা পার্টি এসেছে কলকাতায়। আমাদের ম্যানেজার ওকে কক্‌টেলএ ডেকেছে।"

সবিতা পুলকেশের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলো। মনে হোলো, যেখানে ও যাচ্ছে সেখানকার পরিবেশে ওকে ভালোই দেখাবে, কিন্তু এই মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরের পরিবেশে তাকে অত্যন্ত কুৎসিত দেখাচ্ছে। একটু হেসে বললে, "তোমায় তো বম্বের সিনেমার হীরোর মতো দেখাচ্ছে। এবার একটি হাল-ফ্যাশানের বৌ আনো।"

পুলকেশ হাসলো না। একটু গম্ভীর ভাবে বললো, "আনতে তো হবেই। জীবনে উন্নতি করার জন্যে একটা তেমন তেমন বৌও আনতে হবে, যে খুব সহজভাবে মিশতে পারবে আমি যে সার্কেলে মিশি সেখানে। তবে যদ্দিন এ বাড়িতে আছি তদ্দিন তো সম্ভব নয়। এই নোংরা পাড়ায় আর থাকার কোনো মানে হয় না। আগে পরে একদিন না একদিন তো এ বাড়ি ছাড়তে হবেই। দাদা তো কথা কানে তোলে না। লেক প্লেসে একটা বাড়ি পাওয়া যেতে পারতো, আড়াই শো টাকা ভাড়ায়। দাদাকে বললাম, তুমি একশো পঁচিশ দাও, আমি একশো পঁচিশ দিই। দাদা রাজী হোলো না।"

"কি করে সম্ভব ভাই," সবিতা বললো, "এখানে বাড়ি ভাড়া দিতে হয় না, নিজেদের বাড়ি, তাই চলে যাচ্ছে কোনোরকমে। ঝট করে আড়াই শো টাকার মতো খরচা বাড়িয়ে দিয়ে চলবে কেমন করে?"

"জীবনে ঝুঁকি নিতে চাও না বলেই তোমরা কোনোদিন জীবনে উন্নতি করতে পারো না," বলে উঠলো পুলকেশ।

সবিতা হাসলো। বললো, "তুমি ঝুঁকি নাও, তুমি উন্নতি করো, তাহলেই আমাদের চলবে।"

পুলকেশ চলে যাওয়ার পর সবিতা উপরতলায় অঞ্জলীর ওখানে বেড়াতে গেল।

অঞ্জলীর স্বামী পরাশরের টি-বি হয়েছে বছরখানেক। তার রোজগার বন্ধ। সংসার প্রায় অচল। অঞ্জলীর গয়না যে ক'খানা ছিলো, সবই গেছে। দুপুরে সবিতার কাছে দশটা টাকা ধার চেয়েছিলো। টাকাটা দিতেই এলো সবিতা।

অঞ্জলীকে দেখে মনে হয় টি-বি যেন তারই হয়েছে। আগের সেই হৃষ্ট পুষ্ট মিষ্টি চেহারা আর নেই। অনেক রোগা হয়ে গেছে এই এক বছরে। সে টাকাটা চুপচাপ নিলো, বললো, "সামনের মাসে ফিরিয়ে দেব।"

"সে যখন খুশী দিও," উত্তর দিলো সবিতা।

একটু চুপ করে থেকে অঞ্জলী বললো, "আমি একটা চাকরি নিচ্ছি।"

সবিতা অবাক হোলো। এখানকার দত্ত-পরিবার অত্যন্ত গোঁড়া। এখানকার বাড়ির মেয়েরা চাকরি করতে যাবে সেকথা ধারণাতীত।

"তুমি চাকরি করতে যাবে?"

"উপায় কি ভাই, সংসার তো চালাতে হবে।"

"এ বাড়ির লোকেরা তো সেটা পছন্দ করবে না।"

"না করলেও বা উপায় কি। ওরা তো দু-পয়সা দিয়ে সাহায্য করবে না।"

"কোথায় নিচ্ছো চাকরি?"

"বাগবাজারে। ওখানে একটি মেয়েদের স্কুলে সেলাইয়ের মাস্টারি। সামান্য মাইনে। কিন্তু কি করবো বলো। যা পাই, তাই লাভ। বড় ভুল করেছি, তোমার মতো লেখাপড়া শেখা উচিত ছিলো।"

সবিতা জিজ্ঞেস করলো, "পরাশর-দা আজ আছেন কেমন?"

"আবার জ্বর হতে সুরু করেছে।"

সবিতা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো, তারপর বললো, "আচ্ছা, এবার যাই। কাল দুপুরে একবার সময় করে আসবো'খন।"

"এখনই যাবে কেন? বোসো না। চা খাবে? কাকীমা কেমন আছেন?"

"ভালোই।"

"ঝর্ণার কি খবর? ওকে আজকাল প্রায়ই সন্ধ্যেবেলা দেখতে পাই না।"

"বাড়িতে থাকে না।"

"কোথায় যায়?"

সবিতা একটু গম্ভীর হোলো। আস্তে আস্তে বললো, "ওদিকে কোথায় ভবানন্দ বাবা নামে এক সাধু আছেন, সেখানে যায়।"

"ওমা, ওই ভবানন্দ মহারাজের কাছে? যিনি ওই জজসায়েবের বাড়িতে থাকেন, কি যেন নাম! দীক্ষা নিয়েছে নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"ভবানন্দ মহারাজ তো নাকি খুব এ্যারিস্টোক্র্যাট সাধু। জজ ম্যাজিস্ট্রেট আর সুন্দরী মেয়ে ছাড়া আর কাউকে শিষ্য করেন না। অবশ্যি সবাই বলে উনি নাকি ঈশ্বরকে পেয়েছেন। কিন্তু কি জানি, যা শুনি টুনি, আমার ভালো লাগে না।"

"ভালো কি আর আমারও লাগে," সবিতা বললো, "তবে মা আর আমার

কর্তার মনের ভাব অন্যরকম। ঝর্ণা যখন এসে বললে, আমি মহারাজের কাছে দীক্ষা নেবো, মা আর উনি খুব খুশী হয়েই রাজী হলেন। ওঁরা বললেন, বিধবা মেয়ে, একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো, ধর্মে মন এসেছে, এতো খুব ভালো কথা। ঝর্ণারও চেহারা ফিরে গেছে, দেখে সবাই মনে মনে খুব সুখী। মুখে গুরু মহারাজের কথা ছাড়া আর কোনো কথা নেই। কিন্তু কই, মনে ধর্মভাব এলে যে স্বভাব বদলায় তা তো হয়নি। সংসারের সামান্য সামান্য ব্যাপারে এমন নীচ মনের পরিচয় দেয় এক এক সময় যে বলার নয়।"

"এসব ঝোঁক বেশীদিন থাকে না। দু-দিন পরে শখ মিটে যাবে।"

"তারপর?" সবিতা জিজ্ঞেস করলো, "তখন কি নিয়ে থাকবে?"

"ওসব ভেবে তুমি আর আমি কি করবো ভাই, যে যার নিজের স্বভাব অনুযায়ী নিজের রাস্তা ঠিক খুঁজে নেয়।"

কমলেশ বাড়ি ফিরেছে ইতিমধ্যে। সবিতাকে জিজ্ঞেস করলো, "কোথায় ছিলে এতক্ষণ?"

"ওপরে অঞ্জলী-দির কাছে গিয়েছিলাম।"

"ওখানে কেন? মানা করেছি না? ওখানে টি-বি রোগী, ওখানে অতো যাওয়ার কি দরকার। তুমি কি বাড়িতে টি-বি আনতে চাও নাকি?"

সবিতা কোনো উত্তর দিলো না।

কিছুক্ষণ চুপ করেছিলো কমলেশ। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, "মা বলছিলো তুমি নাকি অঞ্জলী বৌদিকে টাকা ধার দাও?"

"হ্যাঁ। দিই মাঝে মাঝে।"

"কেন?"

"না দিলে কি করে চলে। ওদের খুব কষ্ট।"

"ওদের কষ্ট বলে আমাদের কি দায় ঠেকেছে? ওদের পূর্বজন্মের পাপের ফলে ওরা ভুগছে। তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর কি দরকার?"

পূর্বজন্মের পাপ? কথাটা শুনে সবিতার রাগ হোলো। কিন্তু রাগ সামলে শুধু বললো, "অঞ্জলী-দি ধার ফেলে রাখে না, সময় মতো ফিরিয়ে দেয়।"

"আজও ধার দিয়েছো নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"কতো?"

"দশ টাকা।"

"দ-শ টা-কা! আমায় না বলে আমার টাকা তুমি ধার দেবার কে?"

"আমি তোমার টাকা ধার দিই নি।"

"তাহলে? কোথায় পেলে টাকা?"

"মা আমায় শাড়ি কেনবার জন্যে পঁচিশটা টাকা দিয়েছিলো সেদিন। সেখান থেকে দিয়েছি।"

"সে টাকাই বা দিতে গেলে কেন? টাকা যদি কোথাও দিতে হয় এই সংসারে দেবে, অন্য কোথাও নয়। টাকা তোমার মা দিক বা যেই দিক, তোমার টাকা আমারই টাকা। আমায় না জিজ্ঞেস করে কাউকে টাকা দেওয়ার অধিকার তোমার নেই।"

সবিতা ঠোঁট কামড়ে চুপ করে রইলো।

ঠিক সে সময় শ্যামলীর বাড়িতে শ্যামলী আর বিদ্যুত বসে গল্প করছিলো।

"সেদিন তক্ষুনি চলে গেলেন কেন?" শ্যামলী জিজ্ঞেস করছিলো।

"বসে থেকে কি করতাম? আপনি তো বাণীর সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন।"

"আমরা ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ফিরে এসেছিলাম। আমার এমন খারাপ লাগছিলো যে কি বলবো। আপনি এলেন আর আপনাকে চা না খাইয়েই আমাকে বেরিয়ে যেতে হোলো! কিন্তু কি করবো, বাণী তো বড়ো একটা আসে না। অনেকদিন পরে এলো, আর এসেই বললো, চল। ওকে 'না' বলতে পারলাম না।"

তাতে কি হয়েছে। আমি এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, একটু ঢুঁ মেরে গেলাম।"

"আচ্ছা, একটা কথা—।"

"কি?"

"আমি ডিপ্লোমা-ইন-স্পোকেন ইংলিশ পড়বো?"

"কেন?"

"ইংরেজিটা ভালো বলতে পারলে ভালো চাকরি পাওয়া যায়।"

"হ্যাঁ, পড়তে পারেন। কিন্তু এম-এ পড়লেই ভালো হোতো।"

"সেটা পরে প্রাইভেটে দিয়ে দেবো। এখন এটা পড়ি। চাকরি করতে করতে পড়া যাবে।"

"বেশ তো, পড়ন না।"

অন্য দু-চারটি কথার পর বিদ্যুত হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, ''আচ্ছা, সেদিন আপনারা সবিতার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন না? ওর কি খবর, আছে কি রকম?''

বলে যেন একটু লজ্জা পেলো বিদ্যুত, চোখ ফিরিয়ে নিলো অন্য দিকে। একটু অসোয়াস্তি লাগলো শ্যামলীরও। কিন্তু সে বিদ্যুতকে অপ্রতিভ হতে দিতে চাইলো না।

''সবিতা ভালোই আছে,'' উত্তর দিলো শ্যামলী, ''সুখেই আছে। মনে হোলো শ্বশুরবাড়িতে ওর কদর খুব। ওর মা তো তাই বললেন।''

বিদ্যুতের মুখের উপর কোনো ভাব পরিবর্তন দেখা গেল না। সে খুব সহজ ভাবে বললো, ''হ্যাঁ, ভালো কথা, আপনাকে বলতে ভুলে গেছি। সগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেকচারারের চাকরির অফার এসেছে।''

''তাই নাকি? খুব ভালো খবর।''

''কিন্তু ভাবছি, ও চাকরি নেবো না।''

''কেন?''

''কি হবে? এখানে বেশ আছি। পরে এখানকার ইউনিভার্সিটিতেই লেকচারারের কাজ পেয়ে যাবো। উপস্থিত একটা ডক্টরেট নিয়ে নেওয়া দরকার। ভাবছি, বিলেত চলে গেলে কেমন হয়?''

''ভালোই হয়। ঘুরে আসুন। আমি যেতে পারলে তো এখানে এক মুহূর্তও থাকতাম না।''

বিদ্যুত একটু চুপ করে রইলো।

''চা আরেক কাপ দেবো?'' জিজ্ঞেস করলো শ্যামলী।

বিদ্যুত আস্তে আস্তে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, ''আচ্ছা, সবিতার একটি ছেলে হয়েছে, না?''

— সাত —

সেদিন অফিস থেকে ফিরে কমলেশ সেতার নিয়ে বসলো। খুব গম্ভীর মুখ। কারো সঙ্গে কোনো কথাবার্তা বললো না। তার মুখের ভাব দেখে সবিতাও কিছু জিজ্ঞেস করলো না। সন্ধ্যেবেলা বাড়িতে অনেক কাজ। বেশী কথাবার্তা বলার ফুরসতও নেই।

এদের শিগ্গিরই আলাদা হয়ে যাওয়ার কথা। স্থকিয়া স্ট্রীটের ওদিকে দু-কামরার কটা ঘর নেওয়া হয়েছে। সত্তর টাকা ভাড়া। আগাম টাকা দেওয়া হয়ে গেছে। সামনের মাসের প্রথমেই চলে যাওয়ার কথা।

সংসারে গোলমাল চলছিলো অনেকদিন থেকেই। পুলকেশ আজকাল ভালো রোজগার করে, কিন্তু ঠিকমতো খরচার টাকা দেয় না, তাই নিয়ে গোলমাল ; ঝর্ণা পুলকেশের কাছ থেকে টাকা নিয়ে মায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে নিজের গুরু ভবানন্দ মহারাজের সেবায় খরচা করে, তাই নিয়ে গোলমাল : ঝর্ণার সঙ্গে সবিতার ঝগড়া হয় আর সাবিত্রী মেয়ের পক্ষ নিয়ে কমলেশের কাছে লাগায়, তাই নিয়ে গোলমাল। সাবিত্রীর সঙ্গে সবিতার কথাকাটাকাটি হলে সবিতা চুপ করে থাকে না, শাশুড়ীকে মুখের উপর দু-কথা শুনিয়ে দেয়, তাই নিয়ে গোলমাল। সবিতা মাছের মুড়ো কমলেশকে দিলে মনোমালিন্য হয়, কমলেশের বরাদ্দ দুধে কম পড়লে ঝগড়া হয়, সবিতা একটা নতুন গয়না গড়ালে ঝর্ণার মুখ ভার হয়।

এই চলছিলো বছরখানেক ধরে। কমলেশ আর সবিতা উত্যক্ত হয়ে উঠেছিলো। মায়ের বহু অনুরোধে উপরোধে কমলেশ এক জায়গায় পুলকেশের বিয়ের কথাবার্তা চালিয়েছিলো। পুলকেশ আচমকা এমন ভাবে অসম্মতি জানালো যে কমলেশের মুখ রইলো না। তা নিয়ে রীতিমতো কলহ হয়ে গেল দু-ভায়ের মধ্যে। এবং সেই কলহে সাবিত্রী এবং ঝর্ণা পুলকেশের পক্ষ অবলম্বন করাতে একেবারে তিক্ত হয়ে গেল কমলেশের মন।

কমলেশ অনেকদিন থেকেই বলছিলো,—এসব অশান্তি আর সহ্য হচ্ছে না। এর চাইতে আলাদা হয়ে যাওয়াই ভালো। পুলকেশ ভালো রোজগার করে। মা-বোনকে সে রাখতে পারবে। প্রত্যেকদিন একটা না একটা অশান্তি, আর কাঁহাতক সহ্য করা যায়!

সবিতাই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওকে সামলে রাখবার চেষ্টা করছিলো। সে বলতো,—এরকম ভালো দেখায় না। ভাই-বোনকে তুমি মানুষ করলে, তোমার

কি ওদের সঙ্গে রাগারাগি করে আলাদা হয়ে যাওয়া ভালো দেখায়? তাছাড়া মা বুড়ো হয়েছেন, আমরা ছাড়া ওঁর কে আছে সংসারে? কেন ওঁকে এই বয়েসে এই সাংসারিক বিচ্ছেদ দেখতে হবে! অন্তত উনি যদ্দিন বেঁচে আছেন তদ্দিন এসব কথা ভেবো না।

কমলেশ কিন্তু মানতে চাইতো না। সে সব সময় বলতো, আমার আর এদের সঙ্গে এরকম ঝগড়াঝাটি করে থাকতে আর ভালো লাগছে না।

কমলেশ যে আলাদা হয়ে যাওয়ার কথা ভাবছে সেকথা সাবিত্রী-ঝর্ণা-পুলকেশের কানেও উঠেছিলো। অন্যান্য জ্ঞাতিদের কাছে তারা বলে বেড়ালো যে, সবিতা কমলেশকে আলাদা হয়ে যাওয়ার মন্ত্রণা দিচ্ছে।

দেখেশুনে এমন একটা লক্ষ্মী বৌ ঘরে আনলাম,—অনুযোগ করতে লাগলো সাবিত্রী,—সে যে শেষ পর্যন্ত আমার ঘর ভাঙবার চেষ্টা করবে একথা তো ভাবতে পারিনি।

কথাটা সবিতার কানে উঠলো, সবিতার কাছ থেকে শুনলো কমলেশ। সে সবিতাকে ব্যঙ্গ করে বললো, "কেমন, শুনলে তো। নাও, শাশুড়ী-ননদের পক্ষ নিয়ে আরো কথা বলতে এসো আমার সঙ্গে!"

হ্যাঁ, সব সংসারে সব গণ্ডগোলের জন্যে যা কিছু দোষ সব বৌয়েদেরই তো মুখ বুঁজে মেনে নিতে হয়,—মুখ ভার করে বললো সবিতা,—সাধু পুরুষ শুধু তোমরাই।

এমনিই চলছিলো দিনের পর দিন।

একদিন হঠাৎ ঝর্ণাকে উপলক্ষ করে দু-ভায়ে সাংঘাতিক কলহ হয়ে গেল।

সেদিন ঝর্ণা এসে বলেছিলো,—আমি প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দেবো ভাবছি।

কথাটা শুনে কমলেশ আকাশ থেকে পড়লো। সে কি, এদ্দিন পরে পড়াশুনোর কথা! প্রাইভেট পরীক্ষা দেওয়াও তো সহজ কথা নয়। খরচাও আছে, বাড়িতে টিউটার রাখতে হবে, বইপত্তর কিনতে হবে, কতো কি।

ঝর্ণা জেদী মেয়ে। বললো, না, আমি পড়বো।

বেশ, পড়,—বললো কমলেশ,—তবে এখন টিউটার রাখার খরচাটা বোধ হয় দিয়ে ওঠা যাবে না। কিছুদিন তোর বৌদির কাছে পড়াশুনো কর। তারপর দেখা যাবে।

না, আমি বৌয়ের কাছে পড়তে পারবো না,—ঝর্ণা বললো,—আমি টিউটার ঠিক করেছি। তার জন্যে খরচা লাগবে না।

কে টিউটার?

অরবিন্দ মণ্ডল নামে এক ভদ্রলোক।

মণ্ডল! শিডিউল কাস্ট!—বলে উঠলো কমলেশ।

ঝর্ণা তেড়ে উঠলো,—টিউটার রাখতে কি লোকে জাতকুল বিচার করে নাকি! টিউটার ভালো হলেই হোলো।

কিন্তু সে বেটাছেলে যে!—বললো কমলেশ।

হোক না বেটাছেলে,—ঝর্ণা উত্তর দিলো,—ও আমার খুব চেনা।

খুব চেনা! কমলেশের চোখ কপালে উঠলো। কোনো অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে ঝর্ণার চেনা কি করে থাকতে পারে?

আস্তে আস্তে বিস্তারিত ভাবে জানা গেল। ঝর্ণার গুরু ভবানন্দ মহারাজ যে জজ সায়েবের বাড়িতে থাকেন, সেবাড়িতে অরবিন্দ মণ্ডল প্রাইভেট টিউটার। ভবানীপুরের এক স্কুলের মাস্টার, তা ছাড়া নোট বইও লেখে, যদিও সেগুলো বেরোয় খ্যাতিমান পণ্ডিত অধ্যাপকদের নামে। সে নিজে ভবানন্দ মহারাজ জাতীয় লোকের ধার ধারে না, তবে ওবাড়িতে তার যাওয়া আসা নিয়মিত বলে আস্তে আস্তে ঝর্ণার সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে। সে-ই ঝর্ণাকে উদ্বুদ্ধ করেছে পড়াশুনো করবার জন্যে।

সবিতা শুনে একটু হেসে কমলেশকে বলেছিলো,—ভালোই তো, ওই সব গুরু মহারাজের চাইতে এ ধরণের পরিচিত অনেক ভালো। এরকম তো হবেই। আমি আগে বলিনি তোমায়? কদ্দিন ওরকম অল্পবয়েসী বিধবাকে এভাবে রাখতে পারবে? ওর একটা মন নেই? একটা জীবন নেই?

কমলেশ সগর্বে ঘোষণা করেছিলো,—আমি যদ্দিন বেঁচে আছি, তদ্দিন এসব চলবে না।

কিন্তু কে শোনে কার কথা! সুরু হোলো অরবিন্দ মণ্ডলের নিয়মিত আসা-যাওয়া।

গুরু মহারাজের কাছে যাচ্ছিস না আজকাল? —জিজ্ঞেস করলো কমলেশ।

"না।"

"কেন?"

"ও একটা ছোটো লোক।"

হুঁশ হোলো এদ্দিনে? —সবিতা মনে মনে হেসে বললো।

কমলেশ সবিতাকে জিজ্ঞেস করেছিলো,—আমাকে তুচ্ছ করছে, ঝর্ণার এ সাহস এলো কোথা থেকে? ওর সাহস যোগাচ্ছে কে?

সে কথাও জানা গেল। ঝর্ণার পড়াশুনোয় সব চাইতে বেশী উৎসাহ পুলকেশের। শোনা গেল একদিন সে ঝর্ণাকে বলছে,—ওই থান-ফান পরা

ছাড়। কালো পেড়ে শাড়ি পরলে কোনো দোষ নেই। আর দু-গাছি চুড়ি হাতে পর। খালি হাত ভালো দেখায় না।

শুনতে পেয়ে কমলেশের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

সে তেড়ে বেরোচ্ছিলো নিজের কামরা থেকে, সবিতা পথ আটকে বললো,—তুমি কিছু বলতে যেও না। তোমার কি? আর পুলকেশ তো ঠিকই বলেছে। কেন ঝর্ণা এই বয়েসে থান পরতে যাবে? কেন হাত খালি থাকবে ওর?

কমলেশ সাবিত্রীকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, মা এসব কি ভালো হচ্ছে? আগুন নিয়ে খেলা তো ভালো নয়।"

মা উল্টো বুঝলো। রেগে উঠে বললো, "কি বলতে চাইছিস তুই? নিজের মায়ের পেটের বোনকে তুই চিনিস না? সে কি তেমন মেয়ে? তুই একথা ভাবতেও পারলি কি করে যে তার দ্বারা কোনো অন্যায় সম্ভব? আজ বৌ তোকে যা বলবে তুই তাই বিশ্বাস করবি? বৌয়ের পাল্লায় পড়ে তুই এত অন্ধ হয়ে গেলি?

সুরু হোলো কথার ঝড়। তাতে যোগ দিলো ঝর্ণাও। সবিতা কমলেশকে টেনে নিয়ে গেল ঘরের ভিতর। বললো, "কেন তুমি এসব নিয়ে কথা বলতে যাও? তোমায় মানা করিনি?"

তারপর একদিন সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে ফিরতে চোখে পড়লো ঝর্ণা চা আর মিষ্টি এনে দিয়েছে অরবিন্দ মণ্ডলকে। সে খাবে না কিন্তু ঝর্ণা খুব পীড়াপীড়ি করছে। কথাবার্তাগুলো সাধারণ, যে কেউ লৌকিকতা করতে গিয়ে ঠিক এই সংলাপই বলবে, কিন্তু দুজনের চোখের চাউনির মধ্যে এমন একটা ধরণ ছিলো সেটা কমলেশের খুব খারাপ লাগলো।

তখন কিছু বললো না, চুপচাপ নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। পড়িয়ে যখন মাস্টার চলে গেল, কমলেশ বেরিয়ে এসে বললো, পড়াশুনোর আর দরকার নেই। মাস্টারকে আসতে মানা করে দাও।"

"কেন?" জিজ্ঞেস করলো ঝর্ণা।

"আমার ভালো লাগছে না।"

"তোমার কেন ভালো লাগছে না সে তুমিই জানো," ঝর্ণা উত্তর দিলো, "আমি কিন্তু পড়াশুনো বন্ধ করবো না। সুরু যখন করেছি, শেষ পর্যন্ত গিয়ে ছাড়বো।"

"কি হবে পড়াশুনো করে?"

"কেন? আমার কি নিজের একটা জীবন নেই?"

"থাক, নিজের জীবনের আর দরকার নেই। ওসব বেলেল্লাপণা আমার এখানে চলবে না। যদি করতে হয় তো নিজের শ্বশুরবাড়ি গিয়ে করোগে যাও।"

দাদার মুখে একথা আশা করেনি ঝর্ণা। সে রাগে কেঁদে ফেললো। বললো, "তুমি আমায় বিদেয় করে দিতে চাইছো।"

"আমার কথা যদি শুনতে না চাস তো তাই। এখানে থাকতে হলে আমার কথা শুনে চলতে হবে, তা নইলে চলে যা এবাড়ি থেকে," বলতে বলতে মাথা গরম হয়ে গেল কমলেশের। ভাষার উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ রইলো না।

ঝর্ণা কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই পুলকেশ বেরিয়ে এলো পাশের ঘর থেকে। তার তখন পুরো সাহেবী বেশ, কোথাও বেরোনোর উপক্রম করছে। সে বলে উঠলো, "তুমি ঝর্ণাকে চলে যেতে বলার কে? এ তোমার একলার বাড়ি নয়।"

এবার ক্রোধে দিশাহারা হোলো কমলেশ। তার অভিভাবকত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এই প্রথম। সে ফেটে পড়লো, "তুই আবার কোন মুখে কথা বলতে এসেছিস রে হতভাগা? নিজে সংসারে পয়সা দিবি না, মদ খাবি, হোটেলে যাবি, ট্যাঁশদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াবি, তার উপর আবার আমার মুখের মুখে তর্ক করতে আসবি? নিজে তো গোল্লায় গেছিস, আবার বোনটিকেও নষ্ট করতে চাইছিস?"

"আমি যাই করি," খুব শান্ত কণ্ঠে পুলকেশ বললো, "আমার বক্তব্য শুধু এই যে, এ বাড়িতে তোমার অংশ যতোখানি, আমারও ততোখানি। ঝর্ণা এখান থেকে চলে যেতে বলার কোনো অধিকার তোমার নেই।"

"বেশী কথা বললে তোকেও ঘাড় ধরে বার করে দেবো। চলে যা আমার চোখের সামনে থেকে। তুই যা, ঝর্ণাকেও নিয়ে যা, মাকেও নিয়ে যা। আমার কাউকে দরকার নেই।"

পুলকেশ মাথা গরম করেনি একটুও। খুব প্রশান্ত কণ্ঠে বললো, "আমরা চলে যাবো কেন? আমরা এখান থেকে এক পাও নড়বো না। এ বাড়ি তোমার যেমন, আমাদেরও তাই। তোমার ভালো না লাগে, তুমি চলে যাও।"

"আমি! আমায় চলে যেতে বলছিস," কমলেশ বললো, রাগে কাঁপতে কাঁপতে।

"হ্যাঁ বলছি। আমাদের সঙ্গে মিলেমিশে যখন থাকতে পারছো না, তখন থাকতে বলবো কেন?"

সবিতা চুপ করে শুনছিলো। সে ভাবলো,—এদের কথার মাঝখানে পড়ে আমার কি দরকার। ওকে এত মানা করলাম, আমার কথা তো শুনলো না। এখন তার ফল ভোগ করুক।

কমলেশ চলে গেল নিজের ঘরে। সবিতাও উঠে গেল ওর পেছন পেছন। যেতে যেতে শুনলো ঝর্ণা পুলকেশকে বলছে,—বৌয়ের মুখের চেহারা দেখলে? এত গোলমাল রাগারাগি, কিন্তু ওর কিরকম হাসি-হাসি মুখ। দাদা তো জেদী লোক, ঠিক আলাদা হয়ে যাবেই। বৌয়ের মনস্কামনা পূর্ণ হোলো। মা খুঁজে পেতে বৌ একটা এনেছে বটে!

সেদিন থেকে কমলেশ আলাদা বাড়ির সন্ধান করতে লাগলো। মাস-খানেকের মধ্যে পেয়ে গেল স্থকিয়া স্ট্রীট অঞ্চলে দু-কামরার একটি ঘর। সত্তর টাকা ভাড়া। আগাম ভাড়া দিয়ে সেটি নিয়ে নিলো।

বাড়ি এসে সবিতাকে বললো,—ঘর নিয়ে নিলাম।

ভালোই করেছো—উত্তর দিলো সবিতা—, সবার সঙ্গে থেকে এত অশান্তি হওয়ার চাইতে আলাদা হয়ে যাওয়া অনেক ভালো।

"কিন্তু খরচা তো বেড়ে যাবে।"

"সে যাক। আমি চালিয়ে নেবো।

তার কিছুদিন পরে সেই সন্ধ্যায় এসে কমলেশ যখন সেতার নিয়ে গম্ভীর মুখ করে বাজাতে বসলো, কোনো কথাবার্তা বললো না কারো সঙ্গে, সবিতা ভাবলো, নিশ্চয়ই আলাদা হয়ে যাচ্ছি বলে ওর মন খারাপ। এরকম তো হবেই। কি হবে কোনো কথা জিজ্ঞেস করে? নিজের মনে সেতার বাজাচ্ছে, বাজাক। কিছুক্ষণের মধ্যে মন শান্ত হয়ে যাবে।

রাত্তিরের খাওয়ার পাট সেদিন একটু তাড়াতাড়িই চুকে গেল। গরম পড়েছিলো বেশ। সবিতা চান করে নিলো শোয়ার আগে। তারপর ঘরে ঢুকতে দেখলো, তাকে দেখে কমলেশ সেতার নামিয়ে রাখছে।

"শোনো, এখানে এসে বোসো। একটা কথা আছে।"

সামনে এসে বসলো সবিতা। জিজ্ঞেস করলো, "কি?"

কমলেশ চুপ করে রইলো।

"কি হয়েছে তোমার আজ? অতো গম্ভীর কেন?"

কমলেশ আস্তে আস্তে বললো, "সবিতা, আমাদের বোধ হয় আর আলাদা হয়ে থাকা সম্ভব হোলো না।"

"কেন?"

"না। এখানেই থাকতে হবে।"

"তা হলে যে আগাম ভাড়াটা দেওয়া হোলো নতুন বাড়ির জন্যে?"

"ধরে নাও সেটা ক্ষতি গেল।"

"কিন্তু কেন? এখান থেকে চলে যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেছে, এত কথা হয়ে গেছে তা নিয়ে, এখন কি আবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করাটা ঠিক হবে?"

"উপায় নেই সবিতা।"

"কেন, কি হয়েছে? খুলে বলো না পরিষ্কার করে।"

"নোটিস দিয়েছে আমায়?"

"কি?"

"অফিস থেকে এক মাসের নোটিস দিয়েছে।"

সবিতার মুখ শুকিয়ে গেল। "তার মানে?"

"তার মানে এক মাস পর আমি বেকার।"

"হঠাৎ চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিচ্ছে কেন?"

"আমাকে একলা নয়। অনেককেই দিচ্ছে। কম্পানি কলকাতার ব্রাঞ্চ তুলে দিচ্ছে। অফিস গুটিয়ে নিতে বছর খানেক সময় লাগবে। যাদের এখন ছাড়ালে চলবে না, তাদের আরো কিছুদিন রাখবে। অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে দেবে কয়েক মাসের মধ্যেই। আমাদের ডিপার্টমেণ্টে যারা আছে, তাদেরই কাছে নোটিস এসেছে সবার আগে।"

কিন্তু হঠাৎ ব্রাঞ্চ তুলে দিচ্ছে কেন?"

"কথা হচ্ছিলো অনেক দিন থেকেই।"

"কই আমায় তো কিছু বলো নি।"

"তোমায় সব কথা বলতে হবে এরকম তো কোনো কথা নেই। তুমি শুনে হায়-হায় করা ছাড়া আর কি করতে। আমি বাইরে-বাইরে অন্য কাজের চেষ্টা করছিলাম যেদিন শুনেছি সেদিন থেকেই। কিন্তু নোটিসটা বড্ড তাড়াতাড়ি এসে পড়লো।"

"কী অন্যায় তোমাদের কম্পানির। এতগুলো লোকের রোজগার বন্ধ হয়ে যাওয়া কি চাট্টিখানি কথা।"

"কম্পানি কি করবে? ওরা গত কয়েক বছর ধরে শুধু ক্ষতির উপর

চলছে। আমাদের প্রত্যেককে তিন-মাসের মাইনে গ্র্যাচুয়িটি দিচ্ছে। আর, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকাও কিছু পাওয়া যাবে।"

"যাক, কিছুদিন তো চলবে। ইতিমধ্যে তুমি নিশ্চয়ই আরেকটি চাকরি পেয়ে যাবে।"

"কে বলতে পারে পাবো কি পাবো না?"

"না পেলে চলবে কি করে?"

"সে তো পরের কথা। উপস্থিত প্রশ্ন হোলো এই যে, এই অবস্থায় আমাদের এখন আলাদা হয়ে খরচা বাড়ানো উচিত হবে কিনা।"

সবিতা একটু ভাবলো। কিন্তু সিদ্ধান্তে উপনীত হতে তার বেশী সময় লাগলো না। বললো, "দেখ, এত কথার পর এখন যদি চাকরি চলে গেছে বলে এখান থেকে চলে যেতে না চাই, তা হলে কিন্তু এদের মধ্যে আর মাথা উঁচু করে বাস করতে পারবো না। তোমার যখন রোজগার চলছে তখন তোমাকে এত কথা শুনতে হয়েছে, রোজগার বন্ধ হলে তুমি মনে করেছো তোমায় ওরা ছেড়ে কথা কইবে? কথায় কথায় পদে পদে তোমাকে না হোক অন্তত আমাকে ওদের টিটকিরি টিপ্পনি শুনতে হবে। সে আমি হতে দেবো না। যেমন আলাদা হচ্ছিলাম, হয়ে যাই। এখান থেকে মাথা উঁচু করেই বেরোবো, তোমার রোজগার থাক আর নাই থাক।"

"কিন্তু আমাদের চলবে কি করে? জমা টাকা ক'টা খরচা করলে তো চলবে না।"

"একটা কথা বলবো তোমায়?"

"বলো।"

"আমি একটা স্কুলে চাকরি নিয়ে নিই।"

"মাথা খারাপ। বোসেদের বাড়ির বৌ যাবে চাকরি করতে?"

আমাদের চাইতে অনেক বড় ঘরের বৌ আজকাল চাকরি করতে যাচ্ছে। অবস্থার চাপে সংসার চালানোর জন্যে এসব করতে হচ্ছে। এর মধ্যে কোনো অসম্মান নেই।"

কমলেশ ভাবলো অনেকক্ষণ। কি হতে চলেছে এই দুনিয়া! কতো অভাবনীয় ব্যাপার দেখতে হচ্ছে তাকে! তার প্রাচীন পন্থী মন শুধু ধাক্কা খাচ্ছে অনবরত।

ভেবে টেবে বললো, "বেশ, যদি স্কুলমাস্টারি করতে পারো তো করো। তবে একটা কথা, আমি যদি চাকরি পাই তো তোমায় চাকরি ছাড়তে হবে।"

"না," বললো সবিতা, "তারপরও আমি চাকরি করবো। ছেলে বড়ো

হবে, টাকার প্রয়োজন বাড়বে। তোমার রোজগারের সঙ্গে আমার রোজগারটা যোগ হলে কতো স্থবিধে হবে বলো তো ?"

কমলেশ আরো কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলো। তারপর বললো, "আমি আরেকটা কথা ভাবছি।"

"কি ?"

"চাকরি তো খুজবো নিশ্চয়ই। কিন্তু আজ হঠাৎ এই শিক্ষা হোলো যে কোনোদিন চাকরির ভরসায় থাকতে নেই। চাকরি যেতে কতক্ষণ ?"

"তাহলে ?"

"চাকরি পাই তো ভালো। কিন্তু সে ছাড়া যদি একটা স্বাধীন রোজগারের ব্যবস্থা করা যায়—।"

"সে তো ভালো কথা। কিন্তু কি করবে ? ব্যবসা ?"

"হ্যাঁ। একরকম তাই।"

"কি ব্যবসা ?"

"ভাবছি, একটা গানের স্কুল খুলবো।"

"গানের স্কুল ?"

"হ্যাঁ। আমার গুরুজীর সঙ্গে অনেকবার এ নিয়ে কথা হয়েছে।"

"বেশ তো। বিদ্যে যেটা শিখেছো সেটা কাজে লাগবে।"

"একটা কথা।"

"কি ?"

"দেখ, গানের স্কুল তো সাধারণতঃ চলে মেয়ে ছাত্রীদের ভরসায়। রমলার সাহায্য পেলে আমার স্থবিধে হয়। সেতারে তো ওর নাম আছে। আর ওকে অল্প টাকায় রাখা যাবে। প্রথম দিকে কিছু না দিলেও ক্ষতি নেই। ওর স্ট্যাণ্ডার্ডের অন্য কোনো আর্টিস্টের কাছ থেকে তো এরকম স্থবিধে পাওয়া যাবে না।"

সবিতা চুপ করে রইলো।

কমলেশ বললো, "অবশ্য তুমি যদি বলো, তাহলে। তা নইলে, তোমার যদি আপত্তি থাকে তো আমি রমলাকে এ ব্যাপারে ডাকবো না।"

সবিতা একটু চুপ করে থেকে বললো, "না, আমার কোনো আপত্তি নেই। এতে আপত্তি করার কি আছে ? তুমি যা ভালো বোঝো, তাই করো।"

সেদিন মাসের চার তারিখ। মাইনের টাকাটা পেয়ে শ্যামলীর মনটা খুব প্রসন্ন। অফিস থেকে বেরিয়ে দেখে বিদ্যুত গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

"আপনি ?"

"হ্যাঁ, আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। বাড়িতেই যেতাম আজ সন্ধ্যেবেলা। কিন্তু এ পাড়ায় একটু কাজে এসেছিলাম, তাই ভাবলাম একবার চেষ্টা করে দেখি যদি আপনাকে এখানে ধরা যায়, তাহলে আর অদ্দূর যেতে হবে না।"

শ্যামলী আর বিদ্যুত ফুটপাথ ধরে হাঁটতে লাগলো। ট্রামস্টপে এসে যখন বিদ্যুত থামলো না, শ্যামলী জিজ্ঞেস করলো, "বাড়ি যাবেন না ?"

"এখন বাড়ি গিয়ে কি করবো," বিদ্যুত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "আমি তো কোনোদিন এসময় বাড়ি যাই না।"

"আপনার বাড়ি নয়," শ্যামলী হেসে ফেললো, "আমাদের বাড়ি যাওয়ার কথা বলছিলাম।"

"ও, আপনাদের ওখানে ? আপনাকে যখন পেয়েই গেলাম, ওখানে গিয়ে আর কি করবো। চলুন এদিকেই কোথাও চা খেয়ে নেওয়া যাক। তারপর আপনাকে ট্রামে তুলে দিয়ে আমি অন্যদিকে চলে যাবো।"

ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট দিয়ে হেঁটে হেঁটে ওরা এস্প্লানেডের দিকে চলে এলো।

মেট্রোর সামনে এসে বিদ্যুত জিজ্ঞেস করলো, "সিনেমা দেখবেন ?"

"আজ নয়," বললো শ্যামলী, "দেরি হয়ে যাবে।"

কাছাকাছি এক রেস্তোরাঁয় গিয়ে চা খেতে বসলো ওরা দুজনে।

"বলুন," কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর শ্যামলী বললো।

"কি বলবো ?"

"আপনাকে দেখে তো মনে হোলো কিছু একটা বলতে এসেছেন।"

"ও, হ্যাঁ," আনমনা ভাবটা কাটিয়ে বিদ্যুত একটু হাসলো, "আমি বিলেত যাচ্ছি।"

"বিলেত!" শ্যামলীর মুখ হঠাৎ বিবর্ণ হোলো। সামলে নিয়ে হেসে বললো, "ভালো খবর। কবে যাচ্ছেন ?"

"আগামী সোমবার।"

"হঠাৎ ? আগে তো বলেন নি কিছু ?"

"ভেবেছিলাম এই সেশানে এ্যাডমিশান পাবো না। কয়েকদিন আগে হঠাৎ চিঠি পেলাম যে লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে সীট পেয়েছি। হাতে সময় বেশী নেই। ভাগ্যিস পাসপোর্টের এ্যাপ্লিকেশন আগেই করাছিলো। এই কটা দিন অন্যান্য সব ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত ছিলাম।"

"তাই এই কদিন আপনার পাত্তা পাওয়া যায় নি। কদ্দিন থাকবেন সেখানে?"

"দু-বছর তো নিশ্চয়ই। তার আগে তো থিসিস শেষ হবে না।"

"ডক্টরেটের জন্য যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ।"

"বেশ। ঘুরে আসুন। আমায় চিঠি লিখবেন মাঝে মাঝে," বলে শ্যামলী একটু হাসলো।

"আপনার মাঝে মাঝে মনে পড়বে আমার কথা, তাই না?" জিজ্ঞেস করলো বিদ্যুত।

"তা মনে পড়বে বই কি। কটা দিন বেশ ঘুরে বেড়িয়েছি আমরা," খুব হাসি মুখে শ্যামলী বললো, "আপনি ছাড়া আমার কে আর বন্ধু আছে ইদানিং। আপনি আমার যা উপকার করেছেন সে আমি কোনোদিনই ভুলতে পারবো না।"

"উপকার আপনিও করেছেন।"

"আপনার? কি উপকার করেছি?"

"সে আপনি জানেন না। কিন্তু করেছেন। যাক সে কথা। আমি ফিরে এসে যেন দেখি আপনি এম-এ পাশ করেছেন।"

"দেখি, আগে স্পোকেন্-ইংলিশ-এ ডিপ্লোমাটা করে নিই। তারপর যদি পারি প্রাইভেটে এম-এ দিয়ে দেবো।"

"দিয়ে দেবেন কিন্তু। খুব খুশী হবো তাহলে," বিদ্যুত বললো। একটু চুপ করলো সে, তারপর বললো, "কে জানে, আমি হয়তো এদেশে নাও ফিরতে পারি। এখানে আমার মন লাগে না। যদি ওখানে একটা ভালো কাজটাজ পাই থেকেই যাবো।"

শ্যামলী হেসে ফেললো, "সে তো খুবই ভালো কথা। আগে নিজে কাজ কর্ম নিয়ে গেড়ে বসুন। তারপর খোঁজখবর পেলে আমাকে জানাবেন। শুনেছি ওদেশে নাকি অনেক চাকরি। যদি আমায় একটি জুটিয়ে দিতে পারেন, আমিও চলে যাবো। আমারও কি ছাই এদেশে ভালো লাগে?"

"আপনিও যাবেন?" বিদ্যুত আনমনে কি যেন ভাবলো, তারপর হঠাৎ বলে ফেললো, "আপনিও চলুন না আমার সঙ্গে।"

"আমি!" শ্যামলী অবাক হোলো, "আপনার সঙ্গে?"

"হ্যাঁ।"

শ্যামলী হাসলো। "টাকা পাবো কোথায়?"

"উপস্থিত কিছু আমার কাছ থেকে ধার নিন। তারপর ওদেশে গিয়ে যা হোক একটা কিছু ব্যবস্থা করা যাবে।"

শ্যামলী খুব হাসতে লাগলো। "সত্যি বলছেন?"

"সত্যি বলছি। আপনাকে আমার খুব বন্ধু বলেই মানি। সেজন্যেই বলছি।"

শ্যামলী একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বললো, "হ্যাঁ, আমি জানি।"

"যাবেন?"

"না।"

"কেন?"

"সে হয়না।"

"কেন?"

"এখানে মা আছেন, বাবা আছেন, ছোটো ভাইবোনেরা আছে। ওদের ফেলে আমি কি করে যাই?"

"কেন?"

"ওদের দেখবে কে?"

"যদ্দিন আপনি পড়াশুনো করতেন, তদ্দিন কে দেখেছে?"

"তখনকার কথা আলাদা। আজ আমার রোজগারই সংসারের প্রধান অবলম্বন। আমি হঠাৎ চলে গেলে ওদের অসুবিধে হবে।"

"বছর খানেক অসুবিধে না হয় হোলোই বা। যখন ফিরে এসে ভালো চাকরি পেয়ে যাবেন, তখন সব কিছু পুষিয়ে যাবে।"

"না, বিদ্যুত বাবু," শ্যামলীর গম্ভীর মুখ আবার হাসিতে ভরে উঠলো, "আমার যাওয়া হতে পারে না।"

বিদ্যুত আর কিছু বললো না। বুঝলো যে, বেশী বলা অশোভন হবে।

অনেকক্ষণ চুপ করে ছিলো দুজনে। তারপর বিদ্যুতই নীরবতা ভঙ্গ করলো।

"আজ যাওয়ার আগে আমার সব পুরোনো বন্ধুদের কথা মনে পড়ছে এক একজন করে," বলে বিদ্যুত একটা মৃদু দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো, "বিশেষ করে একজনের কথা। সে আজ জানতে পারলে কতো খুশী হোতো।"

শ্যামলী চোখ তুলে বিদ্যুতের দিকে তাকালো, কিছু বললো না।

"তার সঙ্গে একবার দেখা হলে ভালো হোতো," বিদ্যুত বললো।

কার সঙ্গে সেকথা শ্যামলী বুঝলো। খুব মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলো, "কেন?"

"ক্ষমা চেয়ে নিতাম।"

"এমন কি অপরাধ করেছেন যে গায়ে পড়ে ক্ষমা চাইতে হবে? সে তো আপনার ক্ষমা চাওয়ার প্রত্যাশায় বসে নেই।"

"সে কথা জানি। সে তো সুখেই আছে, সুখে স্বামীর ঘর করছে।"

"তাহলে?"

"খুব দেখতে ইচ্ছে করে।"

"কি?"

"ওর সংসার।"

"কি লাভ?" খুব মৃদু কণ্ঠে শ্যামলী জিজ্ঞেস করলো।

"দেখবো, ওকে সুখী দেখে আমিও একটু সুখ পাবো, ওইটুকুই লাভ।"

"বেশ, দেখে আসুন," এবার খুব সহজ হয়ে শ্যামলী বললো।

"আপনি নিয়ে চলুন আমায়।"

"কোথায়?"

"সবিতার বাড়ি। এজন্যেই আজ আপনার খোঁজে এসেছিলাম।"

"ও, এ জন্যেই," শ্যামলী চোখ পাকিয়ে বললো।

"শুধু এজন্যে নয়। বিলেত যাবো, এ খবরটাও আপনাকে দেওয়ার ছিলো। তাছাড়া সবিতার সঙ্গে একটিবারের মতো দেখা করিয়ে দেওয়ার জন্যে তো বটেই।"

"দেখা করিয়ে দিতে হবে কেন? আপনি নিজে চলে যান না।"

"সে কি করে হয়? আমি যে ওখানে যাবো, আমার একটা পরিচয় চাই তো। এমনি এমনি কারো বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হওয়া যায়?"

"আমি সঙ্গে গেলে আপনার কী বিশেষ পরিচয়টা হবে?"

"আপনার ভাই কি ওরকম একটা কিছু বলবেন।"

এবার একটু গম্ভীর হোলো শ্যামলীর কণ্ঠ। সে স্থিরদৃষ্টিতে বিদ্যুতের দিকে তাকিয়ে বললো, "সবিতার বাড়িতে আপনার অন্য কোনো পরিচয়ের দরকার নেই। পরিচয় যা দেওয়ার সবিতাই দেবে।"

"আপনি যাবেন না আমার সঙ্গে?" ,

"না," শ্যামলী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো, "আপনি আমায় যা করতে বলবেন, তাই করবো, কিন্তু একাজ আমি পারবো না," তার গলাটা একটু ধরা-ধরা শোনালো, "আপনি আমার জন্যে এত করেছেন, আপনাকে যে কোনো-দিন 'না' বলতে হবে একথা আমি কল্পনাই করতে পারিনি। কিন্তু না, আপনাকে সবিতার বাড়ি নিয়ে যেতে পারবো না।"

"কেন ?"

"না, আমি পারবো না। আমায় বলবেন না।"

"তাহলে কি করে ওর সঙ্গে আমার দেখা হবে ?"

"আপনি একাই চলে যান না।"

"আমি একা ? বাড়ির সবাই যদি কিছু মনে করে ?"

শ্যামলী শান্ত কণ্ঠে বললো, "তাহলে আপনি সবিতাকে আজো চেনেন নি। ও আপনার কোনো অসম্মান হতে দেবে না।"

একটু চুপ করে থেকে বিদ্যুত জিজ্ঞেস করলো, "ওর ঠিকানাটা ?"

একটা স্লিপ-কাগজে সবিতার ঠিকানা লিখে দিলো শ্যামলী।

বাড়িটা খুঁজে পেতে বিদ্যুতের খুব অসুবিধে হোলো না। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে একটু দ্বিধাবোধ করলো।—যাবো, কি যাবো না ? কি মনে করবে সবিতা ? কিন্তু বিদেশে যাওয়ার আগে সবিতাকে একবার দেখার—শেষবারের মতো দেখার—ইচ্ছে তার সমস্ত কুণ্ঠা ঘুচিয়ে দিলো।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেও সে ভাবছিলো।—সবিতা তাকে দেখে খুব অবাক হবে নিশ্চয়ই। সে গিয়ে দেখবে সবিতা হয়তো খুব ব্যস্ত, তার স্বামী অফিস থেকে ফিরেছে অনেকক্ষণ। তিনি বাচ্চাটিকে হাঁটুর উপর তুলে নাচাচ্ছেন, সবিতা রান্না করছে। একটা সুখী পরিতৃপ্ত গেরস্তালির ছবি ফুটে উঠলো বিদ্যুতের মনে।

দোতলায় উঠে ডাইনে বেঁকে খানিকটা এগিয়ে বাঁয়ে ঘুরতে হবে। বিদ্যুত আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলো ঘরগুলো দেখতে দেখতে।

তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। চারদিকে শোরগোল, বাচ্চাদের চিৎকার, কিশোরকিশোরীদের সরব পড়াশুনোর ধুম। কোথাও বা চলছে দৈনন্দিন সাংসারিক কলহ। খুঁজতে খুঁজতে বিদ্যুত এগিয়ে গেল। পেয়ে গেল একটু পরে।

দরজা খোলাই ছিলো। বিদ্যুত দরজার উপর টোকা দিলো। দেখলো, একজন প্রৌঢ়া বিধবা ভদ্রমহিলা এগিয়ে এলেন।

"কে ?"

"কমলেশ বাবু থাকেন এখানে ?"

"কে, মা ?" বলতে বলতে ঝর্ণা বেরিয়ে এলো পাশের ঘর থেকে।

সাবিত্রী ঠিক শুনতে পায়নি বিদ্যুতের কথা। আবার জিজ্ঞেস করলো, "কাকে চাই ?"

"সবিতা আছে ?" বিদ্যুত জিজ্ঞেস করলো।

"সবিতা ?" ঝর্ণার চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি, "আপনি কোথেকে আসছেন ?"

"সবিতাদের সঙ্গে আমার খুব জানাশোনা ছিলো। আমার নাম বিদ্যুত চৌধুরী।"

"বি-দ্যু-ত চৌ-ধু-রী !" ঝর্ণা ওর মায়ের দিকে তাকালো, ওর মা তাকালো মেয়ের দিকে।

"না, ওরা এখানে থাকে না," বললো ঝর্ণা, "ওরা অন্য বাড়িতে উঠে গেছে।"

"সে কি ? কবে ?"

"এই তিনচারদিন হোলো।"

"ও। আচ্ছা, নতুন ঠিকানা কি আমায় বলবেন ?"

ঝর্ণা কি বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু তার আগে সাবিত্রী বলে উঠলো, "না, ওদের নতুন ঠিকানা আমরা জানিনে।"

দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

বিদ্যুত আস্তে আস্তে রাস্তায় নেমে এলো। এবাড়ি ওবাড়ির রান্নাঘরের ধোঁয়া এসে জড়ো হয়েছে রাস্তায়। রোয়াকে বসে কয়েকজন লোক জটলা করছে। হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছে পথের ধারের নোনাধরা বাড়ির কোনো এক কিশোরী। ঝাপসা কলকাতার আকাশে ঝিলমিল করছে একটি দুটি তারা।

বিদ্যুত মোড়ের বড়ো রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল।

তখন অনেক রাত।

রান্নাঘরের পাশের একফালি রোয়াকে একলা চুপচাপ বসেছিলো শ্যামলী। খাওয়াদাওয়ার পাট চুকে গেছে অনেকক্ষণ আগে। বাড়ির অন্যান্য সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। এতক্ষণে শ্যামলী একটু নিরিবিলি হওয়ার অবকাশ পেলো।

মাঝরাতের কলকাতার আকাশ আর অতো ধোঁয়াটে নয়, ঝাপসা নয়। অনেকগুলো তারা ঝিলমিল করছে সেখানে। ছেলেবেলা থেকেই একলা বসে তারা গুণতে ভালো লাগে শ্যামলীর। যখনই মনে খুব বেদনা অনুভব করেছে, এখানটায় একলা বসে আকাশের আর রাত্রির অসীম নিবিড় স্তব্ধতার সান্নিধ্য পাওয়ার চেষ্টা করেছে সে। জীবনের প্রত্যেকটা ব্যথাবেদনার স্মৃতি

মিশে আছে ওই আকাশের রঙে। আকাশে যেন নিজের মনকে দেখতে পায় সে।

আজ কিন্তু শ্যামলী নিজের মনকে জিজ্ঞেস করলো,—কেন, আমার আজ কিসের এ কষ্ট ? বেশ তো আছি, খাচ্ছি দাচ্ছি, চাকরি করছি, সংসার চালাচ্ছি। আজ তো আমায় কেউ কিছু বলে না। মা বকে না, বাবা ধমকায় না। যা চাই তা পেতে কোনো বাধা নেই। তবু কেন ? কিসের এই কষ্ট ? ঘুমুতে চাই, কেন ঘুম আসছে না আমার ?

অনেকক্ষণ ভাবলো। অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ ধরে ভাবলো। তারপর কেঁদে ফেললো সে। ঝরঝর করে চোখের জল নেমে এলো। ভিজে গেল শাড়ির আঁচল।

কেন ? কেন আমার এমন হোলো ?—ভাবলো শ্যামলী, যা হওয়ার নয়, কেন তার জন্যে মিথ্যে কামনা ? যা পাওয়ার নয়, কেন তার জন্যে এই অর্থহীন চাওয়া ? যা কোনোদিন কাউকে জানতে দিতে পারবো না, কাউকে বলতে পারবো না, যা কোনোদিন আর মন থেকে মুছেও ফেলতে পারবো না, কেন তা আমাকে সারাজীবন কাঁদাবে এমনি করে ? কেন আমাকে এই ভার চিরকাল বয়ে বেড়াতে হবে ?

কেন ? কি দরকার ছিলো ? কেন ? কেন ? কেন ?

বিদ্যুত কেন এলো আমার জীবনে ? ওকে যখন চিনতাম না তখন এত অভাব দারিদ্র্যের মধ্যেও বেশ তো ছিলাম !

তার মন পূব হাওয়ার মতো মর্মরধ্বনি করে বললো,—ওরে বোকা মেয়ে, তুই মরেছিস।

সোমবার অফিসে যাওয়ার সময় খুব ভালো করে সাজপোশাক করলো সে। পূজোর সময় বিদ্যুত তাকে একটি ভারী সুন্দর শাড়ি দিয়েছিলো, সেইটে পরলো। মাকে ডেকে বললো,—মা, আজ আমার ফিরতে একটু দেরি হতে পারে।

—কেন রে ?

—হাওড়া স্টেশনে যাবো।

—কেন ?

—বিদ্যুত বাবু বিলেত যাচ্ছেন। ওঁকে ট্রেনে তুলে দিতে যাবো।

শ্যামলীর মা তাকিয়ে দেখলো শ্যামলীকে। বিদ্যুত হঠাৎ বিলেত যাওয়ার

ঠিক করলো কবে, যাওয়ার আগে এখানে এলো না কেন, কদ্দিন থাকবে সেখানে, কবে ফিরবে, এরকম অনেক প্রশ্ন মনে এলো,—কিন্তু শ্যামলীর হাসির মুখোস পরা মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলো না।

শুধু বললো, "বেশী রাত করিস না।"

ট্রেন ছেড়ে দিলো। বিদ্যুত জানলা দিয়ে মুখ বার করে হাত নাড়ছিলো। ওর আত্মীয়বন্ধু কয়েকজন এসেছিলো ওকে ট্রেনে তুলে দিতে। ওদের ভিড় থেকে একটু তফাত হয়ে একপাশে দাঁড়িয়েছিলো শ্যামলী। ওরা সবাই হাত নাড়ছিলো, রুমাল নাড়ছিলো। শ্যামলী দাঁড়িয়ে ছিলো স্তব্ধ হয়ে। বিদ্যুতের কম্পার্টমেণ্ট যখন প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে গেল, তখন শুধু এক হাত তুলে নাড়লো শ্যামলী। তারপর আস্তে আস্তে স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে হ্যারিসন রোডের ট্রাম ধরলো।

কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে নামতেই মার্কেটের সামনে দেখা হয়ে গেল সবিতার সঙ্গে। সবিতার এক হাতে ব্যাগ, অন্য হাতে খাতার বাণ্ডিল।

"আরে সবিতা , তুই ?"

সবিতা শ্যামলীকে দেখে খুব খুশী। বললো, "একদিন বাড়িতে আয় না। আমরা স্কুকিয়া স্ট্রীটে উঠে এসেছি।"

"কেন, আগের বাড়িটা কি হোলো ? ওটা তোদের নিজেদের বাড়ি না ?"

"হ্যাঁ, তবে সরিক অনেক। আমাদের ভাগে মোটে তিনটে ঘর। ওখানে জায়গায় কুলোয় না। দেওরেরও বিয়ে থা হবে তো। তাই পরে জায়গার অভাব বলে যদি কোনো গোলমাল হয় তাই আগের থেকে ভালোয় ভালোয় সরে এলাম।"

এটা মেয়েদের ভাষা। পুরুষদের সাদা বাংলায় অনুবাদ করলে এই দাঁড়ায় যে, ওখানে বনলো না, ঝগড়াঝাটি হোলো, তাই আলাদা হয়ে গেলাম। মেয়েদের এই বিশেষ ভাষা শুধু মেয়েরাই বোঝে। শ্যামলীও ঠিক বুঝলো।

সে জিজ্ঞেস করলো, "এই খাতাপত্তর কিসের ? আসছিস কোত্থেকে ?"

সবিতা উত্তর দিলো, "আজকাল স্কুলমাস্টারি করছি। বাড়ি ফেরার পথে একটু কেনাকাটা করে নিলাম। তুই কোত্থেকে আসছিস ? অফিস থেকে বুঝি ? তা' হাওড়ার ট্রামে কেন ?"

"হাওড়া স্টেশনে গিয়েছিলাম।"

"কেন রে?"

"বিদ্যুত আজ বিলেত চলে গেল। ওকে সী-অফ্ করতে গিয়েছিলাম।"

সবিতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তার ভাবলেশহীন মুখ।

শ্যামলী ভেবেছিলো আর কিছু বলবে না। কিন্তু হঠাৎ তার মনে একটা তিক্ততার ঝড় এলো। এতদিন এত কিছু সে সয়ে এসেছে মুখ বুজে। আজ সেই সংযমের বাঁধ ভেঙে গেল।

আস্তে আস্তে বললো খুব মাজাঘষা গলায়, "সেদিন বিদ্যুত তোর ঠিকানা চেয়েছিলো শেষবারের মতো তোর সঙ্গে একবার দেখা করবে বলে। আমি তো জানতাম না তুই ঠিকানা বদলেছিস। তোর আগের ঠিকানাই দিয়েছিলাম।"

সবিতা কোনো প্রশ্ন করলো না।

একটু থেমে শ্যামলী বলে গেল, "বিদ্যুত গিয়েছিলো সেই ঠিকানায়। তোর শাশুড়ি জিজ্ঞেস করলো তার পরিচয়। সে বললো, আমার নাম বিদ্যুত, আমাদের সঙ্গে সবিতাদের অনেকদিনের চেনা। তোর ননদও বোধ হয় ছিলো সেখানে। ওরা দুজন দুজনের দিকে তাকালো, তারপর বললে, তোরা অন্য বাড়িতে উঠে গেছিস। বিদ্যুত তোদের এখনকার ঠিকানা চাইলো। ওরা বললে, তোদের এখনকার ঠিকানা ওরা জানেনা। এই বলে ওর মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিলো।"

সবিতা চুপচাপ নির্বিকার ভাবে শুনে গেল ভাবলেশহীন মুখ করে।

"আমার ট্রাম এসে গেল, আমি এবার যাই," বললো শ্যামলী।

সবিতা খুব মিষ্টি করে হাসলো। বললো, "আসিস একদিন আমাদের বাড়ি।"

ট্রাম যখন চলতে সুরু করেছে, শ্যামলী জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলো সবিতা রাস্তার এক ফলওয়ালার সঙ্গে কমলালেবু দর করছে।

— আট —

কেটে গেল একটি বছর।

বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কারো সঙ্গে কারো বড়ো একটা দেখাশোনা হয়না। হঠাৎ যদি কখনো পথে দেখা হয়ে যায়, বা কেউ কারো বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হওয়া যায় তো এর ওর তার খবর পাওয়া যায়।

বাণী একদিন গিয়েছিলো সবিতার বাড়ি। সবিতা শ্যামলীর খবর পেলো তার কাছে।

"শ্যামলী?" সবিতা বলছিলো, "ওর সঙ্গে দেখা হয়নি প্রায় বছর-খানেক। একদিন কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে দেখা হয়েছিলো। ও বেচারী দশটা-পাঁচটা করে সংসার চালায়, সবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার ফুরসত ওর কোথায়? তবে বিয়ে-থা করলে পারতো। বয়েস হয়ে যাচ্ছে, কবে আর করবে?"

"ওকে বিয়ে করতে দিচ্ছে কে? ওর বাবাকে তো চিনিস। নিজের রোজগার তো খুবই সামান্য, যা পান তাও রেস খেলে উড়িয়ে দেন। শ্যামলীর বিয়ে দিয়ে দিলে সংসার অচল হয়ে পড়বে। শুনছি ইদানিং নাকি হার্টের অসুখে ভুগছেন।"

"শ্যামলীর রোজগারে সংসার চলে? কোথায় যেন একটা চাকরি করে, মাইনে এমন কিছু তো নয়।"

"না রে, ও সেই চাকরি আর করে না। সম্প্রতি স্পোকেন্-ইংলিশে ডিপ্লোমা করেছে। এখন ইংরেজী বলবার চেষ্টা করে দিশী মেমসায়েবদের মতো," বাণী কণ্ঠে শ্লেষ মিশিয়ে বললো, "পৌনে তিন শো টাকার মতো মাইনে পায়।"

"পৌনে তিনশো!"

"হ্যাঁ, বড়ো ট্র্যাভেল-এজেন্সিরা তো ভালো মাইনে দেয়। শ্যামলীকে দেখলে আজকাল চিনতে পারবিনা, বিশেষ করে ওর অফিসের বেশভূষা দেখলে। ঢং করে শাড়ি পরে, হাতকাটা চোলি পরে সিন্ধী-পাঞ্জাবী মেয়েদের মতো, ঠোঁটে পুরু করে লিপস্টিক মাখে, নখে নেল্-পলিশ লাগায়, উঁচু হিলের জুতো পরে। অন্য সময়ের পোশাক অবশ্যি অনেকটা সাদাসিধে, কিন্তু তাও বেশ বোঝা যায় যে ও জামাকাপড়ে শৌখীন খুব।"

"ওরকম চাকরি করতে হলে অমন পোশাক দরকার হয়। নানা জাতের

লোক নিয়ে ট্র্যাভেল-এজেন্সিদের কারবার, একটু ওরকম সাজপোশাক না হলে চলে কি করে,'' সবিতা বললো, ''আমাদের মতো স্কুল-মাস্টারনীর পোশাক পরে ওসব চাকরি করা চলে না, আবার ওই পোশাক পরে স্কুলমাস্টারি চলে না। যার যেমন কাজ।''

''হ্যাঁ ভাই, বিয়ে থা যখন করতে পারছে না, চাকরিই যখন করতে হবে, তখন যে ভাবে চাকরিতে উন্নতি করা যায়—।''

বিদ্যুত মাঝে মাঝে চিঠি লেখে, পিকচার-পোস্টকার্ড পাঠায় শ্যামলীর কাছে। সাধারণ চিঠি, একজন বন্ধু যেমনি আরেকজন বন্ধুর কাছে লেখে। সাধারণ খবর,—আজ এখানে গেলাম, কাল ওখানে বেড়িয়ে এলাম, সেদিন নিজে রান্না করে খেয়েছি, ওদিন সারাদিন বৃটিশ মিউজিয়ামে পড়েছিলাম, খাওয়া দাওয়ার কথা মনেই ছিলোনা, ইংরেজ মেয়েবন্ধু দু-একজন হয়েছে, কিন্তু ওদের ভালো লাগে না, আপনাদের সঙ্গে বসে চা খেতে খেতে আড্ডা দিতে যেরকম ভালো লাগতো, এদের সঙ্গে পাব্-এ বসে বীয়ার খেতে খেতে গল্প করতে সেরকম আনন্দ পাইনা,—এই সব।

শ্যামলীর মা ছাড়া সংসারে আর কেউ জানতো না, এমন কি বিদ্যুতও জানতো না যে, শ্যামলী কতো উদগ্রীব হয়ে বসে থাকে ওর চিঠির জন্যে।

বিদ্যুতের চিঠি যতো না সাধারণ, তার চাইতেও সাধারণ চিঠি লেখে শ্যামলী। —সেদিন অফিস থেকে ফেরার পথে খুব জলে ভিজেছি। বাবা হার্টের ট্রাব্‌ল্‌এ ভুগছেন। ট্র্যাভেল-এজেন্সির চাকরিটা বেশ ভালো লাগছে। নানারকম লোকের সঙ্গে আলাপ হয়। ডিপ্লোমা-ইন-স্পোকেন-ইংলিশ পরীক্ষায় পাশ করেছি। ভাবছি, এবার যদি সম্ভব হয় প্রাইভেটে এম-এ দেবো। তবে ইতিহাসে নয়, ইংরেজিতে। আমার ইংরেজি খুব ভালো হয়ে গেছে। মন্টু ক্লাস নাইনে উঠেছে, গীতা প্রমোশন পায়নি। বাণীর সঙ্গে দেখা হোলো কিছুদিন আগে,—ইত্যাদি।

একদিন বিদ্যুতের চিঠি এলো,—খুব কষে কাজ করছি, যাতে থিসিসটা আর এক বছরের মধ্যেই শেষ করা যায়। অন্য ছাত্রদের দেখি, এদেশে এসে খুব আরামেই আছে। আমার কিন্তু মোটেও আর ভালো লাগছে না। পড়া-শুনো বন্ধ করে এক্ষুণি চলে আসতে ইচ্ছে করছে। লণ্ডনের বর্ষা ভালো লাগে না। কলকাতার বর্ষা খুব মনে পড়ে।—

সেদিন কি একটা ছুটির দিন। বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। মেঘ

ডাকছে আকাশে। রাস্তায় জল জমে গেছে, ডাস্টবিন ভেসে গিয়ে যতো আবর্জনা সব জলে ভাসছে। কাদা হয়েছে উঠোনে। শ্যামলী আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলো। আরো কালো হয়ে আসছে আকাশ। বিদ্যুত চমকাচ্ছে ঘন ঘন।

এই বর্ষা লণ্ডনে বসে মনে পড়ছে বিদ্যুতের? শুধু বর্ষা, আর কিছু নয়?

সবিতার দাদা সরোজের চার্টার্ড-একাউণ্টেন্সির কোর্স শেষ হতে তখনো একবছর বাকী আছে, কিন্তু সে আর মঞ্জুশ্রী আর অপেক্ষা করতে চাইলো না। ওরা বিয়ে করে ফেলতে চাইলো এই শ্রাবণেই। নিশিকান্ত বাবুর আপত্তি ছিলো, কিন্তু মঞ্জুশ্রীর বাবাও পীড়াপীড়ি করাতে তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের মাসখানেক পরের কথা।

নিশিকান্ত বাবু এসে তরুবালাকে বললেন, "খবরটা শুনেছো?"

"কি?"

"কমলেশের বোন ঝর্ণা আবার বিয়ে করেছে।"

"তাই নাকি?" তরুবালা শুনে যেন খুশী হোলো, "ভালোই হয়েছে।"

"ভালোই হয়েছে!" নিশিকান্ত বাবু চটে গেলেন তরুবালার কথা শুনে, "ছি, ছি। বলো কি? ভদ্র হিন্দু বনেদী ঘরের বিধবা, সে আবার বিয়ে করতে গেল?"

"কোনো বেআইনী কাজ তো করেনি।"

"আইনই সব কিছু নয়। সমাজ বলে কিছু নেই নাকি?"

"আজকাল অনেক বিধবা বিয়ে করে।"

"করুক গে। সবাই করে না, যাদের মধ্যে ফিরিঙ্গিয়ানা এসেছে, ওরা করে। একি কাণ্ড করলো ঝর্ণা! ভাগ্যিস সরোজের বিয়ের পরে হয়েছে, তা নইলে বিয়ের সময় নানারকম কথা উঠতো।"

"কোনো কথা উঠতো না। এসব যারা পছন্দ করে না, তাদেরও গা সওয়া হয়ে গেছে।"

"কিন্তু কাকে বিয়ে করেছে জানো?"

"কাকে? ওর মাস্টার সেই অরবিন্দ মণ্ডলকেই তো!"

"তুমি কি করে জানলে?"

"ওদের যে বিয়ে হবে, আমি অনেক আগেই সবিতার কাছে শুনেছিলাম।"

"কী কাণ্ড! আরে, বিয়ে যদি করলোই কুলীন কায়েতের ঘরে ছেলে ছিলো না? শেষ পর্যন্ত শিডিউল-কাস্টের এক ছেলেকে?"

"অন্য জাতে বিয়ে তো আজকাল প্রায়ই হচ্ছে," বললো তরুবালা।

"সে হোক। হবেই যদি, বামুন-বদ্যি-কায়েতের মধ্যে এসব অসবর্ণ বিয়ে চলুক। কিন্তু শিডিউল-কাস্ট!"

তরুবালা হেসে ফেললো, বললো, "বাঃ, নিজের থেকে উঁচু জাতের সঙ্গে অসবর্ণ বিয়েতে তোমার আপত্তি নেই, আপত্তি নিজেদের থেকে নিচুদের বেলায়? এ কোন ধরণের ন্যায় গো!"

এ কথার উত্তর দিলেন না নিশিকান্ত বাবু। বললেন, "যাই বলো, এ বিয়েতে কমলেশের মত ছিলোনা। ও যায়ও নি, বলেছে, আর কোনোদিন বোনের মুখদর্শনও করবে না। আত্মীয়স্বজন কারো দিকে ও নাকি মুখ তুলে তাকাতে পারছে না।"

তরুবালা একটু হেসে উত্তর দিলো, "কমলেশ দু-চারদিন ওরকম বলবে। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। ওকে আমি চিনি। কই, ঝর্ণার সেই গুরুকে নিয়ে লোকে যখন টীকা-টিপ্পনি কাটতো, তখন তো ওর কিছু মনে হয়নি? মেয়েটি নিজের বাঁচবার একটা রাস্তা করে নিলো, তাইতে ওর মাথা কাটা গেল? তোমাদের যতো সব কথা!"

নিশিকান্ত বাবু আস্তে আস্তে বললেন, "আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজে ওসব পোষায় না। যেখানে আর দশজন লোকের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে হয়, সেখানে চলতে হয় একটু হিসেব করে।"

"এতো অত্যন্ত স্বার্থপরের মতো কথা হোলো," জাঁতি দিয়ে সুপুরি কাটতে কাটতে তরুবালা বলে উঠলো, "একটি মেয়ে যে ভায়ের সংসারে আশ্রিত হয়ে না থেকে নিজের একটা নতুন সংসার করে সুখী হোলো, সেটা কিছু নয়?"

কেটে গেল আরো কয়েকমাস।

কমলালয়ে পূজোর বাজার করতে গিয়ে শ্যামলীর সঙ্গে সবিতার দেখা হয়ে গেল। সেদিন সবিতা তাকে ছাড়লো না, নিয়ে গেল নিজের বাড়ি।

সেখানে গিয়ে শ্যামলী দেখলো সবিতার শাশুড়িকে। সে একটু অবাক হোলো। তার ধারণা ছিলো বাড়িতে শুধু সবিতা, ওর ছেলে আর কমলেশ বাবু।

"উনি তোর দেওর আর ননদের সঙ্গে থাকতেন না?"

ঝর্ণার বিয়ের খবর শ্যামলী জানতো না।

"ঝর্ণার বিয়ে হয়ে গেছে," সবিতা বললো।

"তাই নাকি?" শ্যামলী বিস্ময় কাটিয়ে বলে ফেললো, "ভালোই হয়েছে। ওর জন্যে তোদের বাড়িতে কম অশান্তি হয়নি।"

"ওর কোনো দোষ নেই। এই বয়েসে নিজের সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে অন্যের সংসারে আশ্রিত হয়ে থাকতে গেলে মনটা একটু অন্যরকম হয়ে যায়। ও আমায় কোনোদিনই ভালো চোখে দেখেনি। অথচ ও জানে না আমি ওর হয়ে কতো ঝগড়া করেছি ওর দাদার সঙ্গে। এমন কি ওর যখন বিয়ের কথা হোলো উনি বিয়েতে বাধা দিতে পারেন নি শুধু আমারই জন্যে।"

"তোর শাশুড়ি এখন তোরই সঙ্গে থাকেন বুঝি?"

"হ্যাঁ, কোথায় আর যাবেন। আমার দেওর তো এক পাঞ্জাবী মেয়ে বিয়ে করে বালিগঞ্জে ফ্ল্যাট নিয়েছে। ও মাকে সঙ্গে রাখতে চেয়েছিলো। কিন্তু ওদের সাহেবী চালচলন মায়ের ভালো লাগেনি। বিশেষ করে পুলকেশের বৌয়ের সঙ্গে বনেনি একটুও। সেকেলে লোক, তাঁর পক্ষে তো অন্য জাতের একটি মেয়ের সঙ্গে মানিয়ে গুছিয়ে চলা সম্ভব নয়। তাই এসে পড়লেন আমার কাছেই।" বলতে বলতে সবিতা হেসে ফেললো। সে বলে গেল, "আমি এখন শাশুড়ির নয়নের মণি। সবাইকে বলেন আমার মতো ভালো বৌ নাকি আর হয় না। এক সময় কী রাগ ছিলো আমার উপর। আমিই নাকি ওঁর ছেলেকে মন্ত্রণা দিয়ে-দিয়ে ওদের থেকে আলাদা করে দিয়েছিলাম। এখন আর ওসব বলেন না।"

শ্যামলী একটু হেসে উত্তর দিলো, "হ্যাঁ, তোর সঙ্গে এসে থাকতে হচ্ছে, এখন তোকে তোয়াজ না করে আর উপায় কি?"

"যাঃ, ওকথা বলিস না। আমি তো ওঁর কোনো অসম্মান কোনোদিন করিও নি, করবোও না।"

"কমলেশ বাবু বাড়ি ফিরবেন কখন?"

"ওঁর ফিরতে দেরি হবে। ওঁর গানের স্কুলটা দাঁড়িয়ে গেছে। উনি তাই নিয়ে পড়ে থাকেন এখন। স্কুলের নাম হয়েছে।"

"এখন আর চাকরি করেন না?"

"না। আমিই করতে দিই নি। প্রথম দিকে খুব কষ্ট হোতো। আমার স্কুলমাস্টারির রোজগারটাই ছিলো সম্বল। স্কুলটা দাঁড়িয়ে যাওয়াতে এখন

আর বিশেষ কোনো অভাব নেই। মাঝখানে যে কী দিন গেছে, কি আর বলবো। যাক, সুখ দুঃখ নিয়েই সংসার। এখন তোর খবর বল।"

কমলেশ একটি স্কুল ভাড়া নিয়েছিলো হপ্তায় তিনবেলার জন্যে। সেখানে বসে ওর মিউজিক স্কুল। ক্লাস হয় বুধবার শনিবার সন্ধ্যেবেলা, আর রোববার সকালবেলা। কিন্তু কমলেশ ব্যস্ত থাকে সব সময়ই। সারা সকাল সেতারের রেওয়াজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তারপর চান করে খাওয়াদাওয়া সেরে সেই যে বেরিয়ে যায়, তারপর ফিরতে ফিরতে রাত দশটা সাড়ে দশটা। দিনের বেলা সবিতাও বাড়ি থাকে না, তার স্কুল দশটা থেকে চারটে। ছেলেটির দেখাশোনা করে সাবিত্রী। পুলকেশের কাছ থেকে চলে এসে সাবিত্রী যে কমলেশের কাছে থাকছে, তাতে কমলেশ আর সবিতা খুশী হয়েছিলো প্রধানত এই কারণেই যে ছেলেটিকে দেখাশোনা করার ভাবনা আর রইলো না।

কমলেশ যে বাড়িতে বড়ো একটা থাকতো না তার জন্যে প্রথম দিকে সবিতা কিছু বলতো না। ভাবতো, গানের স্কুলটা গড়ে তোলার জন্যে নিশ্চয়ই তাকে খুব খাটতে হয়। ছয় সাত মাস পর যখন স্কুল দাঁড়িয়ে গেল, তখন সবিতা ভাবতে সুরু করলো যে, সারাটা দিন ও থাকে কোথায়? গানের স্কুলের ক্লাস শেষ হয় রাত আটটায়, তাও হপ্তায় দুদিন সন্ধ্যে। তাহলে সারাটা সন্ধ্যেই বা কমলেশ থাকে কোথায়? ফিরতে ফিরতে ওর সাড়ে দশটা হয় কেন?

একদিন বললো, "স্কুল যখন দাঁড়িয়ে গেছে, দু-পয়সা যখন বাড়িতে আসতে সুরু করেছে, তখন বাইরে বাইরে এত ঘুরে না বেড়ালেই পারো। শরীর খারাপ হয়ে যাবে না?"

কমলেশ বুঝলো যে, এ একরকম খুঁচিয়ে প্রশ্ন করা, সারাদিন থাকো কোথায়, এত রাত করে ফেরো কেন?

সে উত্তর দিলো, "স্কুল দাঁড়িয়েছে মানে কি? ছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু লাভ হচ্ছে কোথায়? টীচার যাদের রেখেছি তাদের মাইনে দিয়ে, বাড়ি ভাড়া দিয়ে, অন্যান্য খরচা মিটিয়ে কিছু থাকে না। অনেক সময় পকেট থেকে দিতে হয়। তাই আমায় সেতারের টিউশানি করতে হচ্ছে আজকাল।"

"সারাদিন, সারাসন্ধ্যে সেতারের টিউশানি? রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত?"

"অনেকগুলো করছি। তাছাড়া শেখবার জন্যে ওস্তাদের কাছেও যেতে হয়।"

"টিউশানি না করলে নয়?"

"উপায় কি? টাকা তো চাই। তা-ছাড়া টিউশানির দরুণ স্কুলে ছাত্রী আসে, স্কুলের দরুণ টিউশানি পাই।"

প্রথম কয়েক মাস কমলেশ সংসারে বিশেষ কিছুই দিতে পারেনি। পুলকেশ বালিগঞ্জে ফ্ল্যাট নেওয়ার পর শিউলিবাগানের বাড়ির তিনটে ঘর ভাড়া দিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। সেই ভাড়ার টাকার অর্দ্ধেকটা এবং সবিতার স্কুল-মাস্টারির রোজগার, এই ছিলো সংসার খরচার সম্বল। সাত আট মাস যাওয়ার পর কমলেশ খচরা বাবদ কিছু কিছু টাকা দিতে সুরু করলো সবিতাকে, কোনো মাসে একশো পঁচিশ, কোনো মাসে একশো, কোনো মাসে দেড়শো। কিন্তু জিনিসপত্তরের দামও এত বেড়ে যাচ্ছে যে এ টাকায়ও কুলোয় না। খিটিমিটি লেগেই থাকতো সংসার-খরচার সমস্যা নিয়ে। আস্তে আস্তে তিক্ত হতে লাগলো সবিতার মন। সকাল থেকে উঠেই পয়সার ভাবনা, দিনের খরচা কি করে চলবে, সেই দুশ্চিন্তা, তারপর সারাদিন স্কুল, সেখানে হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে ঝগড়া, অন্য টীচারদের দলাদলি, আভ্যন্তরীন রাজনীতি, স্তূপীকৃত খাতা দেখা, ক্লাসের অবাধ্য মেয়েদের ধমকানো, সারাদিন চ্যাঁচানো, এসব করে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আবার যেই সেই। সন্ধ্যেবেলা একটু শান্তিতে থাকতে চায় সবিতা, কিন্তু শাশুড়ির জন্যে সে উপায় নেই। সবিতা স্কুল থেকে ফেরাব পর থেকেই শাশুড়ির অনুযোগের অনুষ্ঠান সুরু হয়,—বাড়িতে এটা নেই, সেটা নেই, ওটা কিনতে হবে, সেটা কিনতে হবে, গয়লা এসে দুবার ঘুরে ঘুরে গেছে টাকার জন্যে, ইলেকট্রিকের বিল দেওয়া হয়নি, ওই টাকাটা ধোবাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সারাদিন কলে জল আসেনি, বাড়িওয়ালার দারোয়ানটা বদমায়েসি করছে,—এই সব। তার উপর একটা নিয়মিত টিপ্পনি ছিলো,—কমলেশ সারাদিন বাড়ি থাকে না কেন, ও অতো রাত করে ফেরে কেন, ওকে একটু সামলাও, এই বয়েসে এত বাউণ্ডুলে হওয়া ভালো নয়, ইত্যাদি।

এক এক সময় সবিতার মনে হোতো যেন মাথা খারাপ হয়ে যাবে। তবু যে কি করে সে ধৈর্য বজায় রাখতো, তাতে তার নিজেরই অবাক লাগতো মাঝে মাঝে। ভাবতো, উপায় কি, গেরস্থ ঘরের বৌ, সব কিছু সহ্য করার জন্যে জন্মেছি, সহ্য করে যেতেই হবে।

শ্যামলীর সঙ্গে দেখা হওয়ার দু-একদিন পরের কথা। পূজো উপলক্ষে কেনাকাটা করতে হাতের টাকা সব ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু সামনে খরচা অনেক। কমলেশকে বলেছিলো, এ মাসে আরো একশো টাকা বেশী দিতে। কমলেশ বলেছিলো চেষ্টা করবে। সকালে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল, কিন্তু

ফিরেও এলো সন্ধ্যার আগেই। সবিতা একটু অবাক হোলো। ভাবলো, বোধ হয় টাকার যোগাড় হয়েছে, তাই ফিরে এসেছে।

কমলেশ ডাকলো সবিতাকে। সবিতা চায়ের জল চড়িয়ে দিয়েছিলো। আঁচলে হাত পুঁছে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর এলো।

"শোনো, আজ বিরুপাক্ষ আর ওর বৌ চা খেতে আসছে।"

সবিতার হাতে আছে মাত্র পাঁচটা টাকা। আস্তে আস্তে বললো, "তোমায় যে আরো কিছু টাকা দিতে বলেছিলাম?"

"বলেছি তো চেষ্টা করবো।"

"এখনও পাওনি?"

"না।"

"তা হলে কি করে চলবে?"

"সে আমি কি করে জানি," কমলেশ তেড়ে উঠলো, "আগে আমি শুধু একলা রোজগার করতাম, সংসার মোটামুটি চলে যেতো। এখন তুমি রোজগার করছো, আমি রোজগার করছি, পুরোনো বাড়ির ভাড়া থেকে মাসে চল্লিশ টাকা করে আসছে, তবু চলে না। কি জানি বাবা কেন তোমার এই দরাজ হাত, ঝর্ণা হলে এর অর্ধেক টাকায় চালিয়ে নিতো।"

ঝর্ণার নাম না করলে হয়তো চুপচাপ শুনে যেতো সবিতা, কিন্তু এবার রেগে গেল। বললো, "বেশ তো, বোনকে ডাকিয়ে এনে তার হাতে সংসারের ভার তুলে দাও, আমি নিষ্কৃতি পাই। ও বাড়িতে বাড়ি ভাড়া দিতে হোতো না, পুলকেশ কম দিক বেশী দিক কিছু তো দিতো, তাছাড়া তোমার একটা বাঁধা রোজগার ছিলো। মাসের প্রথম দিকেই টাকাটা পাওয়া যেতো। জিনিস পত্তরের দামও এত বাড়েনি। এখন তো তা নয়।"

কমলেশ এবার গলাটা চড়ালো, "সারাদিন খেটেখুটে আসি, তারপরও একটু শান্তি নেই। আমার জন্যে কি তোমাদের একটুও দয়ামায়া হয় না? এ সময় এসব কথা না বললে নয়?"

"খেটেখুটে আমি আসি না?" সবিতার গলার পর্দাও চড়ে গেল, "আমার জন্যে তোমাদের কি দয়ামায়া হয় শুনি? স্কুল থেকে ফিরে আমাকে কথা শুনতে হয় না মায়ের কাছে? এক সময় তো খুব তড়পে বলেছিলে আমাদের বাড়ির বৌ চাকরি করতে যাবে কেন? এখন যে দুবেলার বাজারটাও আমাকে গিয়ে করে আনতে হচ্ছে, কই তাতে তো তোমার সম্মানে বাধছে না? সব কিছুর দায়িত্ব আমার, কথাও শুনতে হবে আমাকে, কেন শুনি?"

"কেন, কে আবার কি বললে তোমায়?"

"কে বলছে না? এই তুমি বসে ধমকালে, মা তো প্রত্যেক দিনই প্যানর-প্যানর করছে, কেন ছেলেটা এত রাত করে ফেরে, তুমি বৌ, তুমি তাকে সামলাও। আমি সামলাবার কে শুনি? ছেলে আপনার কি কচি খোকা? তুমি যা হয় মাকে বলে দাও যেন একথা আমায় প্রত্যেকদিন শুনতে না হয়।"

কমলেশের আরো রাগ হোলো। বললো, "তোমায় বলেইছি টিউশানি করতে হয়। এ মাসে প্রত্যেক টীচারই কিছু টাকা আগাম চেয়েছে। কোত্থেকে দিই বলো?"

"এত টীচার তা হলে রাখার কি দরকার? তুমি তো বলেছিলে শুধু রমলার সাহায্য হলেই চলবে। তাকে বেশী টাকা দিতে হবে না। তোমার ওস্তাদজীও তোমায় সাহায্য করবেন। ওঁরা সবাই কোথায়?"

"রমলা আমার স্কুলে আর কাজ করে না।"

"কেন?"

"ও দু-তিন মাস কাজ করেই ছেড়ে দিয়েছে।"

"কেন?"

"সে আমি কি করে বলবো?"

"যাই হোক, ওসব তোমার ব্যাপার। আমি জানতে চাই না। আমার কাছে শুধু পাঁচ টাকা আছে। আমাকে আরো টাকা না দিলে আমি এটা খরচা করে হাত খালি করতে পারবো না। তোমার বন্ধুকে শুধু এক কাপ্ চা খেয়েই যেতে হবে।"

কমলেশ আর কোনো কথা না বলে পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করলো। সেটা সবিতার হাতে দিয়ে বললো, "তোমায় বিয়ে করবার পর আমি আর একদিনও শান্তি পাইনি।"

"আমিও বা কি শান্তি পেয়েছি শুনি?" রাগে লাল হয়ে গেল সবিতা।

এমন সময় দরজার কড়া নড়ে উঠলো। কমলেশ গিয়ে দরজা খুলে দিলো।

"আরে তুমি? এসো।" বলে কমলেশ ফিরে, তাকালো বিরুপাক্ষের স্ত্রীর দিকে, "—আসুন,"। তারপর ডাকলো, "সবিতা, এদিকে এসো। বিরুপাক্ষ আর ওর স্ত্রী এসেছেন।

সবিতা মুখে হাসি টেনে এগিয়ে গেল। "আসুন, ভেতরে আসুন। আপনাদের কথা কতো শুনি ওঁর মুখে। ওঁকে কতোবার বলেছি আপনাদের আসতে বলতে—"

সৌজন্য আর লৌকিকতার ঝড় বইলো। সবিতা আর কমলেশকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে, একটু আগে ওদের মধ্যে কলহ হয়ে গেছে।

সবাই কমলেশের ঘরে এসে বসলো। খুব খোসগল্প হোলো অনেকক্ষণ। ওদের সামনে কমলেশ সবিতার সঙ্গে দু-একটা রসিকতা করলো।

"যাও, তুমি বড্ড ইয়ে—," বললো সবিতা, খুব মধুর কণ্ঠে, "তুমি সব সময় ওরকম করো যার তার সামনে—।"

বিরুপাক্ষ আর ওর স্ত্রী খুব উপভোগ করলো। ওর স্ত্রী বললো, "ওঁর মুখে সব সময় শুনি যে আপনাদের মধ্যে এত মনের মিল যে আজকাল ওরকম দেখাই যায় না। শুনছিলাম কমলেশ বাবুর যখন রোজগার বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো মাঝখানে, আপনি একাই সংসার চালানোর সমস্ত দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছিলেন। আপনাকে আমার খুব দেখবার ইচ্ছে অনেকদিন থেকে।"

কমলেশ বললো, "ওসব ওর সামনে বলবেন না। ও এখন তো খুব হাসি মুখে শুনছে, পরে রাত্রিবেলা আমার সঙ্গে ঝগড়া সুরু করবে, আর ওর পায়ে ধরে মান ভাঙাতে ভাঙাতে আমার রাত কাবার হয়ে যাবে।"

কমলেশের কথার ধরনে সবাই হেসে ফেললো।

"যাও, তুমি বড্ডো বাজে বকো," বলে সবিতা উঠে পড়লো চায়ের ব্যবস্থা করতে। রান্নাঘরে গিয়ে ভাবলো, হুঁ, পায়ে ধরে মান ভাঙাবেন উনি। ওঁর মাঝরাতের আসল রূপ যদি এরা দেখতে পেতো, তা হলে ভেবে অবাক হোতো সে লোকটা দিনের আলোয় এত অমায়িক, ভদ্র, সংযত, কৃষ্টিবান সাজতে পারে কি করে। এত কামনাতুর জানোয়ারও হতে পারে না। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর তাড়াতাড়ি বড্ড ঘুম পায় বলে কতোবার তাকে চড়চাপড়ও খেতে হয়েছে কমলেশের কাছে। কিন্তু এসব কথা অন্য লোকের জেনেই বা কী হবে। —একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো সবিতা।

ভাবলো, যাক দশটা টাকা পাওয়া গেছে। উপস্থিত এটাই লাভ।

— নয় —

শীত বসন্ত গ্রীষ্ম পেরিয়ে আবার বর্ষা এসে গেল। কখনো গুমোট গরম, কখনো আকাশে মেঘ, গুড়িগুড়ি বৃষ্টি, আর রাস্তায় জল কাদা।

একদিন গায়ে জ্বর নিয়ে বাড়ি ফিরলো কমলেশ। সবিতা রাত্তিরে বালি করে দিলো। মনে মনে ভাবলো, আজ রাত্তিরে একটু শান্তিতে ঘুমোনো যাবে।

একদিন দু-দিন তিনদিন কেটে গেল। সমানে জ্বর। কমলেশ বলেছিলো, ডাক্তার ডেকে কাজ নেই। একটু ফ্লু হয়েছে, তিনদিন পরে ঠিক হয়ে যাবে। চার দিনের দিনও জ্বর কমলোনা। তখন সবিতার দুশ্চিন্তা হোলো। কমলেশের কথা না শুনেই ডাক্তার ডেকে আনলো।

ডাক্তার এসে বললে,—নিউমোনিয়া।

অবস্থা বেশ গুরুতর হয়ে দাঁড়ালো। একদিন তো যমে-মানুষে টানাটানি। ফিজিশিয়ান ডাকানো হোলো। এদিকে মাসের শেষ, হাতে টাকা নেই। পুলকেশের খবর নেওয়া হোলো। সে কলকাতায় নেই, অফিসের কাজে বম্বে গেছে। নিশিকান্ত বাবু কিছু টাকা দিলেন। কিন্তু তাঁরও বেশী টাকা দেওয়ার মতো অবস্থা নয়। সবিতার বেশ কিছু গয়না বাঁধা পড়লো এক চেনা স্যাকরার দোকানে। দশটা দিন যে কি করে কেটে গেল সবিতা বুঝতেই পারলো না। সাহায্য করবার একটি লোক নেই। পুলকেশ কলকাতায় নেই, সবিতার ছোটো ভাই সমর শিবপুর থেকে এতটা আসতে পারে না ঘন ঘন, সরোজ চার্টার্ড একাউণ্টেন্সির শেষ পরীক্ষার পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত। নিশিকান্ত বাবু বাতের ব্যথা নিয়ে বেশী চলাফেরা করতে পারেন না, তরুবালা প্রত্যেকদিনই একবার করে ঘরে যায়, কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারেনা। ছেলের বৌ মঞ্জুশ্রী বড়লোকের মেয়ে, ঘরের কাজ বেশী দেখেনা। সংসারের যাবতীয় দায় দায়িত্ব এখনো তরুবালারই। আর আছে শাশুড়ী সাবিত্রী। বয়েস হয়েছে, তাই কোনো-রকমে দুজনের রান্নাটাই দেখে নেয় আর ছেলেকে সামলায়। বেশী কিছু করতে দেয় না সবিতা। ঝর্ণা তার সংসার নিয়ে ব্যস্ত। অসুখ যখন খুব বেশী শুধু তখনই বার দুয়েক এসেছিলো। একটু সেরে উঠতে আর আসেনি। ওর দাদার উপর ভীষণ অভিমান, দাদা তার বিয়েতে যায়নি।

সুতরাং ডাক্তার ডাকা, ওষুধ কেনা, ফল কেনা, পথ্যি তৈরী করা, সেবা-শুশ্রূষা পরিচর্যা করা,—এবং সব খরচাপাতির জন্যে টাকা যোগাড় করা সব একলাই করতে হয়েছে সবিতাকে।

দশ বারোদিন পরে কমলেশের জ্বর নেমে গেল।

একদিন সবিতাকে বললো,—"তুমি আমায় মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়ে এনেছো সবিতা, এ আমি কোনোদিনই ভুলবো না।"

"কী আজে বাজে কথা বলছো," সবিতা বললো।

"কিন্তু এত খরচা চলছে কি করে?"

"ওসব তোমায় ভাবতে হবে না।"

আর ঠিক এ সময়ই সুরু হোলো চেনাজানাদের আসাযাওয়া, খোঁজখবর নেওয়া। অসুখের সময় সবাই খবর পায়নি। অনেকে অনুযোগ করলো,—এতবড় একটা অসুখ গেল, কিন্তু আমরা একটিবার খবর পেলাম না।

সবিতা সহজভাবে বললো,—আমি একলা লোক, খবর কি করে দেবো বলুন?

পলকেশ ফিরে এসেছে। সে ছুটে এলো খবর পেয়ে। সবিতাকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, "কি রকম লোক তুমি? আমায় একটা টেলিগ্রাম করে দিতে। আচ্ছা শোনো, টাকা দরকার? সঙ্গে শ-দুয়েক টাকা আছে এটা রেখে দাও। কাল পরশু দেখি যদি আরো কিছু এনে দিতে পারি।"

"না ভাই, আর টাকার দরকার নেই," সবিতা সহজ ভাবে বললো।

সরোজ এলো মঞ্জুশ্রীকে নিয়ে। বোনের বাড়ি সে আসেই না বড় একটা। মঞ্জুশ্রী এলো খুব সাজগোজ করে, যেন একটা পার্টিতে এসেছে।

সরোজ জিজ্ঞেস করলো, "তোর বৌদিকে কিছুদিন রাখবো তোর এখানে? কাজে কর্মে একটু সাহায্য হবে।"

"না দাদা, আর দরকার নেই," খুব সহজ হাসি হেসে সবিতা উত্তর দিলো।

একদিন বাণী আর শ্যামলী এলো। তারপর একদিন এলো অঞ্জলী বৌদি। বড্ড বুড়োটে হয়ে গেছে ওর চেহারা। ওর স্বামী একটু সেরে উঠেছে, কিন্তু এখনো কাজে বেরোবার শক্তি হয়নি।

তারপর এলো রমলা।

রমলা যখন এলো তখন বেলা পড়ে গেছে। কিছুক্ষণ আগে মেয়েদের হাইস্কুলের বাস এসে নামিয়ে দিয়ে গেছে সামনের বাড়ির বাচ্চা মেয়েকে।

কমলেশের আর জ্বর নেই। কিন্তু এখনো দুর্বল। বিছানা ছেড়ে ওঠেনা বড়ো একটা।

সবিতা তখন সবে মাত্র হরলিক্‌স্‌ খাইয়েছে কমলেশকে। কলতলায় এঁটো কাপ ধুয়ে দিচ্ছিলো, এমন সময় দরজার কড়া নড়ে উঠলো। সবিতা দরজা খুলে দেখে রমলা। সে খুব সাধারণ ভাবেই বললো, "ভালো আছেন সবিতা-দি? কমলেশ-দাকে দেখতে এলাম। কেমন আছেন উনি। আমি মোটে কাল শুনতে পেলাম যে ওঁর অসুখ।"

সবিতা রমলাকে ভেতরে নিয়ে এলো। রমলা খুব সহজভাবে কথা বললেও ওর চোখের উদ্বিগ্ন ভাব তার চোখ এড়ায় নি।

রমলা খাটের কাছে একটি মোড়া টেনে নিয়ে বসলো। কমলেশের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হোলো। তাও লক্ষ্য করলো সবিতা।

"ও, তুমি এলে?" বললো কমলেশ, "সময় হোলো এ্যাদ্দিনে?"

"আমি মোটে কাল শুনতে পেলাম। আপনি তো কই আমায় খবর দিলেন না একটি বার।"

উত্তর দিলো সবিতাই, "আমি ছাড়া আর তো কেউ ছিলো না। কাউকেই খবর দেওয়ার সুবিধে হয়নি।"

"থাক, সেরে তো উঠেছি," হাঁসলো কমলেশ।

"সেরে না উঠলে চলবে কেন," রমলা বললো।

"সবিতা, একটু চা করে দাও রমলাকে।"

সবিতা রমলার দিকে তাকালো। সাধারণত লোকে এসময় যা বলে,—না, না, থাক, আবার চা কেন, আমি চা খেয়ে এসেছি,—এসব কিছুই বললো না রমলা। সে চুপ করে রইলো।

সবিতা বুঝলো তাকে এরা সরিয়ে দিতে চায় কিছুক্ষণের জন্যে। সে গায়ে মাখলো না, সহজভাবেই হেসে বললো, "আচ্ছা, আপনি ওঁর সঙ্গে গল্প করুন, আমি চা করে নিয়ে আসছি।"

চায়ের সঙ্গে একটি ওমলেটও তৈরী করলো সবিতা। ট্রেতে সাজিয়ে আনছিলো সে। দরজার কাছে এসে থেমে গেল। পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলো, রমলা কমলেশের চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

কমলেশ কথা বলছিলো একটু নিচু গলায়। কিন্তু কথাগুলো পরিষ্কার কানে এলো সবিতার।

"ছেলেমানুষী কোরো না রমলা। নাও, চোখ মুছে নাও। সবিতা এক্ষুনি এসে পড়বে।"

"তুমি জানো না, কাল খবরটা শোনা অবধি আমার মন কি রকম করছিলো। কেন আমি আগে খবর পেলাম না। তুমি তিনচার দিন আসছো না দেখেই আমার খবর নেওয়া উচিত ছিলো। কী পাপ আমি করেছিলাম আগের জন্মে যে তোমার এত বড়ো একটা অসুখে তোমার সেবা করতে পারলাম না। আমায় কেন ডাকিয়ে নিলে না? সবিতা-দি কিছু জানতে পেতো না। আমি বাড়ির ঝিয়ের মতো কাজ করতাম। শুধু দরজার বাইরে থেকে দেখে যেতাম। আমি কি তোমার নোংরা কাপড়, বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদরও ধুতে পারতাম না?"

"সেরে উঠলে পরে যখন তোমার বাড়ি যাবো তখন মনের সুখে আমার সেবা কোরো। আর কাঁদে না। চোখ মোছো। সবিতা এসে পড়বে এক্ষুনি।"

ওরা টের পায়নি যে সবিতা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলো। সে আস্তে আস্তে ফিরে গেল রান্না ঘরে। তারপর দু একবার সাড়া দিয়ে শাশুড়িকে ডেকে ছেলেকে বকে, নিজের সান্নিধ্যের বার্তা ঘোষণা করে চা নিয়ে ঘরেব ভিতর এলো।

রমলা তখন খুব সহজ ভাবে গল্প করছে কমলেশের সঙ্গে।

কোনোরকম ভাব পরিবর্তন দেখা গেল না সবিতার মুখের উপর। সে মিষ্টি গলায় বললো, "একটু চা খেয়ে নিন— ,।"

তখন রমলা বলে উঠলো, "এসব আবার কেন করতে গেলেন সবিতাদি?"

সবিতা কোনো উত্তর দিলো না, শুধু একটু হাসলো। মনে মনে বললো, —ন্যাকা!

তারপর দিন রমলা আবার এলো। কোলে তার আট নয় মাসের একটি বাচ্চা মেয়ে। ভারী ফুটফুটে দেখতে।

"এ আবার কে?" সবিতা হেসে জিজ্ঞেস করলো। কিন্তু তার মন জ্বলতে সুরু করেছে তখন।

"আমার এক বন্ধুর মেয়ে। সে একে রাখতে পারে না বলে আমিই এর দেখাশোনা করার ভার নিয়েছি।"

"দেখা শোনা করতে পারে না? কেন?"

রমলা মেয়েটির গাল টিপে আদর করে বললো, "ওদের অবস্থা খুব খারাপ। মাও খুব রুগ্ন। আমি একে একরকম পুষ্যি নিয়েছি বলতে পারেন। কাল ঝিয়ের কাছে রেখে এসেছিলাম। আজ ঝি ওর কোন এক দেশের লোকের সঙ্গে দেখা করতে গেছে বলে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম।"

কমলেশ বাচ্চা মেয়েটিকে কোলে টেনে নিলো। সবিতা চুপচাপ লক্ষ্য করলো।

সাবিত্রী এক সময় সবিতাকে বাইরে পেয়ে বললো, "রমলা আবার যাওয়া আসা স্বরু করছে কেন? ওকে এ বাড়িতে ঢুকতে না দেওয়া উচিত।"

সবিতা খুব প্রশান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে উত্তর দিলো, "অসুস্থ লোককে দেখতে এসেছে, আমি মানা করতে যাবো কেন? ওরকম অন্যায় কাজ আমাকে দিয়ে হবে না।"

রমলা যখন চলে যাচ্ছিলো, সবিতা তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে হঠাৎ বললো, "আচ্ছা, আমায় আপনার ঠিকানা দেবেন? আগে জানতাম না বলে খবর দিতে পারিনি। এখন যদি কোনো সময় দরকার হয় তো আপনাকে খবর দিতে পারবো। অবশ্যি আপনার যদি কোনো অসুবিধে না হয়—।"

"না, না, অসুবিধে কিসের? আপনাদের কাজে লাগতে পারলে আমি খুবই খুশী হবো।"

একটি স্লিপ-কাগজে ঠিকানা লিখে দিয়ে রমলা চলে গেল। সবিতা দোর গোড়ায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। জ্বরের ঘোরে কমলেশ অনেক কিছু প্রলাপ বকেছিলো। তাই আবার মনে পড়ে গেল সবিতার।

সেণ্ট্র্যাল এ্যাভিনিউর উপর একটা ফ্ল্যাট বাড়ির দোতলায় থাকতো রমলা। কাছাকাছি অঞ্চলটা ভালো নয়।

ওর বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমে সবিতা একটু ইতঃস্তত করলো, যাবে কি যাবে না? সঙ্গে ঝিকে এনেছিলো। তাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে প্রবেশ পথের মুখে দাঁড়িয়ে কি যেন একটু ভাবলো।

একতলার এককোনে একটি পানের দোকান। পানওয়ালা প্রচুর কৌতু-হলের সঙ্গে নিরীক্ষণ করলো সবিতাকে। সবিতা লক্ষ্য করলো পানওয়ালার দৃষ্টি। সে গম্ভীর ভাবে নিঃসঙ্কোচে ভেতরে ঢুঁকে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো।

সবিতা দেখলো সব ঘরগুলোই খোলা। দু-একটি মেয়ে এখানে সেখানে বসে জটলা করছে। তাদের দৃষ্টি একটু রুক্ষ, বড়ো তীক্ষ্ণ। সবিতাকে দেখে ওরা গল্প করা থামিয়ে ওকে দেখতে লাগলো।

প্রায় সব ঘরেই ফরাস পাতা, ভালো আসবাবপত্তর।

এ কোথায় এসে পড়লাম, কেনই বা এলাম,—সবিতা ভাবলো। কিন্তু থামলো না। এগোতে লাগলো বারান্দা ধরে।

রমলার তিনটে ঘরের একটি ফ্ল্যাট। সে ফরাসের উপর বসে সেতার বাজাচ্ছিলো। তার সঙ্গে তবলা সঙ্গত করছিলো একজন পশ্চিমা তবলচি।

সবিতা ঘরে ঢুকলো।

"ওমা, আপনি!" সবিতাকে দেখে রমলা অবাক। তারপরই তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, "কমলেশ-দা ভালো আছে তো?"

"হ্যাঁ, ভালো আছেন। আমি শ্যামবাজারের ওদিকটায় এসেছিলাম একটু কাজে। যাওয়ার পথে ভাবলাম আপনাকে দেখে যাই।"

"আমায় আপনি করে কেন বলছেন দিদি?"

"তাই ভালো," সবিতা গম্ভীর ভাবে বললো।

রমলা চুপ করে রইলো।

ঘরের চারদিকে তাকালো। দেখলো এককোনে একটি ছবি—রমলা ও কমলেশ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, রমলার কোলে সেই বাচ্চা মেয়েটি।

"বসুন দিদি।"

সবিতা বসলো। উঠে চলে গেল সেই তবলচি। সবিতা খুব সহজ ভাবে জিজ্ঞেস করলো, "উনি আপনার এখান থেকে এত দেরি করে ফেরেন কেন? ফিরতে তো রাত দশটা সাড়ে দশটা বেজে যায়।"

রমলা কুণ্ঠিত হোলো একটু। সেও সহজ ভাবে উত্তর দিলো, "দুজনে একসঙ্গে বসে রেওয়াজ করি। সময়ের খেয়াল থাকে না। এক এক সময় আমি অবিশ্যি খুব তাড়া দিই। কিন্তু উনি কানেই তোলেন না।"

একটু চুপ করে থেকে বললো, "আপনি যে সব বুঝে গেছেন সেটা আমি সেদিনই টের পেয়েছি আপনার মুখ দেখে। এ যে হবে আমি জানতাম। কদ্দিন আর চেপে রাখা যায়?"

সবিতা হাসলো, "আপনি তো খুব সহজ ভাবে বলছেন? আপনার কোনো রকম কুণ্ঠা আসছে না?"

রমলার কণ্ঠ হঠাৎ দৃপ্ত হোলো। বললো, "কুণ্ঠা হবে কেন? ঠিকই করি বা অন্যায়ই করি মিছে কথা তো বলছি না। যা সত্য তাকে অস্বীকার করবো কেন?"

সবিতা বললো, "না ভাই, আপনাকে আমি কোনো দোষ দিচ্ছি না। আমি শুধু ভাবছি ওঁর পক্ষে সম্ভব হোলো কি করে?"

রমলা উত্তর দিলো, "সামাজিক বাধা না থাকলে উনি আমায় নিশ্চয়ই বিয়ে করতেন। কিন্তু সে বাধা তুচ্ছ করবার মতো জোর ওঁর ছিলো না। আমি আক্ষেপ করি নি। আমি ওঁকে ভালোবাসি, ওঁর ভালোবাসাও পেয়েছি,

তবে কিছু জোর করে নিইনি, ছলনা করেও নিইনি। উনি যেটুকু দিয়েছেন, তাইতেই ধন্য মনে করেছি নিজেকে।''

''কিন্তু উনি তো আপনাকে স্ত্রীর সম্মান দেননি ?''

''আমিতো ওঁকে মনে মনে স্বামী বলে মেনেছি। আমার জন্যে সেটুকুই যথেষ্ট।''

''কিন্তু অবিচার তো হয়েছে আমার উপর,'' বলে সবিতা মৃদু হাসলো।

''আমি আপনার উপর কোনো অবিচার করিনি দিদি,'' বললো রমলা, ''আমি জানি যে আপনাদের মধ্যে কোনো ভালোবাসা নেই। অন্তত আপনি ওঁকে ভালোবাসেন এটুকুও যদি আমি বুঝবার কারণ পেতাম, আমি ওঁকে আমার ছায়াও মাড়াতে দিতাম না।''

এমন সময় সেই বাচ্চা মেয়েটি হামাগুড়ি দিয়ে এলো ঘরের ভিতর। অপরিচিত মুখ দেখে সামনে এসে চোখ মেলে তাকালো।

সবিতা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, ''আচ্ছা, সত্যি কথা বলুন তো, এ কার মেয়ে ?''

রমলা স্থির দৃষ্টিতে তাকালো সবিতার দিকে। উত্তর দিলো, ''আপনার কাছে মিছে কথা বলবো না। এ আমার মেয়ে, কমলেশ বাবুর মেয়ে।''

সবিতা আস্তে আস্তে বললো, ''আপনার উপর রাগ করতে পারলে খুশী হতাম। কিন্তু সে জায়গায় বরং শ্রদ্ধাই হচ্ছে। এই মনের জোর পেলেন কোথায় ?''

''আমার ভালোবাসার মধ্যে। সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করলে মনে সত্যি একটা জোর পাওয়া যায়।''

সবিতা একটু আনমনা হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বললো, ''ঠিকই বলেছেন। আমাদের বেশির ভাগ মনের দুর্বলতার কারণ সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করতে চাইনা বলে। আমরা ভয় পাই, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে একটা আপোষ করি, তারপর সারা জীবন তার খেশারত দিয়ে যাই।''

বলতে বলতে বাচ্চা মেয়েটিকে বুকে টেনে নিলো সবিতা। হঠাৎ তার গলা ধরে গেল। বলে উঠলো, ''কিন্তু এই মেয়েটি কি দোষ করলো যে এ কোনোদিন পিতৃপরিচয় দিতে পারবে না!''

রমলা খুব উজ্জ্বল মুখে উত্তর দিলো, ''ও পিতৃপরিচয় ঠিকই দেবে। আমি ওকে অন্যরকম ভাবে মানুষ করবো। ওকে দিয়ে ওর বাপের বংশের কোনো অমর্যদা হবে না, ওরা জানুক বা নাই জানুক।''

একটু পরে সবিতা উঠে পড়লো। তাকে নিচে অবধি এগিয়ে দিলো রমলা। হঠাৎ একটা প্রণাম করে বললো, "দিদি—"

"দিদি নয়, সবিতা-দি," একটু গম্ভীর হয়ে সবিতা বললো।

রমলা হাসলো, "আচ্ছা তাই। সবিতা-দি, একটা কথা বলবো। আমার খুব ভাগ্যি যে আমি ওঁকে ভালোবাসতে পেরেছি, কিন্তু ওঁর খুব দুর্ভাগ্য যে আপনি ওঁকে ভালোবাসতে পারেন নি। আপনার ভালোবাসা যে পাবে, তার জন্যে নারায়ণের বৈকুণ্ঠেরও প্রয়োজন হবে না।"

সবিতা চুপ করে শুনলো।

"সবিতা-দি, আমার মন বলছে, আপনার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না। কারণ আমি আর ও-বাড়ি যাবো না। তাই আপনাকে যখন আজ একদিনের জন্যে পেলাম, এত তাড়াতাড়ি ছাড়তে ইচ্ছে করছে না।"

"আমার তো থাকবার উপায় নেই। আমায় যেতে হবে।"

"শুধু কি সন্দেহটা যাচাই করে নেবার জন্যেই এসেছিলেন? আপনার দ্বারা তো এটা সম্ভব নয়।"

"না ভাই, আমি এসেছিলাম আপনার সংসারে আপনাকে দেখতে। আমার নিজের অবস্থা আমার কর্তব্য সম্বন্ধে চোখ খুলে গেছে। আমি এসেছিলাম শুধু আমার নিজের মনকে পরিষ্কার করে বুঝে নিতে। যদি আমার রাগ হোতো, ঈর্ষা হোতো, বিদ্বেষ হোতো, বুঝে নিতাম যে আমার মন অসত্যের পাঁকে ডুবে আছে। কিন্তু সে যখন হোলো না, তখন মনে দৃঢ় বিশ্বাস এসে গেছে যে আমার পথ আমি খুঁজে পাবো, জীবনে আর ভুল করবো না।"

"সত্যি, আমাদের আর দেখা হবে না সবিতা-দি?"

"না ভাই, আর দেখা হবে না।"

রমলা সবিতার পা ছুঁয়ে বললো, "যাওয়ার আগে তাহলে আমায় এই আশীর্বাদ করে যান দিদি, আমার ভালোবাসা যেন কাউকে ছোটো না করে।"

সেদিন শনিবার অপরাহ্ণ। সারা সকাল বৃষ্টি হওয়ার পর দুপুরে খুব স্নিগ্ধ ফুটফুটে রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়েছে সারা শহর ভরে।

শ্যামলী সকাল সকাল অফিস থেকে বাড়ি ফিরে যাকে দেখলো, তাকে সে একেবারে প্রত্যাশা করে নি।

"আরে বিদ্যুত বাবু, আপনি? ফিরলেন কবে?"

"কাল।"

"কিছু খবরও দেন নি।"

"এসে খুব অবাক করে দেবো বলেই খবর দিইনি।"

"পড়াশুনো শেষ ?"

"হ্যাঁ, লণ্ডনের পি-এচ্-ডি হয়ে ফিরলাম।"

শ্যামলী জামাকাপড় পাল্টে চা করতে বসলো। খানকয়েক লুচি ভেজে চা হাতে করে যখন ফিরে এলো ওর মা তখন গল্প করছে বিদ্যুতের সঙ্গে। শ্যামলী চা নিয়ে আসবার পর ওর মা উঠে চলে গেল।

কিছুক্ষণ সাধারণ গল্পসল্প করার পর বিদ্যুত বললো, "মাস খানেক ধরে একটা কথা ভাবছিলাম। শেষ পর্যন্ত স্থির করলাম, আর দেরি করবো না, ফিরে এসেই আপনাকে বলবো।"

"কি কথা ?" শ্যামলী হেসে জিজ্ঞেস করলো।

"আসল কথাটা বলবার আগে আরেকটা কথা বলে নিই। আমার কথা শুনে রাগ করবেন না। আপনার যদি ভালো না লাগে পরিষ্কার বলে দেবেন। তখন কথাটা আমিও ভুলে যাবো, আপনিও ভুলে যাবেন। আমাদের বন্ধুত্ব অক্ষুন্ন থাকবে চিরকাল। আপনাকে খুব বন্ধু মনে করি বলেই মন খুলে কথাটা বলছি আপনাকে।"

শ্যামলী মেয়ে। সে যে বুঝলো না, তা নয়, তবে একটু অবাক হোলো। বিদ্যুতের মুখে অকস্মাৎ এ রকম সংলাপ সে আশা করেনি।

"হ্যাঁ, বলুন," বললো সে।

বিদ্যুত চুপ করে রইলো দু-এক মুহূর্ত। তারপর বললো, "আচ্ছা, আমি যদি আপনাকে বিয়ে করে সংসার করতে চাই সে কি খুব দুরাশা বলে বলবেন ?"

কথাটা শুনে শ্যামলী প্রথমটা কিছু বললো না। তারপর আস্তে আস্তে বললো, "আমরা ব্রাহ্মণ। আপনারা কায়েত। একথা কি আপনি একবার ভেবে দেখেছেন ?"

বিদ্যুতের মুখ ম্লান হোলো। "আমায় মাপ করবেন," সে উত্তর দিলো, "এ কথা সত্যি আমার মাথায় আসেনি। কে কোন জাত সে হুঁশ আজকালকার দিনে কারোই হুঁশ থাকে না। বিয়ের কথায় ছাড়া আর কখনো এ প্রশ্ন কারো মাথায় ওঠেও না। আমি একথা ভাবিনি, আমি শুধু ভেবেছি, আমরা মানুষ, আমরা বন্ধু, অনেকদিনের অনেক সুখদুঃখের বন্ধু। তাই ওকথা বলেছি। আপনি অন্ত্যজ হলেও আমি আপনার কাছে বিয়ের কথা বলতে দ্বিধা করতাম না। তবে আমি না ভাবলেও আপনি যে জাতের প্রশ্নে গুরুত্ব দিতে পারেন, এটা আমার খেয়াল ছিলো না। আমায় মাপ করবেন।"

বেদনাহত শোনালো শ্যামলীর কণ্ঠ। "আমি এমনি বলেছি, বিদ্যুত বাবু, আমার কথায় কিছু মনে করবেন না। আমিও ওই প্রশ্নকে গুরুত্ব দিই না। লোকে কেন আজকালকার দিনেও এসব তোলে আমি বুঝি না। যাই হোক, আপনাকে শুধু একথাই বলতে চাইছিলাম যে, আপনার কথায় যদি রাজী না হই, তাহলে তার যে কারণই থাক, এই জাতিভেদটা তার কারণ বিন্দুমাত্রও নয়।"

"তাহলে ?"

"আপনি আমায় কেন বিয়ে করতে চাইছেন ? আপনার মতো ছেলের জন্যে এদেশে সুপাত্রীর অভাব হবে না।"

"সত্যি কথা বলবো ? কিছু মনে করবেন না ?"

"না, বলুন।"

"যে ভাবে আর দশজনের বিয়ে হয়, সে ভাবে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয়, সেকথা আপনি জানেন। ওসব অচেনা অজানা মেয়েকে বিয়ে করে কোনোদিন তার প্রতি স্বামীর কর্তব্য আমি করতে পারবো না, অনর্থক সে সারাজীবন কষ্ট পাবে। অথচ সারাজীবন একলা থাকবো, সেটা ভাবতেও ভয় করছে। আপনি তো জানেন, আমার মন বড্ড নির্ভরশীল, নিজের জোরে দাঁড়াতে পারেনা, কাউকে অবলম্বন করে বাঁচতে চায়। এমন কাউকে যাকে আমি চিনি, বিশ্বাস করতে পারি, নিশ্চিন্ত হয়ে নিজেকে তার হাতে সঁপে দিতে পারি। সবিতার কথা আমি মন থেকে মুছে দিতে পারবো না, তবে তাকে পেলাম না এই দুঃখটাই যদি জীবনে বড়ো করে তুলি অন্য সব প্রশ্নের চাইতে, তবে সেটা অত্যন্ত অবিচার হবে সবিতার প্রতি।"

শ্যামলী একটু অবাক হয়ে তাকালো বিদ্যুতের দিকে। একটু অদ্ভুতভাবে কথাটা বলছে বিদ্যুত, কিন্তু একথা শ্যামলী বুঝতে পারলো যে, ওর কথায় কোথাও নিজেকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা নেই। যা বলছে, খুব সরলভাবেই বলছে।

বিদ্যুত বলে গেল, "আপনি আমার খুব বন্ধু। আমাকেও আপনার বন্ধু বলে মানেন। আপনাকে ছাড়া আমি আর কাকে চাইবো বলুন। ভালোবেসে সংসার করা আপনার জীবনেও হবে না, আমার জীবনেও হবে না। সুতরাং গভীর বন্ধুত্ব নিয়েই সংসার সুরু করিনা কেন। তারপর সংসারের সমস্ত সুখদুঃখ আনন্দ বেদনার ভাগ নিতে নিতে হয়তো একদিন দুজনে দুজনকে খুব ভালোবাসবো। আমায় বিশ্বাস করুন, জীবন আমাদের ফাঁকি দেবে না।"

শ্যামলীর চোখে জল এলো। হায় ভগবান, এই গাধাটা তার মনের খবর যদি জানতো! একটু মুখ নিচু করলো সে। খুব নরম গলায় বললো, "আমায় দু-দিন ভাববার সময় দিন।"

শনিবার রাত, রবিবার রাত, প্রায় দুটো আড়াইটে অবধি জেগে রান্নাঘরের পাশের বারান্দায় বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবলো। একি সমস্যা এলো জীবনে! শ্যামলী বললো নিজের মনে,—যাকে এত ভালোবাসি, সে এসে আমার হাতের মালা চাইছে, কিন্তু ভালোবাসে একথাটি বলতে পারছে না, শুধু বলতে চাইছে যে তার ভালোবাসা চাই, বন্ধুকে স্ত্রীর মতো চাইছে স্ত্রীকেই জীবনের সবচেয়ে বড়ো বন্ধু হিসেবে পাওয়ার জন্যে। কি আমার কর্তব্য এখন?

অনেকক্ষণ ভাবলো শ্যামলী, বন্ধুর জন্যে এটুকু করতে পারবো না? কিন্তু এত দাম বন্ধুত্বের?

তারপর এক সময় ভাবলো,—আচ্ছা, তাকে আমি তো ভালোবাসি। যাকে ভালোবাসি তার জন্যে এটুকু করতে পারবো না?

মন অমনি হাল্কা হয়ে গেল।

বিদ্যুত আবার এলো সোমবার বিকেলে। শ্যামলী তার সঙ্গে মায়ের কাছে বসে বললো, "মা, আমি বিদ্যুতকে বিয়ে করবো।"

মায়ের কোনো আপত্তি ছিলো না। কিন্তু শ্যামলীর বাবা শুনে ক্ষেপে উঠলো। তাকে বোঝালো শ্যামলীর মা।

"দেখ, বিদ্যুত এত বড় পণ্ডিত ছেলে, বিলেত থেকে ডিগ্রী নিয়ে ফিরেছে, নিজের প্রচুর পয়সা, কাজও পাবে খুব বড়ো, এরকম ছেলে তুমি আমাদের সমাজ থেকে যোগাড় করতে পারবে তোমার মেয়ের জন্যে? মেয়ে নিজে বলছে বিয়ে করবে বিদ্যুতকে। ওকে বিয়ে করতে না দিলে ও তো আর কাউকে বিয়ে করবে না কোনোদিন। তুমি কি এই চাও যে তোমার একটা মিথ্যে জাতের দম্ভের জন্যে তোমার মেয়ের ভবিষ্যত, মেয়ের সুখ সব নষ্ট হবে?"

"এরকম যে হবে, তা আমি আগেই জানতাম। আমি বলিনি তোমায়," বললো অবিনাশ ভট্টচার্য।

শ্যামলীর মা বললো, "মেয়ে বড়ো হয়েছে, স্বাধীনভাবে রোজগার করছে, সংসার চালাচ্ছে, তুমি মানা করলে যদি না শোনে। যদি কোর্টে গিয়ে বিয়ে করে, তোমার মুখ কি থাকবে শুনি?"

"কিন্তু আমি সায় দিই কি করে বলো? ভটচাযের মেয়ে বিয়ে করবে কায়েতকে?"

"দেখ, ওসব কথা ছাড়ো," বললো শ্যামলীর মা। স্বামী কোন যুক্তি বুঝবে সেটা সে জানতো। "বিদ্যুতের মা বাবা নেই। আমাদের ছেলে নেই। ওর সঙ্গে বিয়ে দিলে তো মেয়ে আমাদের চোখের আড়াল হবে না। তোমায় আমায় কে দেখবে বুড়ো বয়েসে? যদি দেখে তো বিদ্যুত দেখবে। অন্য কোনো জামাই নিজেও দেখবে না, মেয়েকেও দেখতে দেবেনা। দশজন লোকের সংসারে শ্বশুর শাশুড়িকে দেখা চারটি খানি কথা নয়।"

এই যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করলো অবিনাশ ভট্টচার্য। রাজী হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত।

কমলেশ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলো মাসখানেকের মধ্যে। একটু একটু করে বেরোতে সুরু করলো। প্রথম দিকে রোজগার খুব বেশী ছিলো না। সবিতাই চালিয়ে নিলো অভাবগ্রস্ত সংসার।

আস্তে আস্তে আবার আগের রোজগার ফিরে এলো। সবিতার ভার কমলো।

এই কদিন কমলেশ সকাল করেই ফিরতো। একদিন ফিরতে একটু দেরি হোলো।

সবিতা দেখলো কমলেশ খুব মুখভার করে রয়েছে। এতদিন এই দিনটারই প্রতীক্ষা করেছিলো সবিতা। আজ একটু নিশ্চিন্ত বোধ করলো। কমলেশ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে। এবার বোঝাপড়া করা যাবে।

রাত্তিরে সবিতা যখন শুতে এলো, কমলেশ বললো, "তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

"বলো।" সবিতা বসলো একটি চেয়ারে।

"রমলা বললো, তুমি ওর বাড়িতে একদিন গিয়েছিলে।"

"হ্যাঁ।"

"সব জানো তাহলে?"

"হ্যাঁ।"

কমলেশ একটু আশ্বস্ত বোধ করলো। তার ভয় ছিলো সবিতা রাগারাগি করবে, ঝগড়া করবে। সবিতার শান্ত ভাব দেখে সে একটু নিশ্চিন্ত হোলো। বললো, "দেখ সবিতা, আমার অন্য কোনো উপায় ছিলো না।"

"আমি তো কোনো নালিশ জানাইনি," সবিতা শান্ত কণ্ঠে বললো।

"তা হলে এই অবস্থা মেনে নিতে তোমার কষ্ট হবে না ?"

"কষ্টের প্রশ্ন হচ্ছে না। কিন্তু আমি মেনে নেবো না।"

কমলেশ অবাক হয়ে তাকালো, "তা হলে ?"

"কেন মেনে নেবো ? আমি কি সেকালে জমিদার বাড়ির অসহায়া বধূ যে স্বামীর একজন রক্ষিতা আছে বলে সহজ মনে স্বীকার করে নেবো ? ছিঃ, ওরকম একটি ভালো মেয়েকে রক্ষিতা বলতে আমার নিজেকেই ছোটো মনে হচ্ছে।"

"আর অন্য উপায় কি বলো ? তুমি যদি বলো আমি রমলার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছাড়তেও রাজী আছি। তুমি আমার জন্যে যা করেছো, তার যে কোনো প্রতিদান দিতে আমি প্রস্তুত।"

সবিতা রেগে গেল। বললো, "প্রতিদান আমার দরকার নেই। আমি যা করেছি, নিজের কর্তব্য বলে করেছি। ভালোবাসার জন্যে করিনি।"

"তাহলে আমায় কি করতে বলো।"

"তুমি রমলাকে বিয়ে করো। ওর সন্তানের প্রতি তোমার একটা কর্তব্য আছে।"

"কি বলছো তুমি," কমলেশ অবাক হয়ে সবিতার দিকে তাকালো, "কি করে সেটা সম্ভব ? আইন তো আমায় আরেকটি বিয়ে করতে দেবে না, এক স্ত্রী বর্তমান থাকতে ?"

"আইনের বাধা যাতে না হয়, সে ব্যবস্থা আমি করে দেবো। তোমার প্রতি এটা আমার শেষ কর্তব্য।"

"মানে ? কি করবে তুমি ?"

"আমি এখান থেকে চলে যাবো ?"

"কোথায় যাবে ?"

"যেখানে হোক যাবো। সেটা তোমার ভাবনা নয়। আমি নিজে রোজগার করি। আমার আর আমার ছেলের খাওয়াপরার ব্যবস্থা আমি করতে পারবো। আর কোনো জায়গা না থাক আমার বাপের বাড়ি আছে তো।"

"সেখানে গিয়ে উঠবে ?"

"তাই তো ঠিক করেছি।"

"তারপর ?"

"তারপর কোর্টে ডিভোর্সের স্যুট ফাইল করবো।"

সবিতা এত সহজ, এত শান্ত ভাবে, কথাটা বললো যে, এর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম

করতে সময় লাগলো কমলেশের। যখন বুঝলো, তার বিস্ময়ের সীমা রইলো না। সে বলে উঠলো, "তুমি হিন্দু ঘরের মেয়ে হয়ে একথা বলছো ? অগ্নি-সাক্ষী করে তুমি আমায় বিয়ে করো নি ?"

"ওসব তর্ক আমি করবো না," সবিতা বললো, সিদ্ধান্ত আমি বেশ কিছুদিন আগেই নিয়েছি। তর্ক করে কোনো লাভ নেই। আইন হিন্দু নারীকে যে অধিকার দিয়েছে, তারই জোরে করবো যা করবার।"

কমলেশ মাথায় হাত দিয়ে বসলো। আস্তে আস্তে বললো, "কি দিনকাল পড়েছে! কতো কি দেখতে হোলো আমায়! আমার বোন, হিন্দু ঘরে নিষ্ঠাবতী বিধবা, সে আবার বিয়ে করলো, তাও অত্যন্ত নিচু জাতে। আমার ভাই বিয়ে করলো পাঞ্জাবি মেয়ে। আমার স্ত্রী, সে বলছে ডিভোর্স করবো। আরো কতো কি দেখতে হবে কে জানে ?"

সবিতা বাঁকা হাসি হেসে বললো, "আর নিজে যে অজ্ঞাতকুলশীলা কুমারী কন্যার গর্ভে অবৈধ সন্তান উৎপাদন করলে, নিজের স্ত্রী যখন খেটে রোজগার করে সংসার চালাচ্ছে, তখন পীরিত করতে গেলে অন্য এক মেয়ের সঙ্গে, নিজের সংসারে একশো দেড়শো বেশী টাকা দিতে চাওনি কোনো দিন, অথচ নিজের রক্ষিতা নারীকে মাসে তিনশো টাকা করে দিয়ে এসেছো,—এসব হিসেব করছো না কেন ?—আমি রমলার কোনো অসম্মান করতে চাই না, ওকে আমি শ্রদ্ধা করতে শিখেছি, কিন্তু বাস্তব সত্যটা সাদামাটা কথায় না বলে আমার উপায় কি বলো।"

কমলেশ হঠাৎ হাতজোড় করে বললো, "আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে সবিতা, আমায় ক্ষমা করো। এরকম আর হবে না। আমি রমলার সঙ্গে কোনো সংশ্রব রাখবো না। তুমি ওরকম ভাবে চলে গেলে আমি সমাজে মুখ দেখাতে পারবো না।"

সবিতা খুব কঠিন কণ্ঠে বললো, "তোমার সমাজে মুখ দেখানোর কথা ভেবে তো আমি চুপ করে থাকতে পারবো না। রমলার প্রতি তোমায় কোনো অবিচার করতে দেবো না, আমার নিজের প্রতিও আর কোনো অবিচার আমি করবো না।"

"তোমার নিজের প্রতি অবিচার ?"

"হ্যাঁ। ভুল আমারই হয়েছে। একটা তুচ্ছ আত্মাভিমানের বশে আমি পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে রফা করতে চেয়েছিলাম। সেটাই আমার ভুল হয়েছে। একদিন একজনকে ভালোবেসে, চাঁদকে সাক্ষী রেখে মালাবদল

করে তাকে বিয়ে করেছিলাম। সেটাকে সত্য বলে না মেনে বিয়ের একটা সামাজিক অনুষ্ঠানের অভিনয়কে বেশী মর্যাদা দিয়ে তোমার সঙ্গে সংসার করে আমি যে ব্যাভিচার করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত হোলো এই অপমান, যেটা তুমি আমায় করেছো আমি বর্তমান থাকতে আরেকটি রক্ষিতা রেখে। আমার আজ আর কোনো আক্ষেপ নেই।"

"ব্যাভিচার!" কমলেশ স্তম্ভিত হয়ে বললো, "আমি তোমার স্বামী। আমার সঙ্গে সংসার করা ব্যাভিচার?"

"হ্যাঁ, তাই। যাকে ভালোবাসি না, কোনোদিন ভালোবাসিনি, কোনোদিন ভালোবাসবোনা, তার সঙ্গে ঘর করা হোলো চরম ব্যাভিচার। এদ্দিন নিজেকে এই বলে বোঝাতাম যে, আমি আমার কর্তব্য করে যাচ্ছি। এখন দেখছি এটা ফাঁকি। চরিত্র হারিয়ে কোনোদিন কর্তব্য পালন করা যায় না। এবং তোমার কাছে এসেই আমি ভ্রষ্টচরিত্রা হয়েছি।"

কমলেশ ক্ষুব্ধ হয়ে বললো, "তোমার মুখে এসব কথা শুনবো আমি আশা করিনি। আমাদের ভারতবর্ষ সীতা, সতী, সাবিত্রীর দেশ—।"

সবিতা বলে উঠলো, "এটা রাম, শিব এবং সত্যবানেরও দেশ। আগে নিজে রক্ষিতার গর্ভোৎপাদন করা ছেড়ে দিয়ে রাম, শিব এবং সত্যবানের মতো হও, তারপর আমায় সীতা, সতী, সাবিত্রী হতে বোলো। আর সীতা, সতী সাবিত্রীর কথা আমায় কেন বলছো? আমি তো তাদের আদর্শ রাখতে পারিনি। আমি একজনকে ভালোবেসে, তার সঙ্গে মালাবদল করে গান্ধর্ববিবাহ করেছি, পরে বাপের ধমক খেয়ে মন্ত্র পড়ে অগ্নি সাক্ষী করে সাত পাক ঘুরে আরেকজনকে বিয়ে করেছি। সীতা, সতী, সাবিত্রী এরকম করতো? আমি যে ব্যাভিচার করে এসেছি এদ্দিন, তার প্রায়শ্চিত্ত আমায় করতে হবে।"

এবার কমলেশ একটু কড়া হওয়ার চেষ্টা করলো। বললো, "তুমি ডিভোর্স করতে চাইলে তোমায় করতে দিচ্ছে কে?"

"আমায় কে আটকাবে শুনি," গম্ভীর কণ্ঠে সবিতা বললো, "গায়ের জোর দেখাবার চেষ্টা কোরো না। তাহলে কেলেঙ্কারি হবে কিন্তু। সব কিছুর উপরে আমার আত্মসম্মান। আমি এখানে আর থাকবো না, তোমার সঙ্গেও কোনো সম্পর্ক রাখবো না।"

কমলেশ আবার নরম হোলো, "দেখ সবিতা, মাথা গরম না করে এসো নিজেদের মধ্যে একটা মিটমাট করে নেওয়া যাক।"

"এ ব্যাপারে আর কোনো মিটমাট হবে না। যথেষ্ট হয়েছে, ব্যাভিচারের এই পঙ্কিল আবহাওয়ায় আমি আর থাকতে পারবো না।"

সবিতা যখন যাওয়ার জন্যে তৈরী হোলো তখন পুলকেশ ছুটে এলো, ঝর্ণা ছুটে এলো। বললো, "এ কি করতে যাচ্ছো বৌ, সমাজে টি-টি পড়ে যাবে।"

"টি-টি পড়ে যাওয়ার কথা তো একদিন তোমায়ও সবাই শুনিয়েছিলো ঝর্ণা-দি," সবিতা বললো, "তুমি কেন কারো কথা শোনো নি? আত্মসম্মান নিয়ে নিজের জীবন গড়ে তুলবার অধিকার তোমার আছে, আমার নেই?"

কেউ কোনো কথা বুঝলো না। পরিবারের সম্মানের প্রশ্ন সবার কাছে বড়ো। ঝর্ণা কমলেশের মধ্যে এদ্দিন মুখ দেখাদেখি ছিলোনা, পুলকেশ-কমলেশের মধ্যে যাওয়া-আসা ছিলো না, কিন্তু আজ ভাইবোনেরা একজোট হয়ে বৌয়ের নিন্দে করতে বসলো।

সবিতা কোনো বাধা মানলো না। সরোজকে ডাকিয়ে এনে তার সঙ্গে চলে গেল বাপের বাড়ি।

— দশ —

সবিতার বাপের বাড়িতে সবাই প্রথমে ভেবেছিলো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এ একটা সাময়িক গোলযোগ। কিন্তু পরে যখন বুঝতে পারলো সবিতার উদ্দেশ্য, সবাই তার প্রতি অত্যন্ত বিরূপ হোলো।

সরোজ বললো, "এ কি অন্যায় কথা। ভুল চুক মানুষ মাত্রেই করে, কমলেশ পুরুষ মানুষ, ও এমন কি করেছে যা অন্য অনেক পুরুষ মানুষ করে না। তাই বলে কেউ স্বামী ত্যাগ করে নাকি? ও যখন নিজের থেকে বলছে যে, সে ওই মেয়েছেলেটার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবে না, তখন সবিতার উচিত তাকে ক্ষমা করে নিজের সংসারে ফিরে যাওয়া।"

মঞ্জুশ্রী ঠোঁট উল্টে বললো, "এ একটা ফ্যাশান বাপু। আধুনিক মেয়ে তো আমরাও, কিন্তু অতো আধুনিক আমরাও হতে পারবো না। ডিভোর্স করে তারপর? আরেকটা বিয়ে করবে, না এখানে বসে বাপের বাড়ির অন্ন ধ্বংস করবে?"

সবিতা যে স্কুলে চাকরি করতো, কেউ সবিতার কথা তাদের কানে তুলে দিলো। বোধ হয় কমলেশ-পুলকেশদের কোনো সহযোগী। স্কুলের সেক্রেটারি সবিতাকে সোজাসুজি বললো, "আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমাদের কোনো কথা বলা উচিত নয়, তবে যা শুনছি সে যদি সত্যি হয়, যদি আপনি আপনার স্বামীকে ডিভোর্স করেন, তাহলে আপনাকে স্কুলে রাখা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। নীতিগত ভাবে ডিভোর্সের বিপক্ষে আমাদের কিছু বলার নেই, তবে স্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা করছেন এরকম একজন টীচার স্কুলে থাকলে অনেক গার্ডিয়ান অসন্তুষ্ট হবেন।"

সবিতা বললো, "বেশ, ডিভোর্সের মামলা আনবার আগে আমি চাকরিতে রেজিগনেশান দেবো।"

সবিতার মা তরুবালা বললো, "ভালো করে ভেবে দেখ। আমাদের মতন মধ্যবিত্ত পরিবারে এসব হয় না। পরে অনেক অসুবিধে হবে। তোর ছেলের ভবিষ্যতও একবার ভেবে দেখবি না?"

"ও আমার ছেলে, মা," সবিতা বললো, "ওর জন্যে তোমাদের ভাবতে হবে না।"

যখন দেখা গেল সবিতার সিদ্ধান্ত নড়চড় হবার নয়, সরোজ ক্ষেপে গেল। তার শ্বশুরবাড়ি অত্যন্ত গোঁড়া। কুটুম মহলে এরকম একটা ঘটনা ঘটতে

যাচ্ছে, তাতে ওরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হোলো। সুতরাং আরো বেশী ক্রুদ্ধ হোলো সরোজ। বললো, "বেশ, তাহলে সবিতা অন্য কোথাও চলে যাক। আমাদের বাড়িতে থেকে ওসব চলবে না। অন্য কোথাও থেকে করলে, লোকে আমাদের কিছু বলতেও পারবে না।"

নিশিকান্তবাবু এদ্দিন গুম হয়েছিলেন, একটি কথাও বলেন নি। এবার সবাইকে অবাক করে দিয়ে সরোজের মুখের উপর বললেন, "আমি এখনো বেঁচে আছি। তুমি ওকে চলে যেতে বলার কে? তোমার ভালো না লাগে তুমি তোমার শ্বশুরের কাছে গিয়ে থাকো গে যাও।" তরুবালাকে বললেন, "ঠিক করেছে সবিতা। আমার বাবার পিসেমশাই ছিলেন ডাকসাইটে জমিদার। কিন্তু তিনি এক বাঈজীকে বাড়িতে এনে রেখেছিলেন বলে বাবার পিসীমা ওঁর কর্তাকে ঝাঁটা মেরে মহল থেকে বার করে দিয়েছিলেন। মিত্তির বাড়ির মেয়ে সবিতা। সেই রক্ত তো ওর মধ্যেও আছে। অমন স্বামীর ঘর করে কোনো দরকার নেই। ত্যাগ করুক ওকে। ওর মামলার খরচা যা লাগে আমি দেবো। আমি যদ্দিন বেঁচে আছি, আমার মেয়ে তদ্দিন আমার সঙ্গে থাকবে। যেদিন আমি মরবো সেদিন তোমার আর মেয়ের একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে মরবো, যাতে তোমাদের সরোজ কি সমরের দেওয়া ভাত-কাপড়ের প্রত্যাশায় থাকতে না হয়।"

আত্মীয়পক্ষের অনেকে মাঝখানে পড়ে মিটমাট করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু সবিতা আর নিশিকান্তবাবু কারো কথা শুনলেন না।

কোর্টে ডিভোর্সের মামলা রুজু করা হোলো।

কলেজ স্ট্রীটেই প্রথম দেখা হয়েছিলো। সেখানেই আবার দেখা হোলো।

ট্রামের জন্যে দাঁড়িয়ে ছিলো সবিতা। ওপারের বইয়ের দোকান থেকে বেরিয়ে বিদ্যুত রাস্তা পার হয়ে আসছিলো। হঠাৎ মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল।

প্রথমটা কারো মুখে কোনো কথা সরে না।

কিছুক্ষণ পরে সবিতাই প্রথম কথা বললো।

"বিদ্যুত! তুমি?"

"সবিতা!"

"কতোদিন পরে দেখা!"

"সত্যি, অনেকদিন হয়ে গেল, না? প্রায় চার বছর।"

"বিলেত থেকে ফিরলে কবে?"

"হোলো বেশ কিছুদিন।"

"কি করে এলে বিলেত থেকে?"

"লণ্ডনের পি-এচ্-ডি হয়ে এলাম।"

"এখন কি করছো?"

"বাইরের একটা ইউনিভার্সিটি থেকে ইতিহাসের রীডারের চাকরিতে ডাকছে। যাবো কি যাবো না ভাবছি।"

"সত্যি, কতোদিন হয়ে গেল বিদ্যুত!"

একটু চুপ করে থেকে বিদ্যুত বললো, "বিলেত যাওয়ার আগে একবার তোমার শ্বশুর বাড়িতে গিয়েছিলাম তোমার সঙ্গে দেখা করতে। শুনলাম তোমরা অন্য পাড়ায় উঠে গেছ। এখন আছো কোথায়?"

"এখন?" একটু থামলো সবিতা, "এখন আছি বাপের বাড়িতে।"

"কদ্দিন থাকবে?"

"থাকবো বেশ কিছুদিন।"

"বেশ, একদিন আসবো।"

সবিতা বিদ্যুতের দিকে তাকালো ভালো করে। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা বিদ্যুত, তুমি বিয়ে করেছো?"

"না।"

"কেন?"

একটু চুপ করে থেকে বিদ্যুত উত্তর দিলো, "এমনি।"

"বিয়ে করবে না?"

বিদ্যুত চুপ করে রইলো। মুখ ফুটে কিছুতেই বলতে পারলো না যে, সবিতারই বন্ধু শ্যামলীর সঙ্গে তার বিয়ের কথা হয়ে আছে।

সবিতা কি যেন ভাবছিলো। মুখ ফিরিয়ে বললো, "বিদ্যুত তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। চলো আমাদের বাড়ি।"

"এখানে কোথাও বসে চা খেয়ে নিলে হয় না?" বিদ্যুত জিজ্ঞেস করলো।

"না," মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে সবিতা উত্তর দিলো, "কারো সঙ্গে রেস্তঁরায় বসে চা খাওয়ার দিন আমার আর নেই।"

বিদ্যুত কি বুঝলো কে জানে, বললো, "আচ্ছা, তোমার বাড়িতেই চলো।"

বিদ্যুতকে দেখে বাড়িতে সবার মুখ ভার হয়ে গেল, কিন্তু কেউ কিছু বলতে সাহস করলো না। সবিতাও কাউকে ভ্রূক্ষেপ করলো না, বিদ্যুতকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসালো।

তরুবালারও মুখ ভার। কিন্তু সবিতা বলে পাঠালো, চা তৈরী করে পাঠাতে।

"বিদ্যুত, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে," সবিতা বললো।

বিদ্যুতের মনে তখন ঝড় উঠেছে। মনে পড়ছে অনেক পুরোনো কথা একটার পর একটা।

"বিদ্যুত, জানো, আমি কমলেশবাবুকে ডিভোর্স করছি।"

"সে কি!"

"হ্যাঁ। মামলা ফাইল করা হয়েছে।"

"কেন?"

"সে অনেক কথা। আরেকদিন বলবো। আজ তোমায় একটা কথা বলতে চাই। আমি যে ভুল করেছিলাম, তার জন্যে আমায় অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে। কষ্ট তুমিও অনেক পেয়েছো। আমায় তুমি ক্ষমা করো বিদ্যুত।"

বিদ্যুতের ঠোঁট দুটো নড়ে উঠলো, কিন্তু কিছু বলতে পারলোনা।

"তোমায় কিছু বলতে হবে না, বিদ্যুত, আমি তোমার কুণ্ঠার কারণ বুঝতে পারছি। তোমার আত্মসম্মান আছে, তুমি বলতে চাইলেও মুখ ফুটে বলতে পারবে না। আমি তোমার প্রতি যে অন্যায় করেছি, তারপর তোমার পক্ষে আর কিছু বলা সম্ভবও নয়। আমি সে প্রত্যাশা করি না, আমি তোমার বলার অপেক্ষায়ও থাকবো না। অন্যায় আমিই করে এসেছি এ পর্যন্ত। তাই আজ লজ্জার মাথা খেয়ে আমাকেই বলতে হচ্ছে। বিদ্যুত, তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে আমি কোনোদিন তা আশাও করিনি। আজ যখন তোমায় আবার খুঁজে পেয়েছি, আমি আর কিছুতেই তোমায় হারাতে পারবো না। সংসারে কেউ আর তোমায় আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।"

"সবিতা—,"

"আকাশের চাঁদকে সাক্ষী রেখে বেলফুলের মালা বদল করে আমাদের বিয়ে হয়েছিলো, মনে আছে? বিদ্যুত, আমার জীবনে সেটাই একমাত্র সত্য, আর কিছু সত্য নয়। সেকথা একবার ভুলে গিয়ে আমাকে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে, আর ভুল করতে পারবো না।"

বিদ্যুতের মুখ বেদনার কালিমায় ছেয়ে গেছে, সে আস্তে আস্তে বললো, "যদি মাসখানেক আগেও আমাদের দেখা হোতো সবিতা—"

"কিছু ভালো হোতো না," সবিতা বাধা দিয়ে বললো, আমি তোমার সঙ্গে কথা না বলে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে চলে যেতাম, তুমিও মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে, কারো সঙ্গে কারো আর দেখা হোতো না।"

বিদ্যুত উঠে পড়লো কিছুক্ষণ পরে। সবিতা বললো, "তুমি খুব সহজ মনে এখানেই এসো। আমি আর জীবনে লুকিয়ে কিছু কোরবোনা। যা সত্য বলে মানবো, যে যাই বলুক, সবার চোখের সামনেই রাখবো তাকে। তুমি যে আমার, একথা সবাইকে জানাতে আমার যেন আর কণ্ঠা না হয়।"

প্যাণ্টের দু-পকেটে হাত ঢুকিয়ে গভীর চিন্তায় মন ভাসিয়ে বিদ্যুত চলে গেল।

পথ চলতে চলতে ভাবছিলো,—হায় ভগবান, এ তুমি আবার কি করলে? কেন এই জটিলতার সৃষ্টি করলে তুমি। আমি কি করি এখন?

ওই যা বললো, একবারই বললো সবিতা। আর কোনো কথা নয়। বিদ্যুত আসতে লাগলো সবিতার কাছে। সাধারণ আর দশজন পরিচিতের মতোই আসা যাওয়া। বিদ্যুত দু একবার সবিতাকে বলবার চেষ্টা করেছিলো কোনো একটা কিছু। কিন্তু সবিতা তাকে একলা কথা বলার সুযোগই দিলো না। বাড়ির বাইরে কোথাও যেতো না ওর সঙ্গে। বাড়িতে এলেও মাকে কি সমরকে, এমন কি মাঝে মাঝে নিশিকান্তবাবুকেও ডাকিয়ে এনে একসঙ্গে গল্প করতে বসতো। খুব সাধারণ কথাবার্তা, আর দশজনের মতো, খেলা-ধুলো, রাজনীতি, সিনেমা।

সবাই সব কিছু বুঝলেও, মুখ ফুটে কোনো কথা বলার উপলক্ষ পেলো না।

সরোজ তার আপত্তি জানিয়েছিলো, কিন্তু নিশিকান্তবাবুই বললেন, "ও তো বিদ্যুতের সঙ্গে দেখা করে, কথাবার্তা বলে, সবার সামনেই। তাতে কার কি বলার আছে?"

কিন্তু বিদ্যুত যে এ বাড়িতে যাওয়া আসা করছে, একথাটা আস্তে আস্তে ছড়ালো। কমলেশদের বাড়ির সবাই শুনলো, সবিতার অন্য বন্ধু-বান্ধবেরাও শুনলো।

কথাটা উঠলো শ্যামলীর কানেও। এবং সংবাদ বহন করে আনলো তার পুরোনো বন্ধু বাণী।

একদিন হঠাৎ সে এসে উপস্থিত। হৈ হৈ করে বললো, "ওরে শ্যামলী, শুনেছিস?"

"কি?"

"সবিতার খবর?"

"না। কেন, কি হয়েছে?"

"সা-ং-ঘা-তি-ক ব্যাপার।"

"কি ব্যাপার?"

"সবিতা ডিভোর্স করছে ওর স্বামী কমলেশকে।"

"কেন?"

"সে অনেক কাণ্ড। কমলেশের নাকি আরেকটি মেয়েমানুষ আছে। তার নাকি একটি মেয়েও আছে।"

"ভালোই করেছে," সব শুনেটুনে শ্যামলী বললো, "এখন ও আছে কোথায়?"

"বাপের বাড়ি। চলনা একদিন।"

"কবে যাবি বল।"

"ওখানে গিয়ে বিদ্যুতের সঙ্গেও দেখা হয়ে যেতে পারে।"

"মানে?" এক মুহূর্তের জন্যে বিবর্ণ হোলো শ্যা[illegible]মুখ, সামলে নিলো চট করে। কিন্তু সেটা বাণীর চোখ এড়ালো না। একটা আশ্চর্য আনন্দ উপভোগ করলো সে।

বললো, "তুই তো কোনো খবর রাখিস না। বিদ্যুত তো এদ্দিন ওরই অপেক্ষা করেছিলো। এখন যেই শুনেছে যে সবিতা স্বামীর ঘর ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে এসেছে, অমনি সে সেখানে যাতায়াত সুরু করে দিয়েছে।"

"ভালোই তো," শ্যামলী জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে বললো, "ওদের তো ভাব অনেকদিন থেকেই ছিলো।"

"চল সবিতাদের বাড়ি।"

"আজ?"

"হ্যাঁ, চল না।"

"না ভাই, আজ নয়, আজ এই মাত্র অফিস থেকে ফিরেছি। শরীরটা বড্ড ক্লান্ত। তুই একটু বোস। আমি চট করে চান করে আসি।"

বাণী গেল শ্যামলীর মায়ের সঙ্গে গল্প করতে। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলো, "বিদ্যুত কি এখানে প্রায়ই আসে?"

"হ্যাঁ। কেন, তুমি জানো না? শ্যামলীর সঙ্গে বিদ্যুতের যে বিয়ের কথা হয়ে আছে।"

"ওমা, তাই নাকি। শ্যামলী তো বলেনি আমায় সে কথা। দেখেছো

কাণ্ড? ও মাসীমা, শ্যামলীকে বলবেন না যে আপনি আমায় একথা বলেছেন, কেমন? ও যখন আমায় নেমন্তন্ন করতে আসবে, আমি চিঠি খুলবার আগে ওকে ওর বরের নাম বলে দিয়ে হকচকিয়ে দেবো। মাসীমা, লক্ষীটি, এই মজাটা বিগড়ে দেবেন না, হ্যাঁ মাসীমা?"

"আচ্ছা পাগল মেয়ে। আচ্ছা যা, বলবো না। তোদের যতো সব ছেলেমানুষি," হেসে বললো শ্যামলীর মা।

শ্যামলী চান করে এসে দেখলো বাণী রান্নাঘরে বসে সজনে ডাঁটার চচ্চড়ি চেখে দেখছে।

বাণী আড় চোখে তাকিয়ে দেখলো শ্যামলীকে। শ্যামলীর মুখ খুব প্রশান্ত, কিন্তু চোখ দুটি ফোলা ফোলা। নিশ্চয়ই বাথরুমে বসে একটু কেঁদে নিয়েছে, বাণী ভাবলো।

বাণীর আর তর সইলো না। সবিতার কাছে গিয়ে উপস্থিত হোলো পরদিনই।

"শ্যামলীকেও নিয়ে এলি না কেন," সবিতা জিজ্ঞেস করলো তাকে।

"কাল গিয়েছিলাম ওর ওখানে। ও আজকাল বেশী বেরোয় না বাড়ি থেকে," বাণী বললো।

"কেন? কি হয়েছে ওর?"

"হয়নি কিছু। তবে একটা বেশ ভালো খবর শুনলাম মাসীমার কাছ থেকে। আচ্ছা মেয়ে শ্যামলী, কথাটা এখন পর্যন্ত আমাদেরও বলেনি।"

বাণীর খুব হাসি-হাসি মুখ। সবিতার খুব কৌতূহল হোলো। জিজ্ঞেস করলো, "ব্যাপার কি? শ্যামলীর বিয়ে হচ্ছে নাকি?"

"তাই," বাণীর চোখ দুটি ঝিকমিক করে উঠলো, "তবে আসল খবরটা হচ্ছে ওর বরের পরিচয়। কার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে বলতো!"

"কার সঙ্গে?"

"আমাদের বিদ্যুতের সঙ্গে।"

"কি?" সবিতা বলে উঠলো, "যাঃ, সে কি করে হয়?"

"কাল মাসীমাই তো বললেন। আমারও কি ছাই বিশ্বাস হচ্ছিলো নাকি? মাসীমার কাছে সব শুনলাম। শ্যামলীর ওখানে বিদ্যুতের যাওয়া আসা অনেকদিন থেকেই। বিলেত থেকে ফেরার পরদিনই নাকি সে বিয়ের কথা তুলেছে।"

বাণী খুব পরিতুষ্ট হয়ে লক্ষ্য করলো যে সবিতার মুখ একেবারে সাদা হয়ে গেছে।

তখন প্রায় মাঝরাত। রান্নাঘরের পাশের বারান্দায় অন্ধকারে ভূতের মতো জড়সড় হয়ে বসেছিলো শ্যামলী। মুখে কোনো ভাবনার লেশ নেই, চোখে জল নেই, শুধু হাঁটুতে মুখ রেখে চোখ বুজে বসে ছিলো সে। খুব ভালো লাগছিলো এখানের আকাশের শূন্যতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে চুপচাপ বসে থাকতে।

বিদ্যুতের সঙ্গে দু-চারবার দেখা হয়েছে এর মধ্যে। শ্যামলী লক্ষ্য করেছিলো যে ইদানিং একটু আনমনা দেখাচ্ছিলো বিদ্যুতকে। মুখখানি শুকনো। যেন একটা ভাবনার ভার মাথায় চেপেছে। শ্যামলী কোনোদিনই কারো ব্যাপারে কৌতূহল প্রকাশ করেনি। কিন্তু মনে যে প্রশ্ন ওঠেনি তা নয়। এখন বুঝতে পারছে কেন।

বাণী চলে যাওয়ার পর আজও একবার এসেছিলো বিদ্যুত। কিছু একটা বলার জন্যে উসখুস করছিলো। কিন্তু মা সব সময় কাছাকাছি ছিলো বলে বলার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। ইচ্ছে করে সুযোগ দেয়ও নি শ্যামলী।

শ্যামলী চোখ খুলে আকাশের দিকে তাকালো। মনে কোনো ভার নেই, ভাবনা নেই।

সেদিন দোতলার বারান্দায় একলা জেগে বসেছিলো সবিতাও। তারও খুব প্রশান্ত ভাব, মনে কোনো ভার নেই, ভাবনা নেই। অনেক দূরে বস্তি অঞ্চল থেকে ভেসে আসছিলো দেহাতীদের উচ্চকণ্ঠ সঙ্গীত আর ঢোলের আওয়াজ। খুব ভালো লাগছিলো শুনতে। শুনতে শুনতে ভাবছিলো,— জীবনের বিস্ময়গুলো যেভাবেই আসুক, আমি আর ব্যথা পাবো না। কষ্ট পাই তো পাবো, ব্যথা পাবোনা। এতদিন যা অন্যায় করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত হয়তো আমায় এমনি করেই করতে হবে।

— এগারো —

কমলেশ রমলার ঘরে চুপচাপ বসে সেতার বাজাচ্ছিলো। রমলা চা নিয়ে ঘরে ঢুকলো। কমলেশ সেতার রেখে দিলো একপাশে। তার মুখ ভার। রমলার সঙ্গে কোনো কথা বললো না।

ওদের মেয়েটি হামাগুড়ি দিয়ে কমলেশের কাছে এসে বসলো। তার দিকে এক নজর তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলো কমলেশ।

রমলা চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর বলে উঠলো, "অন্যায় তুমিও করেছো, আমিও করেছি। তোমার উচিত ছিলো না বিয়ে করা, আমার উচিত ছিলো না তোমার বিয়ের পর তোমার সঙ্গে কোনো সংশ্রব রাখা। দিদি কোনো অন্যায় করেনি। যে মেয়ের আত্মসম্মান জ্ঞান আছে, তার এ ছাড়া অন্য পথ নেই। তোমাকে এ অবস্থা মেনে নিতেই হবে।"

কমলেশ আস্তে আস্তে উত্তর দিলো, "জানো, সবিতা আবার বিয়ে করবে স্থির করেছে।"

"আবার বিয়ে করবে?" প্রথমটা রমলা একটু অবাক হোলো। তারপর বললো, "বেশ তো, করতে চাইলে করবে। তোমার সঙ্গে সংসার করতে পারবে না বলে যে সংসার করবেই না এরকম তো কোনো কথা নেই।"

"আমি আর সমাজে মুখ দেখাতে পারবো না," কমলেশ বললো, "লোকে কি বলবে? বোসেদের বাড়ির বৌ স্বামী ত্যাগ করে আবার বিয়ে করছে?"

কমলেশের কথা শুনে রমলার রাগ হোলো। বললো, "তুমি এমন কি সাধুপুরুষ যে লোকে তোমায় কিছু না বলে দিদিকে বলবে?"

"আমার কথা আলাদা, আমি পুরুষ মানুষ—।"

"তাই বলে সাত খুন মাপ,—না? কাউকে যদি কিছু বলতে হয়, তোমাকেই বলা উচিত। আমি তো দিদির মতো মেয়েকে সারাজীবন পূজো করবো। কতো মেয়ে এমনি সহ্য করে যাচ্ছে মুখ বুঁজে—"

"তাদের আদর্শ আছে, তাই সহ্য করছে," বললো কমলেশ।

"না, সেজন্যে নয়। সহ্য করছে তাদের চলে যাওয়ার শক্তি নেই বলে। কোথায় যাবে? কিসের ভরসায় যাবে? ওরা এত নিঃসহায়!"

"সবিতা যদি আমার বাড়ি ছেড়ে চলে এসে, বাপের বাড়িতে পড়ে থাকতো, আমার কিছু বলার ছিলো না," বললো কমলেশ, "কিন্তু সে আবার বিয়ে করবে, এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না।"

"তাতে আর কার কি ক্ষতি। তোমার মনের আগুনে তুমিই জ্বলে মরবে।"

"সমাজ কি এটা স্বীকার করবে?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই করবে। যে আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবি অন্তরের সত্যের উপর দাঁড়াবার শক্তি রাখে, তাকে সমাজ স্বীকার না করে পারে না। যেমনি করে সমাজ স্বীকার করে নিয়েছে সতীদাহ প্রথার নিবৃত্তি, স্বীকার করে নিয়েছে বিধবার আবার বিয়ে করার অধিকার, তেমনি করেই ব্যর্থ বিবাহিত জীবনের নাগপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে মেয়েদের আবার নতুন জীবন আরম্ভ করার অধিকার সমাজ সাগ্রহে মেনে নেবে।"

"আমি তোমার কথা মানি না," কমলেশ বললো, "সব কিছুরই একটা মাত্রা থাকা উচিত। যাই হোক, আইন যখন সবিতার পক্ষে, আমার কিছু করার নেই। তবে আমার ছেলেকে আমি কিছুতেই ওর সঙ্গে থাকতে দেবো না। ছেলে দেখবে মা আরেক জন পুরুষের ঘর করছে, এ আমি সহ্য করতে পারবো না।"

"ছেলে যদি সহ্য করতে পারে, তোমার আপত্তি করার কি আছে।"

"না, এ আমি হতে দেবো না।"

রমলা হেসে বললো, "বেশ, দেখো চেষ্টা করে, তোমার আত্মাভিমানের এক কণা অন্তত যদি বাঁচাতে পারো!" গম্ভীর হয়ে রইলো কমলেশ।

সবিতা রান্নাঘরে বসে তরকারি কুটছিলো, এমন সময় তরুবালা এসে বললো, "কমলেশ এসেছে।"

সবিতা ভ্রূ কুঞ্চন করলো, বললো, "তা, আমি কি করবো?"

"তোর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাইছে।"

"বলে দাও, দেখা আমি করবো না।"

তরুবালা একটু চুপ করে রইলো, তারপর বললো, "দ্যাখ, তোদের ঝগড়ার মধ্যে আমি নেই। যা বলার তুই গিয়ে বলে দে।"

সবিতা চোখ তুলে মায়ের দিকে তাকালো। তারপর উঠে চলে গেল রান্নাঘর থেকে।

কমলেশ একলা বসেছিলো বাইরের ঘরে। সবিতা ঢুকেই বললো, "নতুন কথা আমার কিছু বলার নেই, শোনারও নেই। আর পুরোনো কথা আলোচনা করতে চাই না। তুমি এখানে আর না এলেই ভালো হয়।"

কমলেশ বললো, "আমাদের কথা আমি কিছু বলতে আসিনি। আমি

শুধু বলতে এসেছি, আমার ছেলেকে আমি নিয়ে যাবো। তুমি যদি আবার বিয়ে করো, ছেলেকে আমি তোমার কাছে থাকতে দেবো না।"

সবিতা উত্তর দিলো, "তুমি যে আরেকজন মেয়ের সঙ্গে ঘর করছো,—সে বিয়ে করেই হোক, না করেই হোক,—আমি কেন আমার ছেলেকে তোমার সঙ্গে থাকতে দেবো ? বেশ, আইনের জোরে যদি ছেলেকে নিজের কাছে নিয়ে রাখতে পারো তো তাই চেষ্টা করে দেখ, আমায় কিছু বলে কোনো লাভ নেই।"

কমলেশ একটু চুপ করে থেকে বললো, "দেখ, আমাদের মধ্যে যাই হোক না কেন, অন্তত ছেলের ভবিষ্যৎ ভেবে আমাদের একটা বোঝাপড়া করা উচিত।"

"না, কোনো বোঝাপড়া হবে না। কোনো ফাঁকির মধ্যে, কোনো মিথ্যে পরিবেশের মধ্যে আমি ছেলেকে মানুষ করতে চাই না।"

"ছেলে যদি বড়ো হয়ে কোনো আত্মগ্লানি অনুভব করে তোমার চরিত্রের জন্যে ?"

সবিতা আগুন হয়ে গেল। বললো, "ছেলে আমার। সে জানবে তার মায়ের জীবনে কোনো মিথ্যে ছিলো না, কোনো অসত্য ছিলো না। মায়ের চরিত্রের জন্যে সে চিরকাল গর্বই বোধ করবে। তুমি এবার যাও।"

কমলেশ শেষ চেষ্টা করলো, "আবার ভেবে দেখ সবিতা। আমি বার বার তোমায় অনুরোধ করছি। এসব কোরো না। তুমি ফিরে এসো। তোমাকে আমি সব কিছু করার স্বাধীনতা দেবো, এমন কি বিদ্যুতের সঙ্গেও তুমি সম্পর্ক রাখতে পারো। আমি কিছু বলবো না। আমি কিছু চাইবো না তোমার কাছে। শুধু তোমার-আমার যে সামাজিক পরিচয়, সেটা বাইরে বজায় থাক, এর বেশী আমি কিছু চাই না।"

সবিতার মুখ লাল হয়ে গেল। বললো, "আমি আর কোনো কথা শুনতে চাই না। তুমি অত্যন্ত নীচ। তুমি চলে যাও।"

রমলা সব শুনলো। তারপর বললো কমলেশকে, 'দেখ, একটা কথা, —তোমার জন্যেই বলছি। আমার জন্যে নয়। তুমি আমায় বিয়ে করে নাও।"

"না," দৃঢ় কণ্ঠে বললো কমলেশ।

রমলা চুপ করে রইলো। তারপর মৃদু গলায় বললো, "বেশ। তোমার যা খুশী। তোমার দেওয়া টাকার উপর আমার চলে, তোমায় তো কিছু বলার জোর আমার নেই।

— বারো —

দিন ছয়েক পরে বিদ্যুত যখন এলো, সবিতা তাকে ডেকে নিয়ে বারান্দায় বসালো। আজ আর ডাকলো না কাউকে। বিদ্যুত মনস্থির করে ফেলেছিলো এদ্দিনে। সবিতার কাছে লুকোলে তো চলবে না। ওকে বলতেই হবে। আজ নিরিবিলি পেতে সে ভাবলো, এখনই বলে ফেলি, নইলে কে না কে এসে পড়বে কিছুক্ষণের মধ্যে।

বললো, "সবিতা, তোমায় একটা কথা বলার আছে।"

সবিতা হেসে বললো, "তার আগে আমারই একটা কথা বলার আছে। সে জন্যে তোমায় এখানে একটু নিরিবিলিতে এনে বসালাম।"

বিদ্যুত তাকালো সবিতার দিকে।

সবিতা বললো, "কাল শ্যামলীর ওখানে গিয়েছিলাম।"

"শুনেছো তাহলে?" বিদ্যুত জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ। শ্যামলীর মায়ের কাছে সবই শুনলাম। আমায় তোমার আগেই বলা উচিত ছিলো।"

"আমায় বিশ্বাস করো সবিতা, আমি প্রথম দিনই বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেদিন আমায় দেখে তুমি এত খুশী হয়েছিলে যে মুখ ফুটে তোমায় বলতে পারলাম না। তারপর প্রত্যেক দিনই সুযোগ খুঁজছিলাম তোমায় বলার। কিন্তু তোমায় একলা পেতাম না। যাক, তুমি শুনে নিয়েছো, আমি এবার নিশ্চিন্ত। এবার তুমিই বলে দাও আমি কি করবো।"

সে এমন সরল ভাবে বললো যে সবিতার চোখে জল এসে গেল। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, "আমি বলার আগে তুমিই বলো তোমার কি করা উচিত।"

বিদ্যুত একটুও থামলো না, একটুও দ্বিধাবোধ করলো না, সোজাসুজি বললো, "সবিতা, তুমি জানো আমি শুধু তোমায় ভালোবাসি, তোমাকেই চাই, আর কাউকে কোনোদিন ভালোবাসতে পারবো না।"

সবিতা ভাবলো,—হায় ভগবান, এই পুরুষ জাতটা নিষ্ঠুর হতে পারে, রূঢ় হতে পারে, কিন্তু এসব ব্যাপারে মনের জোর দেখাতে পারে না কেন?

বিদ্যুত বলে গেল, "শ্যামলীকে আমি খুব বন্ধুর মতো জীবনে পেয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিলো, তুমি সংসার করে যখন সুখী হয়েছো, তখন তোমার জন্যে আমি যদি সংসার না করি সেটা তোমার উপর খুব অবিচার করা হবে,

যদি তুমি কোনোদিন জানতে পারো খুব কষ্ট পাবে। যাকে ভালোবাসলাম তাকে জীবনে পেলাম না বলে আর সংসার করলাম না, তার মধ্যে ভাববিলাস থাকতে পারে, কিন্তু কোনো সামাজিক সার্থকতা নেই। তাই ভাবলাম যাকে ভালোবাসি তাকে জীবনে পাওয়ার আশা যখন শেষ হয়ে গেছে, দেখে-শুনেই যখন বিয়ে করতে হবে তখন অচেনা কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে যাবো কেন, যে আমার বন্ধু তাকে বিয়ে করলে ক্ষতি কি? তাকে অতো ভালোবাসতে না পারি বন্ধুর মতো ভালোবাসতে তো পারবো। সত্যি সবিতা, শ্যামলীকে ঘিরে তোমার আমার পুরোনো দিনগুলোর এত স্মৃতি জড়িয়ে আছে যে তাকে কিছুতেই নিজের জীবন থেকে ছাড়তে চাইলোনা আমার মন। তাই তার কাছে বিয়ের কথা তুলেছিলাম। এবং একথা তাকে পরিষ্কার বুঝিয়েই দিয়েছিলাম। তাকে কোনো ফাঁকি দিতে চাইনি, কিছুই গোপন করিনি তার কাছে।''

''এখন কি করতে চাও,'' সবিতা জিজ্ঞেস করলো।

''দেখ সবিতা, তোমাকে পাওয়ার আশা ত্যাগ করেছিলাম। কিন্তু এখন যখন তোমায় ফিরে পেয়েছি, তখন আর আমি তোমায় হারাতে পারবো না।''

''আর শ্যামলীর কি হবে?''

''এতো ভালোবাসার বিয়ে নয়। এ এক রকম দেখে শুনে বিয়ে করার মতো। শ্যামলী আমার খুব বন্ধু। তাকে বোঝালে সে বুঝবে। অনেক দূর কথা এগিয়ে অনেক বিয়ে ভেঙে যায় না? মনে করো এও তেমনি।''

''শ্যামলীর কষ্ট হবে না?'' সবিতা জিজ্ঞেস করলো।

''কষ্ট হবে কেন? সে তো তোমার আমার সম্পর্ক জানে। সে তো আমায় প্রণয়ের দৃষ্টিতে কোনোদিন দেখেনি।''

''আগে না হয় দেখেনি,'' সবিতা বললো, ''কিন্তু বিয়ের কথা হওয়ার পর? তুমি জানো না বিদ্যুত, বিয়ের ঠিক হয়ে গেলে মেয়েরা কি ভাবে নিজের মনকে তৈরী করে নেয়। না বিদ্যুত, তুমি যা বলছো সে হয় না।''

''সবিতা!''

''আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি বিদ্যুত, কিন্তু কারো দীর্ঘনিঃশ্বাসের উপর আমার নতুন জীবন দাঁড় করাতে চাই না। তা-ছাড়া তুমি শ্যামলীকে কথা দিয়েছো। তোমার কথা দেওয়া আমারই কথা দেওয়ার মতো। আমি কিছুতেই তোমায় কথা ফিরিয়ে নিতে দেবো না। শ্যামলীকে তোমায় বিয়ে করতেই হবে।''

''শুধু একটা মুখের কথা দেওয়ার উপর কি বিয়ের মতো এত বড় একটা প্রশ্ন দাঁড়াতে পারে। বিয়ে কি শুধু একটা মুখের কথার ব্যাপার? অন্তরের

ভালোবাসার চাইতে কি একটা হাল-ছেড়ে-দেওয়া মুখের কথা বড়ো ? ভালো-বাসার চাইতে একটা মুখের কথা বড় সত্য ?"

"তুমি এ কি কথা বলছো, বিদ্যুত ?" সবিতা একটু অবাক হয়ে বললো, "মুখের কথার কি একটা শ্রেণীবিভাগ আছে নাকি যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেটা রাখা যায়, অন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে না রাখলেও চলে ? অন্তরের সত্যটা এতে কোনোদিন মিথ্যে হয়ে যাবে না, কিন্তু মুখের কথা তোমায় রাখতেই হবে। আরেকটি মেয়ের ভবিষ্যত জীবনের সুখ শান্তি তোমার ওই কথা রাখার উপর নির্ভর করে।"

বিদ্যুত চুপ করে রইলো।

সবিতা বলে গেল, "তুমি নিজের থেকে আসোনি আমার কাছে, তুমি আমায় মুখ ফুটে কিছু বলোনি। আমিই তোমায় আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলাম, আজ আমিই তোমায় ফিরিয়ে দিচ্ছি—বিদ্যুত। মনে কোরো না যে তোমার চাইতে আমার কষ্ট কম হচ্ছে। কিন্তু আমার কথার এদিক ওদিক হবে না। আমি যা বলছি, তাই। তুমি এখানে আর এসো না। বিয়ের সময় নেমন্তন্ন কোরো, আমি নিশ্চয়ই যাবো, আমার বন্ধু শ্যামলীর স্বামী হিসেবে দেখা হবে মাঝে মাঝে। ব্যস ওই পর্যন্ত। আমার অন্তরের সত্য আমার অন্তরেই থাক, তাকে বাসা হিসেবে পাওয়ার মতো ভাগ্য যখন আমাদের নয়, তাকে ব্যাধের জালের মতো আমি ব্যবহার করতে চাই না।—আর শোনো, শ্যামলীকে এসব কথা কিছুই বোলো না।"

আর কোনো কথা হোলো না। বিদ্যুত আস্তে আস্তে উঠে চলে এলো।

সেদিন এক সোমবারের সকাল। বিদ্যুত আসতেই শ্যামলী বললো, "এসো, তোমারই অপেক্ষা করছিলাম।"

"তুমি আমায় ডেকে পাঠিয়েছো কেন শ্যামলী," বিদ্যুত জিজ্ঞেস করলো, "তোমার ভাই কিছুক্ষণ আগে এসে তোমার চিঠি দিতে তক্ষুনি চানটান করে বেরিয়ে পড়লাম। তবে তোমার চিঠি না পেলেও আজ একবার আসতাম।"

"কেন ?"

"তোমায় নিয়ে মার্কেটে যাওয়ার ইচ্ছে আছে।"

"মার্কেটে যাওয়ার সময় আমার হবে না," শ্যামলী বললো, "আমায় এক্ষুনি বেরোতে হবে। একটা জরুরী কাজ আছে। চলো, আমায় ট্রামে তুলে দেবে।"

বিদ্যুত লক্ষ্য করলো যে শ্যামলী তৈরী হয়েই বসে আছে। বললো, "চলো।"

গলি থেকে বেরিয়ে এসে বড়ো রাস্তার উপর ট্রাম-স্টপ। এতক্ষণ চুপচাপ পথ চলছিলো শ্যামলী। শুধু হুঁ-হাঁ করে উত্তর দিচ্ছিলো বিদ্যুতের কথার। ট্রাম-স্টপে তখন লোকজন নেই। শ্যামলী দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর বললে, "বিদ্যুত—!"

"কি ?"

"একটা মস্ত বড় অন্যায় করতে যাচ্ছি তোমার সঙ্গে। আমায় মাপ করতে হবে কিন্তু।"

"কি অন্যায় ? কি বলছো তুমি ?" বিদ্যুত বিস্মিত হোলো শ্যামলীর কথা শুনে।

"আমি বি-ও-এ-সি'তে এয়ার-হস্টেসের চাকরি পেয়ে গেছি।"

"মানে ? ও চাকরি কি করে নেবে তুমি ? বিয়ে করলে তো ও চাকরি করা যায় না।"

"আমি জানি। কিন্তু অনেক মাইনে।"

"কি বলছো তুমি ?" বিদ্যুত হতভম্ব হোলো।

"হ্যাঁ। অনেক ভেবে দেখলাম। আমি মা-বাবার একমাত্র অবলম্বন। নিজের সুখ-সুবিধের কথা না ভেবে ভাইবোনেদের মানুষ করাই আমার প্রথম কর্তব্য। ওরা আমার মুখ চেয়ে আছে।"

"তাতে আমাদের বিয়ে হতে বাধা কি ? আমি কি এই কর্তব্যে তোমায় সাহায্য করতে পারবো না ?"

"পারবে, কিন্তু আমি আমার মা-বাবা ভাইবোনকে সেই সাহায্য গ্রহণ করতে দেবো না।"

"সেটা কোনো যুক্তি নয়," বিদ্যুত বললো।

"বেশ, তাহলে আসল যুক্তিটা শোনো। তোমার আমার মধ্যে তো কোনো ভালোবাসার সম্পর্ক নেই, যা আছে শুধু একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক। অনেক ভেবে দেখলাম, শুধু এর উপর ভিত করে একটা সংসার গড়ে তোলা যায় না। তোমার বিয়ে যার সঙ্গেই হোক, আমার বিয়ে যার সঙ্গেই হোক, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।"

"একথা আগে তো মনে হয়নি তোমার।"

"না হয়নি। অনেক ভেবেছি, যখন মনে হোলো তখন তোমায় অকপটেই বলে ফেললাম। তুমি আমায় কোনো ফাঁকি দিতে চাওনি, আমিও তোমায়

কোনো ফাঁকি দিতে চাই না। তুমি সরল মনে আমায় তোমার মনের কথা বলেছো, তাই আজ আমিও সরল মনে তোমায় আমার মনের কথা বলে ফেললাম। তুমি রাগ করো বা যাই করো, আমায় ভুল বুঝো না।''

বিদ্যুত চুপ করে রইলো।

শ্যামলী বললো, ''তোমার সঙ্গে আর হয়তো দেখা হবে না। কাল দিল্লি যাচ্ছি। সেখান থেকে লণ্ডনে যাবো। কয়েকমাস ট্রেনিং নিতে হবে সেখানে। ওই আমার ট্রাম এসে গেল। আচ্ছা, আমি যাই।''

''শোনো শ্যামলী, একটা কথা শুনে যাও। পরের ট্রামটা নিয়ো।''

''না। আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। খুব তাড়া। আসি, কেমন?''

ট্রাম চলে গেল। বিদ্যুত দাঁড়িয়ে রইলো পথের উপর। তাকিয়ে রইলো যতক্ষণ দেখা যায়। জানলার পাশেই বসেছিলো শ্যামলী। কিন্তু একবার ফিরেও তাকালো না।

বাড়ি এসে বিদ্যুত অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলো। তারপর ভাবলো, না, কলকাতায় আর থাকবো না। কার জন্যে থাকবো এখানে। কলকাতার বাইরে চলে যেতে হবে এক্ষুনি। নিয়ে নেবো মধ্যপ্রদেশের সেই রীডারের চাকরিটা। কিন্তু সেকাজে যোগ দিতে তো দেরী আছে। তদ্দিন? না, একদিনও থাকবো না কলকাতায়।

কোথায় যাওয়া যায়? দার্জিলিং, শিলং, নৈনিতাল। না, ওসব দেখা আছে। এবার সমুদ্রের ধারে যাবো। চুপ করে বসে সমুদ্রের ঢেউ দেখবো। কিন্তু যাবো কোথায়? পুরী, ওয়ালটেয়ার, গোপালপুর? বিদ্যুত স্থির করে ফেললো গোপালপুরই যাবে সে। তক্ষুনি ট্র্যাভেল্-এজেণ্টকে ফোন করলো টিকিট বুক করবার জন্যে।

মালপত্তর বলতে শুধু একটা স্যুটকেস আর হোল্ডঅল্। সে দুটি ট্যাক্সিতে তুলে ভেতরে ঢুকতে যাবে এমন সময় দেখতে পেলো সবিতা এসে দাঁড়িয়েছে এক পাশে।

খুবই বিস্মিত হোলো বিদ্যুত। জিজ্ঞেস করলো, ''তুমি?''

''কোথায় চললে?'' সবিতা প্রশ্ন করলো।

''গোপালপুর। ভাবছি, কিছুদিন বেড়িয়ে আসি।''

"মালপত্তর নামাও ট্যাক্সি থেকে," সবিতা বললো।

"কেন?"

"কোথাও যেতে হবে না।"

"টিকিট করা হয়ে গেছে যে।"

"বুকিং ক্যান্সেল করিয়ে দাও।"

বিদ্যুতের চাকর স্যুটকেস আর হোণ্ডঅল্ নামিয়ে নিলো।

সবিতা ঢুকে পড়লো ট্যাক্সিতে। বিদ্যুতকে বললো, "এসো।"

বিদ্যুত বুঝে উঠতে পারলো না ব্যাপারটা। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কেন, কোথায় যাবো আমরা?"

"কোনো কথা না বলে চুপচাপ ট্যাক্সিতে উঠে পড়ো তো।"

বিদ্যুত গুটগুট করে ট্যাক্সিতে ঢুকলো।

ট্যাক্সি স্টার্ট নিলো।

সবিতা বিদ্যুতকে নিয়ে এলো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালে। খুব মেঘলা আকাশ। ঘাসের ওপর পাশাপাশি বসলো দুজনে।

সবিতা আস্তে আস্তে বললো, "মনে আছে বিদ্যুত, প্রথম দিন আমরা এখানেই এসেছিলাম।"

বিদ্যুত চুপচাপ ঘাস ছিঁড়তে লাগলো নিজের মনে।

সবিতা বলে গেল, "কাল রাত্তিরে শ্যামলীর একটা চিঠি পেয়েছি। সে আমায় সব খুলে লিখেছে।"

বিদ্যুত বললো, "ও যে এরকম করবে আমি ভাবতে পারিনি।"

"খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি?" সবিতা হেসে জিজ্ঞেস করলো।

"না, কষ্ট ঠিক নয়," বিদ্যুত উত্তর দিলো, "তবে মনটা কি রকম নিঝুম হয়ে গেছে।"

সবিতা চুপ করে রইলো অনেকক্ষণ, তারপর বললো, "তুমি শ্যামলীকে ভুল বুঝো না। সে যা করেছে, কেন করেছে, শুধু আমিই জানতে পেরেছি। যাক সে কথা, ওকথা আলোচনা করে আর কোনো লাভ নেই।"

বিদ্যুত আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "সবিতা, তুমি কি আমায় তোমার জীবনে ফিরিয়ে ডেকে নিতে এসেছো?"

সবিতা হাসলো। "হ্যাঁ ভাই বিদ্যুত," উত্তর দিলো সে, "চিরকালের জন্যে। আর আমাদের কোনোদিন ছাড়াছাড়ি হবেনা।"

দুজনে চুপ করে রইলো অনেকক্ষণ। আকাশে মেঘ করে এলো। উড়ে গেল এক ঝাঁক পাখি।

সবিতা আস্তে আস্তে বললো, "চার বছর আগে হলে যে রোমাঞ্চ অনুভব করতাম, সেটা আজ আর অনুভব করতে পারছি না। বোধহয় সংসারের আগুনে অনেক পোড় খেয়েছি বলে। শ্যামলীও মনকে একটু নাড়া দিয়ে গেল। তোমায় যে ফিরে পেলাম, তার মধ্যে আজ আর কোনো উন্মাদনা, কোনো হাল্কা আবেগ নেই, কোনো রোমাঞ্চ নেই, আছে শুধু একটা হারানো স্বপ্ন হঠাৎ সত্যি হয়ে ওঠা, আছে শুধু একটা সত্যের প্রতিষ্ঠা, যে সত্যকে আমার প্রাণমন জীবন দিয়ে গ্রহণ করেছি। আমরা দুজনে অনেক কষ্ট পেয়েছি, অনেক বেদনা দিয়ে গড়ে তোলা আমাদের এই ফিরে-পাওয়া। এর মধ্যে পাচ্ছি শুধু একটা আত্মপ্রতিষ্ঠার আনন্দ। তোমার প্রতি আমি অনেক অন্যায় করেছি। অনেক ভুল, অনেক গ্লানি পেরিয়ে এসেছি। আমার সব অন্যায় ক্ষমা করো বিদ্যুত, ওই আকাশ যেমনি করে রোদ্দুরকে গ্রহণ করে, আমায় তেমনি করে গ্রহণ করো।"

বিদ্যুত আস্তে আস্তে চেপে ধরলো সবিতার হাত।

বাড়ি ফিরে এসে সবিতা একটি চেয়ারে গা এলিয়ে দিলো। ধারে কাছে কেউ নেই। যে যার কাজে ব্যস্ত।

ব্লাউসের অভ্যন্তর থেকে সবিতা বার করলো শ্যামলীর চিঠিখানি। সেটি তিনচারবার পড়া হয়ে গেছে। তবু আবার পড়তে ইচ্ছে করছে।

ভারী মিষ্টি চিঠি। শ্যামলী লিখেছে :

—ভাই সবিতা,

তোকে খুব ভালোবাসি। তাই এ চিঠি লিখলাম। বাণীর কাছে আমি সব শুনেছি। তাই তোর কাছে আমার এ চিঠি লেখার প্রয়োজন ছিলো।

আমি বি-ও-এ-সি তে এয়ার-হসটেসের চাকরি পেয়েছি। ভালো চাকরি। তাই নিয়ে নিলাম। এখন দিল্লি যাচ্ছি। তারপর লণ্ডন যাবো। বিদ্যুতকে বলে দিয়েছি, ওকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

মনে করিস না আমি খুব একটা মস্তো বড়ো ত্যাগ স্বীকার করলাম। আসলে কাজটা একটু স্বার্থপরের মতোই হোলো। আমার সামনে দুটো পথ ছিলো। ভালো চাকরি না হয় ভালো বর। আমি ভালো চাকরিটাই পছন্দ করলাম।

আর, বিদ্যুতকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। ওকে বিয়ে

করতে রাজী হয়েছিলাম ওর ওপর একটু করুণা করে। পরে ভেবে দেখলাম করুণার ওপর সুখী বিবাহিত জীবন গড়ে ওঠে না, বিশেষ করে যেক্ষেত্রে ওর জীবনের সব ঘটনা আমি জানি। ওর মনে তোর যে আসন আছে, সেখান থেকে তোকে কেউ টলাতে পারবে না। সে আমি জানি। কিন্তু বিদ্যুত যে মনে মনে ভালোবাসবে আরেকজনকে, আর সংসার করবে আমার সঙ্গে, ভেবে দেখলাম এটা আমি সহ্য করতে পারবোনা। ওর জীবনে যখন তোর ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা ছিলোনা তখন হয়তো বন্ধু হিসেবে ওর জন্যে এ অবস্থা আমি মেনে নিতাম। কিন্তু এখন আর এ অবস্থা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

তাই এ বিয়ে ভেঙে দিলাম।

তবে একটা কথা। কোনোদিন কাউকে বলিনি কাউকে বলবো না, আজ শুধু তোকেই বলছি। আমার দিব্যি রইলো খবদ্দার কাউকে বলবি না, বিদ্যুতকে না, কাউকে না।

বিদ্যুতের সঙ্গে আমার এমনি বন্ধুত্ব অনেকদিনের, যে সময় থেকে তোর সঙ্গে ভাব হয়েছিলো, সে সময় থেকেই। আগে কোনোদিন বুঝিনি, কিন্তু ও যখন বিলেত চলে যাচ্ছে, তখন একদিন হঠাৎ বুঝে ফেললাম। নিজের অজান্তে কখন ওকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম, জানতেই পারিনি। খুব কেঁদেছিলাম সেদিন রাত্তিরে। তবে ওকে কোনোদিন জানতে দিইনি। কী লাভ? এ ভালোবাসা আমার সাত রাজার ধন। এটা আমার মনেই গোপন হয়ে থাক।

আজ তোকে জানালাম এজন্যে যাতে তুই আমার একটা কথা বিশ্বাস করিস। ওর জন্যে আমার মনে যে ভালোবাসা আছে, সেই ভালোবাসা দিয়ে আমি প্রাণ ভরে কামনা করছি সে যেন তোকে পেয়ে সুখী হয়, তুই যেন তার জীবন ভরিয়ে তুলতে পারিস।

—শ্যামলী।